আত্মসত্তা, ধাতুপ্রস্তরের সত্তাও ধাতুপ্রস্তরের আত্মসত্তা। প্রভেদ কেবল এই যে, আত্মসত্তা'র প্রকাশ সত্ত্বপ্রধান মনুষ্যের মধ্যে সুপরিস্ফুট, রজঃপ্রধান মূঢ় জীবদিগের মধ্যে অর্দ্ধস্ফুট বা মুকুলিত, তমঃপ্রধান জড় বস্তর মধ্যে প্রসুপ্ত বা বীজভাবাপন্ন। আবার, মনুষ্যের মধ্যেও আত্মসত্তার প্রকাশ জাগরিতাবস্থায় সুপরিস্ফুট হয়, স্বপ্নাবস্থায় অর্দ্ধস্ফুট বা মুকুলিত ভাব ধারণ করে, প্রগাঢ় নিদ্রাবস্থায় সুপ্তি-সাগরে নিমগ্ন হয়। এটাও আমরা দেখিয়াছি যে "আমি ভূতকাল হইতে এ যাবৎকাল পর্য্যন্ত বর্ত্তিয়া আছি" এই বর্ত্তিয়া থাকা ব্যাপারটি যেখানে যখন প্রকাশ পায়, সেই খানেই ভবিষ্যতে বর্ত্তিয়া থাকিবার ইচ্ছা আপনা হইতেই আসিয়া যোটে। তবেই হইতেছে যে, বর্ত্তিয়া থাকিবার ইচ্ছা আত্মসত্তার প্রকাশের সঙ্গের সঙ্গী। ইহা হইতে আমরা পাইতেছি এই যে, আত্মসত্তার প্রকাশ যখন সকলেতেই ন্যূনাধিক পরিমাণে আছে, তখন বর্ত্তিয়া থাকিবার ইচ্ছাও সকলেরই ন্যূনাধিক পরিমাণে আছে। বর্ত্তিয়া থাকিবার ইচ্ছা যখন সকলেরই ন্যূনাধিক পরিমাণে আছে, তখন তাহাতেই প্রমাণ হইতেছে যে, আত্মসত্তা সকলেরই আনন্দের আস্পদ। বৃহদারণ্যক উপনিষদে আছে যে, তত্ত্বজ্ঞানের কথাপ্রসঙ্গে যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি জনক রাজাকে বলিয়াছিলেন

"এতস্যৈবানন্দস্যান্যানি ভূতানি মাত্রামুপজীবন্তি।"

ইহার অর্থ :—

ব্রহ্মরসামৃতপানে ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তির অন্তঃকরণে যেরূপ ভরপুর আনন্দ বিরাজ করে,তাহার কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ প্রসাদ-বিন্দু'র বলে অন্যান্য জীবেরা জীবন ধারণ করে :— ভাব এই যে, স্থির সমুদ্রে যেমন চন্দ্রের প্রতিবিম্ব পরিষ্কার নিজমূর্ত্তিতে প্রকাশ পায়, সত্ত্বপ্রধান মনুষ্যের শান্ত-সমাহিত চিত্তে তেমনি আত্মসত্তার রসাস্বাদন-জনিত আনন্দ পরিষ্কার নিজমূর্ত্তি ধারণ করে; আবার, তরঙ্গিত নদীস্রোতে চন্দ্রের প্রতিমা যেমন শতধা বিক্ষিপ্ত হইয়া ভাঙা ভাঙা ভাবে প্রকাশ পায়, পশ্বাদি জন্তুদিগের রজঃ-প্রধান অন্তঃকরণে তেমনি গোড়ার সেই অখণ্ড আনন্দের আভাস শতধা বিক্ষিপ্ত হইয়া ক্ষণভঙ্গুর বিষয়সুখে পর্য্যবসিত হয়।

এইরূপ দেখা যাইতেছে যে, সত্ত্বগুণের যে দুইটি প্রধান পরিচয়লক্ষণ—প্রকাশ এবং আনন্দ, তাহা কি জ্ঞানবান্ মনুষ্য, কি পশ্বাদি মূঢ় জীব, কি ধাতুপ্রস্তরাদি জড়বস্তু— সকলেরই মধ্যে ন্যূনাধিক মাত্রায় বিদ্যমান আছে।

সত্ত্বগুণের এই যে দুইটি প্রধান পরিচয়লক্ষণ—কিনা সত্তার প্রকাশ এবং সত্তার রসাস্বাদন-জনিত আনন্দ, এ দুইটি ছাড়া সত্ত্বগুণের আর একটি পরিচয়লক্ষণ আছে : সেটাও দেখা চাই; সেটি হচ্চে সত্তার আত্মসমর্থনী শক্তি। রূপকচ্ছলে বলা যাইতে পারে যে আনন্দ সত্ত্বগুণের হৃদয়, প্রকাশ সত্ত্বগুণের বাম হস্ত, আত্মসমর্থনী-শক্তি (সংক্ষেপে আত্মশক্তি) সত্ত্বগুণের দক্ষিণ হস্ত। এই স্থানটিতে সত্ত্বগুণের গোড়ার বৃত্তান্তটি আর একবার ভাল করিয়া পর্য্যালোচনা করিয়া দেখা আবশ্যক।

প্রথম দ্রষ্টব্য এই যে, সত্তার প্রকাশেই সত্তার আত্ম-সমর্থন হয়; কেন না প্রকাশ ব্যতিরেকে সত্তা সত্তাই হয় না। তবেই হইতেছে যে, সত্তার প্রকাশের মধ্যেই সত্তার আত্মসমর্থনী শক্তি সম্ভৃত রহিয়াছে।

দ্বিতীয় দ্রষ্টব্য এই যে, সত্তার প্রকাশের সঙ্গে যে পর্য্যন্ত না সত্তার আত্মসমর্থনী শক্তি একযোগে প্রকাশ পায়, সে পর্য্যন্ত প্রকাশের মাত্রা পূর্ণ হয় না। ফল কথা এই যে, "আমি ভূতকাল হইতে এ যাবৎ কাল পর্য্যন্ত বর্ত্তিয়া আছি" এই বর্ত্তিয়া থাকা ব্যাপারটি যখন দ্রষ্টা পুরুষের জ্ঞানে প্রকাশ পায়, তখন সে-যে প্রকাশ তাহা প্রকাশের নবোন্মেষ মাত্র—অরুণোদয় মাত্র; কিন্তু সেই সঙ্গে আর একটি বৃত্তান্ত যখন প্রকাশ পায়,—এটাও যখন প্রকাশ পায় যে, যে প্রকারে আত্মশক্তি খাটাইয়া আমি ভূতকালের বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া বর্ত্তমানে দণ্ডায়মান হইয়াছি, সেই প্রকারে আত্মশক্তি খাটাইয়া ভবিষ্যতে দণ্ডায়মান হইতে পারা আমার অধিকারায়ত্ত; এইরূপে যখন সত্তার সঙ্গে শক্তি একযোগে প্রকাশ পায়, তখন সত্তা এবং শক্তির সেই যে সমবেত প্রকাশ, তাহাতেই প্রকাশের মাত্রা পূরণ হয়, আর, সেই সঙ্গে আনন্দেরও মাত্রা পূরণ হয়। "আনন্দেরও মাত্রা পূরণ হয়" বলিতেছি এই জন্য, যেহেতু আধ-পেটা অন্ন-ভোজনে যেমন ক্ষুধিত ব্যক্তির উদর পূরণ হয় না, তেমনি "আমি ভূতকাল হইতে এ যাবৎ কাল পর্য্যন্ত বর্ত্তিয়া আছি" এই অর্দ্ধ-বৃত্তান্তটিতে আনন্দের মাত্রা পূরণ হয় না;—আনন্দের মনের কথা এই যে, আত্ম-সত্তা যেমন ভূতকাল হইতে এ যাবৎকাল পর্য্যন্ত বর্ত্তিয়া আছে—ভবিষ্যতেও তেমনি তাহা চিরজীবী হইয়া বর্ত্তিয়া থাকুক। এইজন্য আত্মসত্তার সঙ্গে যখন ভবিষ্যতে বর্ত্তিয়া থাকিবার যোগ্যতা বা আত্মসমর্থনী শক্তি একযোগে প্রকাশ পায়, তখন আনন্দের অর্দ্ধমাত্রা পূর্ণমাত্রায় পদ-নিক্ষেপ করে। এই স্থানটির সহিত ডারুইনের মুখ্য সিদ্ধান্তটি দিব্য সংলগ্ন হয়। সে সিদ্ধান্ত এই যে, জীব-জগতে ভূতকালের জীবনসংগ্রামের মধ্য দিয়া বর্ত্তমান সত্তা যখন যাহা উদ্বৃত্ত হয়, তাহা দীনহীন সত্তা নহে, পরন্তু তাহা যোগ্যতম সত্তা; সত্তার উদ্বর্ত্তন যোগ্যতমেরই উদ্বর্ত্তন (survival of the fittest)। এইরূপ দেখা যাইতেছে যে, ডারুইনের মতে সত্তার উদ্বর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে আত্মসম-র্থনের যোগ্যতার অভ্যুদয় হয়—আত্মসমর্থনী শক্তির অভ্যুদয় হয়। ডারুইনের প্রদর্শিত এই যে এক মহা-

নাট্য—কি না সত্তার উদ্বর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে আত্মসমর্থনী শক্তির উদ্বোধন—এ নাট্য অভিনীত হয় জীবজগতের সর্ব্বত্রই; কিন্তু পশ্বাদি জন্তুরা এই পরমাশ্চর্য্য নাট্যলীলার রসাস্বাদনে একেবারেই বঞ্চিত—এ নাট্যলীলার দর্শক পৃথিবীস্থ সারারাজ্যের জীবদিগের মধ্যে অ্যাকা কেবল মনুষ্য। কেননা মনুষ্যই সত্ত্বগুণপ্রধান জীব, আর, প্রকাশ সত্ত্বগুণেরই ধর্ম্ম। মনুষ্যের ন্যায় সত্ত্বগুণপ্রধান জীবের অন্তঃকরণেই আত্মসত্তা এবং আত্মসত্তার প্রিয়সখী আত্মসমর্থনী শক্তি উভয়েই পরিষ্কার জ্ঞানালোকে বিভ্রাজমানা। পক্ষান্তরে, পশ্বাদি জন্তুদিগের রজঃপ্রধান অন্তঃকরণে আত্মসত্তা এরূপ ঝাপ্‌সা আলোকে প্রকাশ পায় যে, তাহা প্রকাশ না পাওয়ারই মধ্যে। অর্থাৎ মনুষ্যের সজ্ঞান অবস্থার চিৎপ্রকাশ বলিতে যেরূপ চিৎপ্রকাশ বুঝায়, পশ্বাদি জন্তুদিগের অন্তঃকরণস্থিত চিৎপ্রকাশ সেরূপ জাগ্রত ভাবের চিৎপ্রকাশ নহে। ফলেও এইরূপ দেখা যায় যে, কোনোপ্রকার বাধানুভূতির উত্তেজনায় যখন পশ্বাদি জন্তুদিগের অন্তঃকরণে চিদাভাস উদ্দীপ্ত হইয়া তাহাদিগকে কর্ম্মচেষ্টায় প্রবর্ত্তিত করে, তখন উপস্থিত বাধার প্রতিবিধানকার্য্যেই তাহাদের সমস্ত চিৎপ্রকাশ গ্রস্ত হইয়া যায়; তা বই, সুখদুঃখের ছায়াবাজির পর্দার ওপিঠে প্রকাশ এবং আনন্দের যে এক বাঁধা রোসনাই রহিয়াছে, তাহা তাহাদের দৃষ্টিক্ষেত্রে ধরা দ্যায় না।

ডারুইনের প্রদর্শিত ঐ যে মহানাট্য উহা বহির্জ্জগতের আম্‌দরবারে অভিনীত হয়, আর সেই জন্য অধুনাতন কালের বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতেরা উহার সবিশেষ মর্য্যাদাভিজ্ঞ। তা ছাড়া, আর এক নাট্য যাহা মনুষ্যের অন্তর্জ্জগতের খাস্‌দরবারে অভিনীত হয় তাহা কম মহানাট্য নহে;—আমাদের দেশের পুরাতন তত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতেরা এই দ্বিতীয় মহানাট্যের সবিশেষ মর্য্যাদাভিজ্ঞ ছিলেন ইহা বলা বাহুল্য। পূর্ব্বোক্ত মহানাট্যে বাহ্য প্রকৃতির অন্তর্নিগূঢ় সত্ত্বগুণ রজস্তমোগুণের বাধা অতিক্রম করিয়া কিরূপে জড়রাজ্যের বিদেশ হইতে মনুষ্য-রাজ্যের স্বদেশে উপনীত হয়, এই বৃহদ্ব্যাপারটির অভিনয় হয়। শেষোক্ত মহানাট্যে মনুষ্যের অন্তর্নিগূঢ় সত্ত্বগুণ রজস্তমোগুণের বাধা অতিক্রম করিয়া কিরূপে অন্নময় কোষের প্রবাস হইতে আনন্দময় কোষের নিবাসে উপনীত হয়, এই নিগূঢ় রহস্যটির অভিনয় হয়। বর্ত্তমান স্থলে শেষোক্ত মহানাট্যের মর্ম্মস্থানীয় ব্যাপারগুলি পরিষ্কাররূপে বিবৃত করিয়া দেখানোই আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য;—তাহারই এক্ষণে চেষ্টা দেখা যাইতেছে।

বলিলাম যে, আত্মসত্তার প্রকাশের সঙ্গে আত্মশক্তির প্রকাশ হইলে—তবেই আনন্দের মাত্রা পূর্ণ হয়। এখন দ্রষ্টব্য এই যে, সত্তার প্রকাশ হয় জ্ঞানযোগে—শক্তির প্রকাশ হয় কর্ম্মযোগে। আত্মসত্তা যতক্ষণ পর্য্যন্ত না পরিষ্কার জ্ঞানালোকে অভ্যুত্থান করে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত যেমন আত্মসত্তার প্রকাশ সম্যক্ পর্য্যাপ্তি লাভ করে না, আত্মশক্তি তেমনি যতক্ষণ না মঙ্গল কার্য্যের অনুষ্ঠানে উদ্যোগী হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত তাহা বিরাট-রাজার অন্তঃপুরচারী বৃহন্নলার ন্যায় অপরিজ্ঞাত থাকে। পক্ষান্তরে, বৃহন্নলা-সারথী যেমন কুরুসেনা জয় করিয়া—তিনি যে কিরূপ অজেয় সারথী তাহার পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন, তেমনি মনুষ্যের আত্মশক্তি অন্তরের রিপুজয় করিয়া—সে যে কিরূপ অজেয় শক্তি তাহার পরিচয় প্রদান করে। উপস্থিত বাধার প্রতিবিধানকার্য্য—কি মনুষ্য কি পশ্বাদি জন্তু—সকল জীবকেই বাধ্য হইয়া করিতে হয়; কাজেই সেরূপ কার্য্য জীবের অশক্তিরই পরিজ্ঞাপক। পক্ষান্তরে, মনুষ্য যখন মাঙ্গলিক কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া অন্তরতম আনন্দের নিগূঢ় অভিপ্রায় সমর্থন করে, তখন সে-যাহা সে করে তাহা ভিতর-হইতে করে; তা বই, বাহিরের কোনোকিছু দ্বারা বাধ্য হইয়া করে না। এইরূপ কার্য্যই মনুষ্যের স্বশক্তির পরিচায়ক—আত্মশক্তির পরিচায়ক। দিবালোক অবশ্য সূর্য্য হইতেই আসে, তা বই, তাহা মনুষ্যের আত্মশক্তি হইতে আসে না; কিন্তু তা বলিয়া এটা ভুলিলে চলিবে না যে, গৃহবাসী যতক্ষণ পর্য্যন্ত হস্তপদ পরিচালনা করিয়া ঘরের জাল্‌না-দরজা উদ্‌ঘাটন না করে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত দিবালোক তাহার ভোগে আসে না। প্রকৃত কথা এই যে, দুই হাত নহিলে তালি বাজে না;—এটা যেমন সত্য যে, দিবালোক প্রেরণ করা সূর্য্যের কার্য্য, এটাও তেমনি সত্য যে, দিবালোকের বাধা অপসারিত করা গৃহবাসীর কার্য্য।

দিবালোকের প্রেরণকর্ত্তা যেমন সূর্য্য, সত্ত্বগুণের প্রেরণকর্ত্তা তেমনি পরমাত্মা। পার্থিব অগ্নির আলোকের মূলাধার যে সূর্য্যের আলোক ইহা বিজ্ঞানের একটি নবতম সিদ্ধান্ত। কিন্তু সূর্য্যের আলোক যেমন পরম পরিশুদ্ধ আলোক, পার্থিব অগ্নির আলোক সেরূপ নহে; পার্থিব অগ্নির আলোকে ইন্ধনের দোষগুণ কোনো-না-কোনো আকারে দেখা দিতে ছাড়ে না। মনুষ্যের অন্তঃকরণে তেমনি সত্ত্বগুণ রজস্তমোগুণের বাধায় আক্রান্ত, আর আত্মশক্তির কার্য্য হ'চ্চে সেই সকল বাধা অপসারিত করিয়া দেবপ্রসাদের আগমন-পথ উন্মুক্ত করিয়া দেওয়া। আত্মপ্রভাবের সহিত দেবপ্রসাদের কিরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ সেইটি এখানে বিশেষ মতে প্রণিধান করিয়া দেখা কর্ত্তব্য। কর্ষিত ক্ষেত্রে বৃষ্টির জল কর্দ্দমাক্ত হইয়া যায়; আর, সেই কর্দ্দমাক্ত ঘোলা জলের গুণে উপ্ত ধান্য-

বীজ যথাসময়ে অঙ্কুরিত হয়—ইহা খুবই সত্য; কিন্তু সেই সঙ্গে এটাও তেমনি সত্য যে, সেই কর্দ্দমাক্ত ঘোলা জলের মধ্য হইতে মেঘনির্ম্মুক্ত বিশুদ্ধ জল কোথাও পলাইয়া যায় না; পলাইয়া যাওয়া দূরে থাকুক্—তাহা সেই কর্দ্দমাক্ত ঘোলাজলের জলত্ব-সাধন কার্য্যে ক্ষণ-কালের জন্যও ক্ষান্ত থাকে না। এখন দ্রষ্টব্য এই যে, বৃক্ষের উৎপাদনে ঘোলা-জলের যেরূপ কার্য্যকারিতা—মঙ্গল-কার্য্যের উৎপাদনে আত্মপ্রভাবের সেইরূপ কার্য্য-কারিতা; আর, ঘোলাজলের জলত্ব-সাধনে বিশুদ্ধ জলের যেরূপ কার্য্যকারিতা, আত্মপ্রভাবের সামর্থ্য-সাধনে দেব-প্রসাদের সেইরূপ কার্য্যকারিতা অতীব সুস্পষ্ট। প্রথমে, দেবপ্রসাদে মনুষ্যের অন্তঃকরণে আত্মসত্তা প্রকাশিত হয়। তাহার পরে তাহার সঙ্গে আত্মসত্তার রসাস্বাদন-জনিত আনন্দ আসিয়া যোটে। তাহার পরে সেই আনন্দের সঙ্গে আত্মসত্তার প্রকাশকে মোহমেঘ হইতে নির্ম্মুক্ত করিয়া তাহার ঔজ্জ্বল্য সাধন করিবার ইচ্ছা আসিয়া যোটে। তাহার পরে আত্মশক্তি মঙ্গলকার্য্যের অনুষ্ঠান দ্বারা আত্মার প্রভাব পরিস্ফুট করিয়া আনন্দের অন্তরের অভিলাষকে পূরণ করে।

পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, সত্তার প্রকাশ হয় জ্ঞানযোগে, শক্তির প্রকাশ হয় কর্ম্মযোগে। "কর্ম্মযোগে" অর্থাৎ মঙ্গল-কার্য্যের অনুষ্ঠানে। মঙ্গল-কার্য্যের পথপ্রদর্শক হচ্চে মনুষ্যের অন্তর্নিহিত সাত্ত্বিক আনন্দ। যে কার্য্য সেই অন্তর্নিহিত বিমল আনন্দের অনুমোদিত, সংক্ষেপে অন্তরাত্মার অনুমোদিত, তাহাই মঙ্গল-কার্য্য—বা আত্ম-শক্তির কার্য্য; আর, তাহার বিপরীত শ্রেণীর কার্য্যই অমঙ্গল কার্য্য—বা অশক্তির কার্য্য। মহাভারতের বনপর্ব্বের ২০৬ অধ্যায়ে আছে

"মূঢানাং অবলিপ্তানাং অসারং ভাবিতং ভবেৎ।
দর্শয়ত্যন্তরাত্মা তং দিবারূপমিবাংশুমান্।"

ইহার অর্থ

মূঢ় গর্ব্বিত ব্যক্তিদিগের মনের যত কিছু ভাবনা-চিন্তা সমস্তই অসার; সূর্য্য যেমন দিবসের রূপ প্রদর্শন করে (অর্থাৎ দৃশ্য বিষয় সকল প্রদর্শন করে) অন্তরাত্মা তেমনি তাহাদের সেই সকল ভাবনা-চিন্তার অসারতা প্রদর্শন করে। মনুসংহিতার চতুর্থ অধ্যায়ে আছে

"যৎ কর্ম্ম কুর্ব্বতোঽস্য স্যাৎ পরিতোষোঽন্তরাত্মনঃ।
তৎপ্রযত্নেন কুর্ব্বীত বিপরীতং তু বর্জ্জয়েৎ॥"

ইহার অর্থ:—

যে কর্ম্ম করিলে সাধকের অন্তরাত্মা পরিতুষ্ট হয়, তিনি সেই কর্ম্ম প্রযত্ন সহকারে করিবেন, তদ্বিপরীত কর্ম্ম পরিত্যাগ করিবেন।

আমাদের দেশের পূর্ব্বতন কালের আচার্য্যেরা স্বভাবী ছিলেন, তাই তাঁহারা বলিয়াছেন—"অন্তরাত্মা মঙ্গল কার্য্যের পথপ্রদর্শক"; কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, নব্য আচার্য্যেরা নিতান্তই পরভাবী (অর্থাৎ পরের বুলি বোল্‌নেওয়ালা)। এই জন্য, যদি বলা যায় যে, মঙ্গল-কার্য্যের পথ-প্রদর্শক conscience, তবে শেষোক্ত শ্রেণীর আচার্য্যেরা বলিবেন "খুব ঠিক!" কিন্তু যদি বলা যায় যে, মঙ্গল-কার্য্যের পথপ্রদর্শক মনুষ্যের অন্তরাত্মা, তবে তাঁহারা হয় তো বলিবেন "অন্তরাত্মা বলিতেছ কাহাকে? আমরা তো জানি conscience শব্দের দেশীয় প্রতি-শব্দ বিবেক।" ইহার উত্তরে আমি বলি এই যে, তাহা তাঁহারা যেমন জানেন, তেমনি এটাও তাঁহাদের জানা উচিত যে, আমাদের দেশের স্বভাবী আচার্য্যগণের অভিধানে বিবেক-শব্দের অর্থ মূলেই conscience নহে। আমাদের দেশের পুরাতন শাস্ত্রকারদিগের মতে ত্রিগুণাত্মক তত্ত্বের সংস্পর্শ হইতে ত্রিগুণাতীত তত্ত্ব বিবিক্ত করিয়া লওয়াই বিবেকের মুখ্যতম কার্য্য। ইহাতে এইরূপ দাঁড়াইতেছে যে, বিবেকের লক্ষ্য পাপপুণ্যের অধিকার-বহির্ভূত ত্রিগুণাতীত প্রদেশের প্রতিই নিবিষ্ট থাকে। পক্ষান্তরে conscienceএর লক্ষ্য পুণ্যপাপের অধিকারায়ত্ত প্রদেশের ভিতরেই নিয়ত আবদ্ধ থাকে, তাহার ঊর্দ্ধে যায় না। দুয়ের মধ্যে যখন এইরূপ মর্ম্মান্তিক প্রভেদ, তখন বিবেককে conscience-এর প্রতিশব্দ করিয়া দাঁড় করানোও যা, আর কোনো যোগী মহাপুরুষকে ধরিয়া-বাঁধিয়া ইংরাজ সাজানোও তা—একই কথা। Kant প্রজ্ঞাকে (Reason কে) দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া-ছিলেন; Practical (অর্থাৎ Ethical) এবং Specula-tive (অর্থাৎ Theoretical)। এখন দ্রষ্টব্য এই যে পাশ্চাত্য ভাষায় consciousness শব্দ দার্শনিক জ্ঞানের (theoretical reason এর) যে স্থান অধিকার করে, conscience শব্দ ব্যবহারিক জ্ঞানের (practical reason এর) বা নৈতিক জ্ঞানের (Ethical reason-এর) অবিকল সেই স্থান অধিকার করে। conscious-ness সাংখ্যের দ্রষ্টা পুরুষের ন্যায় উদাসীন সাক্ষী; তাহার চক্ষে ধর্ম্মও যেমন, অধর্ম্মও তেমনি, দুইই জ্ঞেয় বিষয় মাত্র—তাহার অধিক আর কিছুই নহে। পক্ষান্তরে, conscience পাপ-পুণ্যের সেরূপ উদাসীন সাক্ষী নহে। conscienceএর চক্ষে পুণ্য অনুরাগ-ভাজন; পাপ বিরাগভাজন। Consciousness কেবল মাত্র দ্রষ্টা—তাহা নিছক জ্ঞান। পরন্তু conscience দ্রষ্টা ভোক্তা এবং নিয়ন্তা তিনই একাধারে; conscience পাপপুণ্যের দ্রষ্টা এই অর্থে সাক্ষী পুরুষ, পাপপুণ্যের ভোক্তা তাই পুণ্যের প্রতি সুপ্রসন্ন এবং পাপের প্রতি

অপ্রসন্ন; conscience পুণ্যের পুরস্কর্ত্তা এবং পাপের শাস্তা এই অর্থে অন্তর্যামী পুরুষ; conscience আত্মপ্রকাশ, আত্মানন্দ, এবং আত্মশক্তি তিনই একাধারে, এই অর্থে অন্তরাত্মা। তাই আমাদের স্বদেশীয় ভাষার অন্তরাত্মা শব্দে conscienceএর মর্ম্মগত ভাবার্থটি যেমন খোলে এমন আর কোনো দেশীয় ভাষার কোনো শব্দে নহে। ইহা সত্ত্বেও আমাদের দেশের নব্য আচার্য্যেরা যে স্বভাষার অকৃত্রিম সৌন্দর্য্যের প্রতি ইচ্ছা করিয়া অন্ধ হইয়া পরভাবিম্ব ব্রত অবলম্বন করেন, ইহা কম আক্ষেপের বিষয় নহে। আমরা একটু পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, আনন্দ সত্ত্বগুণের হৃদয়, প্রকাশ সত্ত্বগুণের বামহস্ত এবং আত্মশক্তি সত্ত্বগুণের দক্ষিণ হস্ত। এখন বলিতে চাই এই যে, সত্ত্বগুণের সেই যে হৃদয়—কিনা আত্মসত্তার রসাস্বাদনজনিত আনন্দ, তাহাই অন্তরাত্মার বসতি স্থান। মঙ্গলের অনুষ্ঠানে আত্মশক্তির কিরূপ কার্য্যকারিতা তাহার সন্ধান পাইতে হইলে, এই স্থানটির আদ্যোপান্ত বিশেষমতে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখা আবশ্যক। আগামী বারে তাহারই চেষ্টা দেখা যাইবে।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

রোমীয় বহুদেববাদের পরিণতি।

তিন শতাব্দীর প্রাচ্য প্রভাবে রোমীয় বহুদেববাদের যে পরিণতি ঘটিয়াছিল, জর্ম্মান পণ্ডিত ফ্রান্জ্ কুমণ্ট্ তাহার আলোচনা করিয়াছেন। আমরা সেই প্রবন্ধ অবলম্বন করিয়া ভারতবর্ষের আধুনিক ধর্ম্মান্দোলনের সহিত রোমের তাৎকালিক অবস্থার সাদৃশ্যের প্রতি পাঠকদের চিত্ত আকর্ষণ করিতে ইচ্ছা করি।

যেমনতর ব্রাহ্মণেরা হিন্দুধর্ম্মের বিচিত্র মূর্ত্তি-উপাসনার মাঝখানেই বেদান্তের অদ্বৈতবাদকে জাগ্রত করিতে পারিয়াছিলেন, যেমনতর রোমীয় আইনব্যবস্থাপকেরা নানা বর্ব্বর জাতির বংশপরম্পরাগত প্রথা বিশ্লেষণ করিয়া রাজবিধিতন্ত্রের এমন সকল মূলতত্ত্ব সংগ্রহ করিয়াছিলেন যাহা দ্বারা এখনকার সভ্যসমাজ চালিত হইতে পারিয়াছে, তেমনি রোমের নিকৃষ্ট পূজাপদ্ধতির উপর এসিয়াবাসী মনীষীগণ প্রভাব বিস্তার করিয়া ক্রমে ক্রমে একটি সুসম্পূর্ণ অধ্যাত্মবিদ্যা ও পরকালতত্ত্বের সৃষ্টি করিতে পারিয়াছিলেন। রাজ্যের কল্যাণার্থ কেবল কতকগুলি প্রায়শ্চিত্ত ও নানা প্রকার পৌত্তলিক অনুষ্ঠানাদি সম্পন্ন করাই প্রাচীন রোমের যে ধর্ম্ম ছিল এই প্রাচ্য প্রভাবে তাহা আর তিষ্ঠিতে পারিল না; তাহার পরিবর্ত্তে যে ধর্ম্মতন্ত্রের উদ্ভব হইল তাহা বিশ্বতত্ত্ব লইয়া আলোচনা আরম্ভ করিল এবং জীবনের পরিধিকে পরলোক পর্য্যন্ত প্রসারিত করিয়া দেখিয়া তদনুসারে মানুষের জীবনযাত্রা নিয়মিত করিতে চেষ্টা করিল। সম্রাট্ অগষ্টাস্ রোমের যে সনাতন পূজাবিধি পুনর্জ্জীবিত করিতে চেষ্টা করিতেছিলেন তাহা খৃষ্টানধর্ম্মের যত বিরুদ্ধ ছিল নূতন ধর্ম্মতন্ত্রটি তেমন ছিল না। বরঞ্চ যে খৃষ্টধর্ম্ম ইহার বিরুদ্ধে লড়াই করিয়াছে তাহার সহিত ইহার সাদৃশ্যই ছিল। জ্ঞানের দিক দিয়া এবং শীলের দিক দিয়া তুলনা করিয়া দেখিলে দেখা যায় এই দুইটি প্রতিদ্বন্দ্বী মত প্রায় একই ক্ষেত্র অধিকার করিয়াছিল। এমন কি অব্যাঘাতেই ইহাদের একটি হইতে আর একটিতে পদক্ষেপ করা সম্ভবপর হইত।

বর্ত্তমান ভারতে ব্রাহ্মধর্ম্মের সহিত নবজাগ্রত হিন্দুধর্ম্মেরও প্রায় এইরূপ সম্বন্ধ দেখা যায়। সেই জন্যই কেশবচন্দ্রের সহিত রামকৃষ্ণ পরমহংসের যোগ অথবা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর শেষ বয়সের মতের সহিত হিন্দুসমাজের মতের মিলন এরূপ সম্ভবপর হইয়াছে। বিবেকানন্দ যে এক সময়ে উৎসাহী ব্রাহ্ম ছিলেন তাহাতে তাঁহার পরবর্ত্তী মতপরিবর্ত্তনে কোনো গুরুতর বিঘ্ন ঘটায় নাই। বস্তুত খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর রোমের ন্যায় ভারতেও ধর্ম্মক্ষেত্রে প্রাচীন মতের সহিত নবীন মতের যে একটি আনাগোনা চলিতেছে তাহা একটু দৃষ্টি করিলেই দেখা যাইবে; ইহাদের বিরুদ্ধতা ক্ষয় হইয়া ইহাদের ভেদচিহ্ন যে প্রতিদিন লুপ্ত হইয়া আসিতেছে তাহাতে সন্দেহ নাই।

শেষ যুগের লাটিন লেখকদের রচনা পাঠকালে অনেক সময়েই লেখক বহুদেববাদী কি খৃষ্টান তাহা স্থির করা কঠিন হয় সেইরূপ বর্ত্তমান হিন্দু ও ব্রাহ্ম লেখকদের রচনার মধ্যে নীতিমূলক ও তত্ত্বমূলক সাদৃশ্য দেখিয়া পরবর্ত্তীকালের পাঠকেরা বিস্মিত হইবেন সন্দেহ নাই। প্রাচ্য প্রকৃতির ধর্ম্মবোধের মধ্যে যে একটী গূঢ় গভীর তাত্ত্বিকতা আছে তাহারই দ্বারা রোমের সমস্ত সমাজতন্ত্র ধীরে ধীরে অনুপ্রাণিত হইয়া এমন উদার ভাবের অবতারণা করিয়াছিল যাহাতে একদিন নানাজাতিকে একই বিশ্বব্যাপী ধর্ম্মব্যবস্থার মধ্যে একত্র করিতে সক্ষম হইয়াছিল। ভারতবর্ষেও কি প্রাচ্য প্রকৃতি সমস্ত ধর্ম্মভেদের মধ্যে একটি সমন্বয়সাধন করিবার জন্য এখনি আমাদের গোচরে ও অগোচরে কাজ করিতেছেনা?

খৃষ্টীয় শতাব্দীর প্রারম্ভে য়ুরোপে যে ধর্ম্মসমাজের মূর্ত্তি দেখা যায় তাহা আশ্চর্য্য বৈচিত্র্যময়। তখন প্রাচীন কালের ইতালীয়, কেল্টিয় ও আইবেরিয় দেবতাগণের মহিমা যদিও ম্লান হইয়াছিল তথাপি তাহাদের তিরোধান ঘটে নাই। বিদেশীয় প্রতিদ্বন্দ্বীগণের সহিত তাহারা পারিয়া উঠিতেছিলনা বটে তবু ইতর সাধারণের ভক্তি শ্রদ্ধায় ও পল্লীগ্রামের লোকাচারে তাহারা আশ্রয়লাভ করিয়াছিল।

বহুকাল অবধি প্রত্যেক সহরে রোমীয় দেবদেবী স্থাপিত ছিল এবং প্রধান ধর্ম্মাধ্যক্ষের নির্দ্দিষ্ট বিধি অনুসারে এক একজন রাজপুরোহিতের উপর তাহাদের পূজা অর্চ্চনাদির ভার দেওয়া হইত। কিন্তু তাহাদের পাশেই সমস্ত এসিয়ার দেবতা সমাজের প্রতিনিধিগণ জনসমাজের একাগ্র ভক্তিনিষ্ঠা অধিকার করিয়া বিরাজ করিতেছিল। এসিয়া মাইনর, ইজিপ্ট, সাইরিয়া, পারস্য হইতে নূতন প্রভাবের জোয়ার আসিয়া ইতালীকে প্লাবিত করিয়া ফেলিল। পূর্ব্বদেশের প্রখর সূর্য্যের কিরণ রশ্মি ইতালীর নক্ষত্ররাজির উজ্জ্বলতাকে যেন আচ্ছন্ন করিয়া দিল। একদিকে যেমন নানামূর্ত্তিধারী বহুদেববাদ ব্যাপ্ত হইতে লাগিল তেমনি অন্যদিকে ইহুদী একেশ্বরবাদীগণ ও খৃষ্টান সম্প্রদায় আপন আপন ধর্ম্মমতের প্রতিষ্ঠাকে দৃঢ় করিয়া তুলিল। এইরূপে লোকের সংশয়াকুল চিত্তকে বিভিন্ন ধারায় আকর্ষণ করিতে লাগিল এবং বহুতর বিরুদ্ধমতের উপদেশ তাহাদের ধর্ম্মবুদ্ধিকে নানাভাবে মথিত করিয়া তুলিল।

সর্ব্বপ্রথমে এসিয়া মাইনরের দেবমণ্ডলী ইতালীতে স্থান পায়। প্যুনিক যুদ্ধের অবসানে পেসিনুস্-নাম-ধারিণী (Pessinus) মহামাতাদেবীর কৃষ্ণপ্রস্তর বিগ্রহপূজা প্রচলিত হইয়াছিল। ক্লডিয়সের রাজত্ব-কালে এই ধর্ম্ম পূর্ণমহিমায় বিকসিত হইয়া উঠিল; ইন্দ্রিয়াকর্ষক উগ্রভাবোন্মাদপূর্ণ প্রাচ্যধর্ম্ম রোমের প্রাচীন গম্ভীর ও বর্ণচ্ছটাহীন ধর্ম্মকে আবৃত করিয়াছিল।

খৃষ্ট শতাব্দীর দুই শত বৎসর পূর্ব্বে বহুবাধাসত্ত্বেও মিশরের আইসিস্ ও সেরাপিস্ পূজার গুহ্য তান্ত্রিকতা আলেক্জান্দ্রিয় সভ্যতা বহন করিয়া ইতালিতে বিস্তার-লাভ করিয়াছিল। এই তান্ত্রিকতা মিশরের অন্যান্য ধর্ম্মমতের ন্যায় অত্যন্ত অনুন্নত বিচ্ছিন্ন মতসমূহের সমষ্টি-মাত্র ছিল; ইহার সম্মুখে কোনো উচ্চ নৈতিক আদর্শও ছিলনা; কিন্তু ইহার প্রাচীন পূজাপদ্ধতির অতুলনীয় মাধুর্য্য ক্রমশঃ রোমীয় জনসমাজকে বিচিত্র ভাবাবেশে মুগ্ধ করিয়াছিল; সুধু তাহা নহে অমরত্ব ও দেবত্বলাভের আশ্বাসও রোমানদের চিত্ত আকর্ষণ করিবার অন্যতম কারণ ছিল।

কিছুকাল পরে সিরিয়ার সূর্য্য উপাসনা রোমে প্রচলিত হইল। পারসিক মিথ্রাপূজার তান্ত্রিকতায় কালকে আকাশের সহিত মিলিত করিয়া তাহাকেই আদিকারণ বলিয়া স্বীকার করা হইত এবং এই তান্ত্রিকগণ নক্ষত্রমণ্ডলীকে দেবতা বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিল। ইহার সহিত বাবি-লোনীয় ধর্ম্মমত সম্মিলিত হইয়া রোমে প্রচার লাভ করিল এবং পারসিক ধর্ম্মতত্ত্বের দ্বন্দ্ববাদও এই সঙ্গে প্রভাব বিস্তার করিল।

রোমে এই বহুবিচিত্র ধর্ম্মবাহুল্যের ফল কি হইল? রোমীয় সাম্রাজ্যগঠননীতির অগ্নিময় সমন্বয় চুল্লির মধ্যে পরস্পর মিশ্রিত হইয়া এই নানা বর্ব্বর পদার্থগুলি কিরূপে সংশোধিত হইয়া উঠিয়াছিল? এককথায় রোমের প্রাচীন বহুদেববাদ নানা বিদেশী ধর্ম্মবাদের দ্বারা বিজড়িত হইয়া কোন্ মূর্ত্তিতে চতুর্থশতাব্দে অন্তর্ধান করিল?

লেখক এইখানে একটি প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছেন যে, কোথাও কি একটিমাত্র অমিশ্র স্বতন্ত্র বহুদেববাদ দেখা যায়? তিনি বলেন, যেখানে নানা বিভিন্ন জাতির সম্মিশ্রন হইয়াছে সেইখানেই বহুদেববাদের উৎপত্তি। নানামতের উচ্ছাস-সংঘাতেই ধর্ম্ম খণ্ড খণ্ড হইয়াছে এবং তাহাদের সকলগুলিকেই একত্রে স্থান দিবার চেষ্টা-তেই তাহারা কেবলই বহুগুণিত হইয়া উঠিয়াছে। যেখানে বহুদেববাদের প্রাদুর্ভাব সেখানে কোনো ধর্ম্মমত সহসা আঘাত পাইয়া মরে না তাহা বহুকালে ক্রমে জীর্ণ ও রূপান্তরিত হয়। নূতনমত আসিয়া পুরাতন মতকে স্থানচ্যুত করে না—সেও তাহার পার্শ্বে আসন গ্রহণ করে। রোমে চতুর্থশতাব্দে বা তাহার পূর্ব্বে যে ধর্ম্মমত প্রচলিত ছিল তাহার ধর্ম্মতত্ত্বটি যে বেশ সুসম্বদ্ধ ও ব্যাপক ছিল তাহা বলা যায় না। শিক্ষিত ও অশিক্ষিতের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য ছিলই। চাষারা তখন তৈলাক্ত শিলা-খণ্ডকে, বিশেষ বিশেষ ঝরণা ও পুষ্পিত তরুকে পূজা করিত; বীজ বপন ও শস্যকর্ত্তনের সময় তাহাদের উৎসব ছিল। এই সমস্তই কুসংস্কাররূপে ঘৃণিত হইয়াও অনেকদিন পর্য্যন্ত খৃষ্টান-যুগেও নানা আকারে আত্মরক্ষা করিয়া চলিয়াছিল।

এদিকে সমাজের অপর-প্রান্তে দার্শনিকেরা ধর্ম্মকে নানা সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ক্ষণভঙ্গুর ও উজ্জ্বলবর্ণের তত্ত্ব-তন্তুজালে আবৃত করিয়া দেখাইতে লাগিলেন। সম্রাট্ জুলিয়ান্ মহামাতার কাহিনীর অদ্ভুত অসঙ্গত ব্যাখ্যা প্রচার করি-লেন এবং তাহা বিশেষ বিশেষ পণ্ডিতসমাজে সমাদরের সহিত গৃহীত হইল। বর্ত্তমানকালে আমাদের দেশেও এরূপ চেষ্টার দৃষ্টান্ত ভূরি ভূরি দেখা যাইতেছে।

রোমের এই বহুধাবিভক্ত দেবপূজার সহিত যখন খৃষ্টানধর্ম্মের বিরোধ বাধিল তখন সেই বিরোধে বহু-দেববাদ আত্মরক্ষার জন্য পূর্ব্বাপেক্ষা ঘনীভূত হইয়া উঠিল। প্লেটোর অনুবর্ত্তী দর্শনতত্ত্বই তখন সকলের চিত্তকে অধিকার করিয়াছিল। এই দর্শন প্রচলিত ধর্ম্মকে কেবলমাত্র যে স্বীকার করিত তাহা নহে তাহার প্রতি ভক্তি প্রদর্শন করিত, এবং শাস্ত্র-গ্রন্থকেও অপৌ-রুষেয় বলিয়া মান্য করিত। যেহেতু সকলপ্রকার পূজাই পবিত্র এইজন্য সকলগুলিকেই শ্রদ্ধেয় বলিয়া প্রমাণ করিবার জন্য তাহাদিগকে রূপক বলিয়া গণ্য

করিয়া আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার চেষ্টা হইত। এইরূপে পূর্ব্বদেশ হইতে যে ভাবগুলির আমদানি হইল গ্রীক্-রোমীয় চিত্ত আপন ভাবের সহিত তাহার আপোষ করিয়া লইবার চেষ্টা করাতে একটি সম্মিলিত ধর্ম্মতন্ত্র ধীরে ধীরে রূপ ধারণ করিয়া উঠিতে লাগিল। এইভাবে রোমীয় ধর্ম্মের মৃত-অংশগুলি যখন অপসারিত হইল তখন বিদেশী প্রাচ্যধর্ম্মগুলি তাহার সহিত মিলিত হইয়া তাহাকে নূতন প্রাণ দিল এবং নিজেরাও রূপান্তরিত হইয়া গেল।

তৎকালের খৃষ্টানদের গ্রন্থ হইতে একটা কথা জানা যায় যে যদিচ প্রাচীন প্রথানুসারে নানা উপাধিধারী ধর্ম্মাধ্যক্ষেরা পুরাতন রোমের ধর্ম্মানুষ্ঠান পালনের জন্য নিযুক্ত ছিলেন তবু তখন দেশের উপর তাহাদের প্রকৃত কোনো প্রভাব ছিল না। বিশেষত সম্রাট্ অরেলিয়ান্ যে দিন "অপরাজিত সূর্য্য"-এর পুরোহিতকে তাঁহার সাম্রাজ্যের রক্ষকদলের অন্যতম বলিয়া নিযুক্ত করিলেন, সেদিন প্রাচীন ধর্ম্মের পতন আরও সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল। ইহাতে দেখা যায় প্রাচ্য ধর্ম্মমতই তৎকালে প্রবল। ইহাই জনসাধারণের ভক্তি অধিকার করিয়া ছিল। খৃষ্টানেরা তখন এই ধর্ম্মের বিরুদ্ধেই দাঁড়াইয়াছিল।

খৃষ্টানদের আক্রমণে এই বিরোধী ধর্ম্মমতগুলি এক হইয়া উঠিয়া আপনার মধ্য হইতে একটি সুসংলগ্ন বিশ্ব-তত্ত্ব ও ঈশ্বর-তত্ত্ব উদ্ভাবন করিতে লাগিল। তখন দেবতারা এক একটি শক্তিরূপে পরিগণিত হইলেন ও তাঁহাদের পরস্পরের মধ্যে একটি যোগ স্থাপিত হইল। এই সম্মিলনের ফলে সর্ব্বব্যাপী ঈশ্বরের ধারণা পরিস্ফুটতর হইতে লাগিল। চতুর্থশতাব্দীর একজন লেখক ম্যাক্সিমস্ বলিয়াছেন—"একমাত্র ঈশ্বর আছেন; তিনি স্বতন্ত্র ও শ্রেষ্ঠ; তাঁহার আদি নাই, জনকজননী নাই; তাঁহার যে শক্তি জগতে বহুধা ব্যাপ্ত হইয়া আছে তাঁহাকেই আমরা নানা নামে ডাকিয়া থাকি, কারণ তাঁহার যথার্থ নাম আমরা জানি না। তাঁহার নানা অংশকেই নানা সময়ে স্তব করিয়া আমরা সেই একমাত্রেরই উপাসনা করি। তিনি যেমন দেবতাদের, তেমনি মনুষ্যদের সাধারণ পিতা—মনুষ্যগণ সহস্রবিধ উপায়ে সেই দেবতাগণের পূজা করিয়া তাঁহাদের মধ্যস্থতায় আপনাদের বহুবিরোধ-সত্ত্বেও সেই এক পিতারই তুষ্টিসাধন করে।"

কিন্তু এই যে অনির্ব্বচনীয় পরমদেবতা যিনি সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত তিনি বিশেষভাবে আকাশের উজ্জ্বল জ্যোতির মধ্যেই আপনাকে ব্যক্ত করেন। ভূলোকের সমস্ত ধীশক্তির প্রবর্ত্তক ও স্বর্লোকের কারণশক্তিরূপী সূর্য্যেই তাঁহার সর্ব্বোচ্চ প্রকাশ।

এ দিকে প্রাচ্যপ্রভাবে রোমে অনেকগুলি অশ্লীল ও বর্ব্বর অনুষ্ঠান প্রচলিত হইল—যেমন মহামাতার সেবকদের রক্তাক্ত নৃত্য ও সীরিয় পুরোহিতদের আপন অঙ্গহানি সাধন। কিন্তু তৎকালে যেমন সকল ধর্ম্মমতের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা চলিতেছিল তেমনি এই সকল অনুষ্ঠানের অদ্ভুত ক্রিয়াকাণ্ডের ভিতর হইতে ধর্ম্মনৈতিক তাৎপর্য্য বাহির করিবার চেষ্টা হইতে লাগিল। ঘোরতর উচ্ছৃঙ্খল উন্মত্ত কাহিনীগুলিও অতিসূক্ষ্ম ব্যাখ্যা দ্বারা পবিত্র বেশ গ্রহণ করিয়া পণ্ডিতদের আনন্দ বর্দ্ধন করিতে প্রবৃত্ত হইল।

জর্ম্মান পণ্ডিত রোমের বহুদেববাদের যে পরিণতি অঙ্কিত করিয়াছেন তাহা এমনি রেখায় রেখায় আমাদের দেশের বর্ত্তমান ধর্ম্ম-বৈচিত্র্য ও তাহার ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়ার ছবি আঁকিয়া দিয়াছে যে ইহার স্বতন্ত্র ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ অনাবশ্যক।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

পরিণাম।

জীবনে নিয়ত যদি
জাগিত মরণ,
মরণে করিত না ত
জীবন হরণ।
না ফুরাত মরণে সে
জীবনের স্বাদ,
না ঘটিত জীবনের
এত পরমাদ।
ফিরে চাহি আপনার
পরিণাম দেখ,
জীবনে মরণে মিলি
হয়ে আছি এক।

শ্রীহেমলতা দেবী।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সাধনা।

ধর্ম্মজগতে আমরা সচরাচর দুই শ্রেণীর লোক দেখিতে পাই। এক শ্রেণীর লোক নীতিপরায়ণ, অন্য শ্রেণীর ভক্তিপরায়ণ। এক শ্রেণীর লোক কেবলি কাজ করিতেছে এবং কর্ত্তব্যজালকে বিস্তীর্ণ করিয়া আর শেষ করিতে পারিতেছেনা, তাহাদের কাজের আকাঙ্ক্ষা যেন আর মিটিতে চায় না। অন্য শ্রেণীর লোক কাজ করিয়াও কাজে বাঁধা পড়িতেছে না, চাওয়া এবং পাওয়াকে এক করিয়া আনন্দে ভরপুর হইয়া রহিয়াছে। এক শ্রেণীর লোকের মধ্যে অবিরত চেষ্টা, অন্য শ্রেণীর লোকের মধ্যে "অকূল শান্তি, বিপুল বিরতি।"

দৃষ্টান্তস্বরূপে একজন ইংরাজ পাদ্রী ও আমাদের দেশীয় একজন যথার্থ ভক্ত, এই দুই জনের চিত্র পাশাপাশি কল্পনা করিতে অনুরোধ করি। পাদ্রী অনেক সৎকর্ম্ম করিয়া থাকেন সন্দেহ নাই,—যাহারা দরিদ্র তাহাদের শিক্ষার জন্য অন্নবস্ত্রের জন্য সর্ব্বদাই তিনি খাটিতেছেন, ধর্ম্ম প্রচার করিতেছেন, দুর্নীতি দূর করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছেন। দিন রাত্রি খাটুনির মধ্যে তিনি এমনি জড়াইয়া আছেন যে ভগবানের ধ্যানধারণারও সময় তাঁহার অল্পই থাকে। দুদণ্ড স্থির হইয়া বসিবার অবকাশ তাঁহার থাকে না।

আমাদের দেশীয় ভক্তের সে সকল বালাই কিছুই নাই। তিনি অল্পই কাজ করেন, কিন্তু কাজ করিতে করিতে রামপ্রসাদ সেনের মত হয়ত আত্মবিস্মৃত হইয়া জমাখরচের হিসাব-খাতায় ভক্তির উচ্ছ্বাসকে লিপিবদ্ধ করিয়া ফেলেন। কাজ তাঁহাকে কোথাও পাইয়া বসে না, তিনি ভগবানের মাধুর্য্যরসে সর্ব্বদাই নিমগ্ন হইয়া আছেন। সকল দৃশ্যে গন্ধে স্বাদে তাঁহারি স্পর্শ পাইয়া পুলকিত হইতেছেন, সকল মানবসম্বন্ধের মধ্যে তাঁহার নিখিলরসামৃত-মূর্ত্তি জাগিতেছে। তাঁহার পরিতৃপ্ত হৃদয় যেন বলিতেছে,—এই যে তিনি আমার অন্নপানে মা হইয়া আমায় খাওয়াইতেছেন, এই যে তিনি সকল দৃশ্য গন্ধ শব্দ রন্ধ্রে করিয়া বাঁশী বাজাইয়া আমার মন হরণ করিতেছেন, এই যে মানুষের সকল কর্ম্মে সকল দুঃখে আঘাতে অপমানে আমার সঙ্গে তাঁহার প্রেমের বিরহ-মিলন-লীলা চলিতেছে। আমার জীবনকে ভিতর হইতে একেবারে অধিকার করিয়া সেই পিতামাতা, সেই স্বামী সেই বন্ধু প্রকাশ পাইতেছেন। এই প্রাপ্তির আনন্দে সেই ভক্তের সকল চাওয়ার অন্ত হইয়া গিয়াছে, তাঁহার আর অভাববোধ নাই।

মোটামুটি এই যে দুই শ্রেণীর সাধকের দুইটি চিত্রের কথা বলা গেল, তাহা আমাদের দেশের ও পশ্চিম দেশের ধর্ম্মসাধনার দুইটি আদর্শ। পশ্চিম দেশের ধর্ম্মসাধনাকে মুখ্যতঃ নীতিপ্রধান বলা যাইতে পারে ও আমাদের ধর্ম্মসাধনাকে মুখ্যতঃ ভক্তিপ্রধান বলা যাইতে পারে।

আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, আধুনিককালে এই দুই দিকের ধর্ম্মসাধনার সামঞ্জস্যের জন্য এদেশে এবং অন্য দেশে উভয় দেশেই একটা চেষ্টার উপক্রম লক্ষিত হইতেছে। ইউরোপ, যে ধর্ম্মনীতিকে আশ্রয় করিয়া ক্রমাগত অগ্রসর হইতে থাকাকেই চরম লাভ বলিয়া মনে করিয়াছিল, মানুষের শক্তির যে কোনখানে সীমা আছে তাহা স্বীকার করিতেই চাহে নাই, সে এখন চলার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ জানাইতেছে। সে বলিতেছে—"নীতিপ্রধান জীবনের বিরুদ্ধে এই যে ভিতরে ভিতরে বিদ্রোহ, যে জীবনে কেবল উত্থান আর পতন, কেবলি উঠিয়া পড়া এবং নূতন করিয়া আরম্ভ করা—তাহার অর্থই এই যে, আমাদের চেতনার মধ্যে এমন সব গভীরতর জিনিস আছে যাহা কেবলি অগ্রসর হওয়ারদ্বারা তৃপ্ত হইতে পারে না; যাহা স্থিতি চাহে, প্রাপ্তি চাহে—জীবনের **ব্যবহারই** যাহার কামনার বিষয় নহে, কিন্তু জীবনের **আনন্দ**।"

এ স্থানটি একজন বিশিষ্ট লেখকের রচনা হইতে অনুবাদ করিলাম, কিন্তু এ কথা আধুনিক কালের সকল মনীষিগণই বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন। ধর্ম্মনৈতিক জীবন যে আধ্যাত্মিক জীবনের সম্পূর্ণতা ও আনন্দে পৌঁছাইতে পারেনা এমন আভাস নানা লোকের মুখে পাওয়া যাইতেছে।

আবার এদিকে আমাদের দেশে অধুনা যে আন্দোলন সকল জাগিয়াছে তাহা আমাদিগকে উল্টা দিকে আঘাত করিতেছে। তাহা বলিতেছে যে আমাদের মধ্যে ভক্তি আছে, মাধুর্য্য আছে, কিন্তু মানবপ্রেম, মানবসেবা, মঙ্গল কর্ম্মের প্রতি স্থিরনিষ্ঠ অনুরাগ এ সকল জিনিস আমাদের মধ্যে নাই। অর্থাৎ ধর্ম্মনীতিকে খুব জোর করিয়া ধরিয়া কর্ম্মকে নানা লোকের মধ্যে সফল করিয়া তুলিবার শক্তি আমাদের মধ্যে কোথাও দেখা যাইতেছে না। সকলের সহিত মিলিবার ও মিলাইবার শক্তির অভাবে আমাদের সমাজে ব্যবস্থা ও নিয়ম কর্ম্মকে কঠিন করিয়া গড়িতেছে না। এমন কোন অনুষ্ঠান এবং প্রতিষ্ঠানই নাই যাহার মধ্যে সকলের সম্মিলিত চেষ্টার একটি রূপ প্রকাশ পাইতেছে। সুতরাং আমাদের আধ্যাত্মিক পরিতৃপ্তি ভাবরসসম্ভোগ মাত্র; তাহা কর্ম্মে সফল হয় নাই, তাহা ধর্ম্মনীতিকে আপন অঙ্গীভূত করিয়া লইয়া বেশ কঠিন ও শক্তিশালী হইয়া উঠে নাই। আমাদের দেশের অনেক লোকের মুখ হইতেই এ সকল কথা আমরা আজকাল শুনিতেছি।

এ কথা বলিতেই হইবে যে নিত্য সত্যকে খণ্ডকালের মধ্যে পূর্ণ করিয়া দেখা কঠিন। এখনকার কালে হয়ত এ দেশে ধর্ম্মনীতিকে এবং অন্য দেশে আধ্যাত্মিক শান্তি ও আনন্দকে প্রাধান্য দিতেছে। সুতরাং এ সকল ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার ধাক্কাধাক্কির মধ্যে পরিপূর্ণ সত্যের অখণ্ড মূর্ত্তিটি কি তাহা চোখে নাও পড়িতে পারে। কেহ একদিক কেহ অন্য দিক্‌কেই বড় করিয়া তুলিবেন।

কিন্তু আমাদের পুরাণে যেমন বলে যে প্রলয়ের মধ্যেই নাকি সৃষ্টি নিহিত থাকে, সেইরকম এই ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ঠেলাঠেলির ভিতর হইতেই আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, পূর্ব্ব পশ্চিমের এবং পশ্চিম পূর্ব্বের অঙ্গ পূরণ করিতেছে। পশ্চিম অত্যন্ত বেশি চলিয়াছে তাই

সে থামিতে চায় এবং পূর্ব্বদেশ অত্যন্ত বেশি থামিয়া আছে তাই সে চলিতে চায়, কেবল ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার স্বাভাবিক নিয়ম হইতেই যে এরূপ ঘটিতেছে তাহা নহে—পূর্ব্ব পশ্চিমে মিলিয়া বিশ্বমানব নামক একটি অখণ্ড নূতন বস্তুর জন্মলাভ হইতেছে।

কলম্বস্ যখন তাঁহার নাবিকদলকে লইয়া নব আমেরিকা আবিষ্কার করিতে বাহির হইয়া পড়েন, তখন তাঁহার সঙ্গিগণের এই ভয় হইয়াছিল যে পৃথিবীর একেবারে প্রান্তসীমায় গিয়া পড়িলে পাতালের অতল গর্ভে তাহারা পড়িয়া যাইবে, কারণ পৃথিবীর গোলত্ব সম্বন্ধে তখনও তাহাদের সুস্পষ্ট ধারণা ছিল না।

ইউরোপ বরাবরই পৃথিবীর ন্যায় সত্যকেও গোল করিয়া অর্থাৎ সম্পূর্ণ করিয়া না দেখিয়া চ্যাপ্টা করিয়াই দেখিয়া আসিয়াছে। মধ্যযুগে সে স্বর্গের সঙ্গে মর্ত্ত্যের বিচ্ছেদ কল্পনা করিয়া ইন্দ্রিয়ের দ্বার রুদ্ধ করিয়া মন্ত্রতন্ত্র দ্বারা কোন মতে স্বর্গে উড়িবার পাখা গজাইবার চেষ্টায় ছিল। কিছুদূর উড়িতেই যখন সে ধূলায় আছাড় খাইয়া পড়িল, তখন পৃথিবীটাই সত্য হইয়া স্বর্গলোক একেবারেই মিথ্যা হইয়া গেল। তখন হইতে কেবলি পাইব, কেবলি চলিব, কেবলি বাড়িব, এই কথাটাই তাহার শয়ন স্বপনের সাথী হইয়া রহিল।

আমরা জানি যে, সাহিত্যই প্রত্যেক দেশের বা জাতির ভিতরের যথার্থ প্রতিকৃতিকে অঙ্কিত করে। দেশের বা জাতির আশা, আকাঙ্খা বেদনা সমস্তই সাহিত্যের ভিতর দিয়া অত্যন্ত বৃহৎ ও বিশ্বব্যাপক হইয়া দেখা দেয়।

ধর্ম্মনীতিকে অর্থাৎ কেবলি উন্নতিলাভের সাধনার আদর্শকেই ইউরোপ চরম আদর্শ মনে করিয়াছে এবং পরিপূর্ণ প্রাপ্তির আনন্দের সাধনাকে সে গ্রহণ করে নাই। একথা যদি সত্য হয়, তবে দেখা যাক্ ইউরোপীয় আধুনিক সাহিত্যের মধ্যে একথার সাক্ষ্য পাওয়া যায় কিনা।

আমার তো মনে হয়, যে ইউরোপীয় আধুনিক সাহিত্যের ভিতরেও আমরা এই কথাই অনুভব করি। সেখানে আমরা প্রাপ্তির আনন্দের কথা তেমন করিয়া পাইনা, যেমন ক্রমাগত সংগ্রামের দ্বারা কেবলি গতির মুখে ও বৈচিত্র্যের মধ্যে জীবনকে নীত করিবার কথা পাই। জীবনের মধ্যে পথটাই আসল, গন্তব্যস্থান থাক্ বা নাই থাক্ তাহার খোঁজ লইবার কোন আবশ্যকতা নাই; কারণ জীবন মানেই অনন্ত বৈচিত্র্য এবং তাহার সকলটারই স্বাদ আমাদিগকে পাইতে হইবে—এই কথাটাই আধুনিক পাশ্চাত্য কবিগণ একটু বেশি জোরের সঙ্গেই বলিয়া থাকেন।

আমার আশঙ্কা হয় যে আমাদের ন্যায় বিধিনিষেধ প্রবল গতানুগতিক দেশে জীবনকে কেবল জীবন বলিয়াই বড় করিয়া ধরিবার ও পূজা করিবার তাৎপর্য্য আমরা ঠিকমত না বুঝিতেও পারি। তাহার কারণ ইউরোপে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে যে কত বড় করিয়া দেখে তাহা আমরা জানিনা। বস্তুতঃ ইহা অপেক্ষা বিস্ময়কর বস্তু পৃথিবীতে আর কি কিছুই আছে? ইহাকে সংস্কারপাশমুক্ত স্বাধীন, স্ফূর্ত্ত, ও সম্পূর্ণ করিবার জন্য সে দেশের ধর্ম্মে রাষ্ট্রে, সমাজে, বিপ্লবের পর বিপ্লব কেবলি তরঙ্গিত হইতেছে। প্রত্যেক মানুষ এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্রস্বরূপ হইয়া আপনাকে আপনি আশ্চর্য্যরূপে উপলব্ধি করিবে, ইহাই সে দেশের মর্ম্মের অভিলাষ, সে দেশের প্রাণের কথা। সেই কারণেই জীবন কেবলি চলিতে থাকিবে, ইহাতে সে দেশের লোক এত আনন্দ বোধ করে—সেই চলাতেই তো জীবনের সৌন্দর্য্য, জীবনের বৈচিত্র্য—নহিলে তাহা একঘেয়ে একরঙা ও শ্রীভ্রষ্ট হইয়া যায়।

জর্ম্মান মহাকবি গ্যয়টেরচিত ফাউষ্ট নাটকের প্রথম দৃশ্যে, যেখানে ফাউষ্ট আপনার অবরুদ্ধ জ্ঞানের গণ্ডী ছাড়াইয়া জগতের বাস্তবিকতার মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়িবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে, সেখানে আধুনিক জীবনের এই গতিতত্ত্বের সমস্ত ভাবটি গ্যয়টের এই কয়েকটি ছত্রে চমৎকার প্রকাশ পাইয়াছে;—

> "জীবনের বানে, কর্ম্ম তুফানে
> চলি, ফিরি, ছুলি, ঘুরি—
> রহি আমি সব জুড়ি!
> জনম-মরণ রঙ্গ
> মহাসাগর তরঙ্গ।
> জাল সদা চলে বেড়ে
> গেঁথে চলে জীবনেরে
> প্রাণময় যে বসন মহেশ্বর পরেন আনন্দে
> বুনি তাহা মহাকাল-বয়নের ধ্বনিময় তন্ত্রে!"

কবি গ্যয়টের বিশ্বাস ছিল যে আমাদের জীবনের ভাল মন্দ প্রত্যেক অভিজ্ঞতারই মূল্য আছে। অভিব্যক্তির নিয়ম উদ্ভিদতত্ত্বে গ্যয়টেই প্রথম আবিষ্কার করিয়াছিলেন যে, বৃক্ষের মূল, শাখা প্রশাখা, পত্র, ফুল ও ফল একটা হইতে অন্যটা উদ্ভিন্ন হইয়াছে; অর্থাৎ এ সকল বৈচিত্র্যের মূলে একই জিনিস বিদ্যমান। তেমনি তাঁহার বিশ্বাস ছিল যে জীবনেরও সকল বিচ্ছিন্ন অভিজ্ঞতার মধ্যে ঐ ক্রমাগত চলাটাই একটা ঐক্যকে জালের মত গাঁথিয়া তোলে। না চলিলে জীবন একজায়গায় বাঁধা পড়িয়া মিথ্যা হইয়া যায়।

ফাউষ্ট নাট্যে ফাউষ্ট এই বিচিত্র বস্তুর অভিজ্ঞতার রাজ্যকে ত্যাগ করিয়া কেবল পুঁথিগত কল্পনার দ্বারা

সমস্ত সত্যকে আয়ত্ত করিবার চেষ্টায় ছিল ; এই উপায়ে তাহার মানবপ্রকৃতি আপনার খোরাক পায় নাই। সেই জন্য খুব একটা প্রচণ্ড পাপের মধ্যে, পঙ্কের মধ্যে তাহাকে ডুবাইয়া গ্যয়টে তাহার মুক্তির সূচনা করিয়া দিলেন। ঐ নাট্যে তিনি এই কথাটিই বলিলেন যে, চলিতেই হইবে, স্থিতিশীলতার মধ্যে মুক্তি নাই।

গ্যয়টে তাঁহার অন্যান্য রচনাতেও বহুস্থানে বলিয়াছেন যে, বর্ত্তমান হইতে বাস্তব হইতে সুদূরস্থিত একটা অনন্তত্বের বোধ তাঁহার কাছে একেবারে কাল্পনিক ও শূন্য বলিয়া বোধ হয়। বস্তুত এই কারণেই তিনি খৃষ্টধর্ম্মের বিরোধী ছিলেন। খৃষ্টধর্ম্মে স্বর্গকে মর্ত্ত্য হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিয়াছে—সে একটাকে বলে চিরন্তন অন্যটাকে বলে ক্ষণিক। ক্ষণিকের মধ্যে যে চিরন্তন নাই সে চিরন্তনকে মানুষ চায় না, সে চিরন্তন সত্যই নয়। ইতালী হইতে ভ্রমণ করিয়া আসিয়া গ্যয়টে ইতালীর চিত্রশালাসমূহে মধ্যযুগের ভক্তিভাবপূর্ণ খৃষ্টীয় পুরাণের চিত্র সকল দেখিয়া সে গুলিকে "বীভৎস" জিনিস বলিয়া নিন্দা করিয়াছিলেন। তাহার কারণ তাঁহার দৃষ্টিটা ছিল আসলে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি—জীবনকে তিনি দেখিতেন একটা চলনধর্ম্মী পরিবর্ত্তনশীল জিনিসের মত, যাহার নিত্যগতিই নিত্য আনন্দ জাগাইতেছে।

গ্যয়টেকে যেমন দেখা গেল তেমনি ব্রাউনিং-য়ের মধ্যেও এই গতিতত্ত্বের পরিচয় লাভ করা যায়। আমার তাই বিশ্বাস যে এটা ইউরোপের মজ্জাগত কথা। সেখানে চলাটাতেই লোকে আনন্দ অনুভব করে এবং নিশ্চেষ্টতাকে জড়ত্ব ও মৃত্যু মনে করে। কেবলি সংগ্রাম করিয়া অগ্রসর হইব, কেবলি পাইতে থাকিব—ইহাই সেখানকার অন্তরতর বিশ্বাসের কথা।

ব্রাউনিং খৃষ্টধর্ম্মে খুবই আস্থাবান ছিলেন। খৃষ্টধর্ম্মের মূলসূত্রটি আমি অন্য এক প্রবন্ধে ব্যাখ্যা করিয়াছি এইরূপ যে, ভগবান মানুষের মধ্যে তাহার আপন হইয়া নামিয়া আসেন এবং মানুষ তাহার প্রেমের আত্মবিসর্জ্জনের দ্বারা ভগবানের দিকে উন্নীত হয়। সেই সূত্রটির দ্বারাই ব্রাউনিং সমস্ত মানবজীবনের সুখ দুঃখ পাপপুণ্যের বিচিত্রতাকে গাঁথিয়া এক করিয়া দেখিতে পারিয়াছিলেন। সেইজন্য ঘোরতর পাপের চিত্র হইতেও তিনি নিরস্ত হন নাই।

"ঈশ্বর জানেন মোরা কতই পতিত !
তবু এত হীন নহি, কভু যে জীবনে
আসিবে না অকস্মাৎ মুহূর্ত্ত এমন
যখন এ অন্তরের সুচির সম্পদ্
হেরিব উজ্জ্বল করি ; মিথ্যা আবরণ
বিদীর্ণ করিয়া। জানিতে পারিব স্থির
চলিয়াছি সত্য পথে কিম্বা ভুল পথে
বিজয়গৌরবে কিম্বা শূন্য ব্যর্থতায় !"—ক্রিষ্টিনা।

তথাপি প্রেমের এমন দৃষ্টি থাকা সত্ত্বেও কোথাও যে একেবারে চরম প্রাপ্তি আছে এ বিশ্বাস ব্রাউনিং-য়েরও নাই। তাঁহার প্রেমের তত্ত্বটি কোন জায়গায় গিয়া বলে নাই, বেদাহমেতং—আমি জানিয়াছি, আমি পাইয়াছি। সে বড় জোর উপরে উদ্ধৃত শ্লোকের মত বলিয়াছে যে কোন কোন মুহূর্ত্তে আভাস মাত্র পাইয়াছি। যখন প্রেম জাগিয়াছে, তখন পাপের নিবিড় অন্ধকারের রন্ধ্র ভেদ করিয়া অনন্তের আলো আসিয়া পৌঁছিয়াছে। তখন বুঝিয়াছি এই যে, এমনি করিয়া জীবনের তরঙ্গে অভিহত হইতে হইতে ক্রমাগত এক এক মুহূর্ত্তে পাইতে থাকিব, যে 'moment made eternity'—যে মুহূর্ত্ত অনন্ত হইয়া উঠিবে।

নুম্‌ফোলেপ্টস্ ('Numpholeptos') নামক ব্রাউনিং-য়ের এক প্রেমের কবিতায় ইহার সাক্ষ্য পাই। কবিতাটি এই :—একজন মানুষ এক অপ্সরার প্রতি প্রণয়াসক্ত হইয়াছিল। সে তাহার প্রণয়প্রার্থনা পূর্ণ করিতে রাজি ছিল, যদি সেই প্রণয়ীটি তাহার একটি দাবী মিটাইতে সমর্থ হয়। দাবীটি এই যে মানবপ্রণয়ীটিকে জীবনের সকল অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়াই যাইতে হইবে অথচ অক্ষত অম্লান থাকিতে হইবে, কোন কালিমা তাহাকে কোথাও স্পর্শ করিবে না। এই কল্পিত নারীটি পার্থিব জীবনের সকল পথের মোড়ের মাথায় একেবারে অচঞ্চল শান্ত হইয়া দাঁড়াইয়া আছেন। পথগুলি আবেগের নানা বর্ণে রঞ্জিত হইয়া বিচ্ছুরিত হইতেছে, কিন্তু সেই রমণী ধ্রুব শুভ্র নিরঞ্জন আলোকরশ্মির মত স্থির দণ্ডায়মান !

"এ কোন্ মায়ার পথে আমি চলিয়াছি !

* * * *

সকল পথের ঐ মর্ম্মমাঝে তুমি
তোমারি অন্তরতম পূর্ণতা হইতে
বাহিরিছে রশ্মিরাজি নানাবর্ণময় !"

এই নানা বর্ণরঞ্জিত পথের ভিতর দিয়া তাহার প্রণয়ীকে শুভ্র হইয়া তাহার কাছে আসিতে হইবে, এই তাহার দাবী। কিন্তু হায়, সে দাবী মিটাইবার সাধ্য নাই ; অভিজ্ঞতার নানা রং লাগিবেই, সুতরাং প্রণয়ও কোন দিন সম্পূর্ণ হইবে না।

এক একটি পথের ভিতর দিয়া যখনই সে রঞ্জিত হইয়া উপস্থিত হইতেছে, তখন

"তুমি যেন চিনিতে না পার ! অবিশ্বাস !
অবাক হেরিয়া মোর এ বীভৎস রূপ !"

সুতরাং কেবলি নূতন নূতন অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়া

ক্রমাগতই চলিতে হইবে, স্থুম্‌ফোলেণ্টস্ কবিতাটির ইহাই মর্ম্মকথা।

ব্রাউনিং-য়ের ন্যায় কবি ওয়াণ্ট্ হুইট্‌ম্যান্ সমস্ত মানুষের সুখ দুঃখ উত্থান পতনকে খুব একটি পূর্ণতার ভাবের মধ্যে বড় করিয়া দেখিয়াছিলেন। যে কোন অবস্থায় দারুণ অধঃপতনের যে কোন নিম্নতম সোপানে মানুষ থাকুক্ না কেন, তাহার সকল আবরণ ভেদ করিয়া তাহার অন্তরতর নির্ম্মল ঈশ্বর মূর্ত্তিকে প্রত্যক্ষ করিয়া এই কবি মানুষকে ডাক দিয়া গাহিয়াছেন :—

"হও না যে কেহ তুমি, আমি জানি স্বপ্ন-পথে ভ্রমিতেছ
তুমি!
এই সব কাল্পনিক মিথ্যা যাহা ঘিরি আছে—খসিয়া
পড়িবে তাহা নিশ্চয়ই জানি!
এখনি এ মুহূর্ত্তেই তব মুখ, হাসি, বাক্য, গৃহ, ব্যবসায়
ব্যবহার, দুঃখকষ্ট, অজ্ঞান ও পাপ
কোন্‌খানে যেতেছে মিলায়ে
যে আত্মা তোমার সত্য—সত্য যে শরীর—
পূর্ণ তাহা সম্মুখে আমার!" *

কিন্তু তাঁহারও সমস্ত কবিতার বক্তব্য ঐ যে, কেবলি চলার দ্বারাই আমাদের জীবনের পরিধি বিস্তৃততর হয়। আমাদের কোথাও বিশ্রামের উপায় নাই—কেবলি চলিতে হইবে :—

"চলে এস! থামিতে নারিব মোরা হেথা।
দীর্ঘকাল সঞ্চিত এ মাধুর্য্য-ভাণ্ডার যত প্রিয় হোক্
হোক্ যত আরামের এই ঘর বাড়ি
চলে এস! থামিতে নারিব মোরা হেথা।" †

চলিতেই হইবে, কারণ সকলেই চলিয়াছে—বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে কেহই কোথাও বসিয়া নাই, সুখ দুঃখ আলো অন্ধকারের ভিতর দিয়া দিন রাত্রি মাস বৎসর যুগযুগান্ত মানবযাত্রী চলিয়াছে—

"চলেছে চলেছে তা'রা! আমি জানি তা'রা চলিয়াছে!
শুধু জানিনা কোথায়
কিন্তু জানি চলিয়াছে সকলের চেয়ে মহৎ কল্যাণ পানে।"†

তবেই দেখা গেল যে আমরা ইউরোপীয় সাহিত্যে এই চলিবার দিক্‌টা যেমন করিয়া দেখি, থামিবার দিক্‌টা পাইবার কথাটা তেমন করিয়া দেখিতে পাই না। আমি তাহার কারণ বলিয়াছি যে আধ্যাত্মিক উপলব্ধি ইউরোপে এখনো তেমন পরিপুষ্ট হয় নাই যেমন ধর্ম্মনীতির বোধ। কেবল সম্প্রতি ধর্ম্মনীতির দ্বন্দ্বযুদ্ধ ছাড়াইয়া অধ্যাত্ম-শান্তির বিরতির মধ্যে ঝাঁপ দিয়া পড়িবার জন্য ইউরোপীয় চিত্তে একটা আকুপাকু চলিয়াছে।

কেয়ার্ড তাঁহার Introduction to the Philosophy of religion-এ এক স্থানে বলিয়াছেন যে, "আধ্যাত্মিকতা ধর্ম্মনীতির চেয়ে এইজন্য শ্রেষ্ঠ যে ধর্ম্মনীতির আদর্শ ক্রমোন্নতির ভিতর দিয়া উপলব্ধ হয় কিন্তু অধ্যাত্মসাধনার লক্ষ্য একেবারেই 'এই যে এইখানে' এমন প্রত্যক্ষবৎ সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধ হইয়া থাকে।"

ইউরোপীয়গণ নিজেরা এ কথা কোন কোন জায়গায় স্বীকার করিলেও ভিতরে ভিতরে এই কথাটির প্রতি তেমন আস্থাবান্ নহেন। তাহার প্রমাণ পাই যখন ভারতবর্ষীয় ধর্ম্ম সম্বন্ধে তাঁহারা আলোচনা করেন। তাঁহারা ভাবেন যে ভারতবর্ষ যে বলিয়াছে যে, সর্ব্বোচ্চ সত্যকে একেবারে করতলন্যস্ত আমলকবৎ ধরা যায়, তাহাকে "এষঃ" এই বলিয়া চোখে দেখা যায়, আস্বাদন করা যায়, তাহার মধ্যে আনন্দে ভরপুর হইয়া অষ্টপ্রহর বাস করা যায়; স মোদতে মোদনীয়ং হি লব্ধা, তরতি শোকং তরতি পাপ্মানং গুহাগ্রন্থিভ্যো বিমুক্তোঽমৃতো-ভবতি—সমস্ত শোক, সমস্ত পাপকে দূরে ফেলিয়া আনন্দে একেবারে ওতপ্রোত হইয়া অচঞ্চল হইয়া থাকা যায়—এ সকল কথা অলীক এবং এ রকম শান্তরসাস্পদ সাধনা মানুষকে তামসিকতার দিকেই লইয়া যায়। তাঁহারা ইহাকে Quietism অর্থাৎ উদাসীনতার সাধনা নাম দিয়া ব্যঙ্গ করিয়াও থাকেন। ভারতবর্ষের মধ্যে অনেক পণ্ডিতমূর্খও সেই ব্যঙ্গে যোগ দান করিয়া বুদ্ধির পরিচয় দেন।

কিন্তু ভারতবর্ষ যদি কেবল আধ্যাত্মিক সাধনার দিকে ষোল আনা ঝোঁক দিয়া নৈতিক সাধনাকে একেবারে অবজ্ঞা করিত—যদি দেখিতাম, ভাবরসসম্ভোগ করাই পর্য্যাপ্ত এই কথা সে বলিয়াছে, গুহাগ্রন্থি হইতে বিমুক্ত হইবার জন্য কর্ম্ম করিতে হইবে এ কথা বলে নাই,—এ কথা বলে নাই যে

ন কর্ম্মণামনারম্ভান্নৈষ্কর্ম্ম্যং পুরুষোঽশ্নুতে
কর্ম্মের অনুষ্ঠান না করিয়া কেহ জ্ঞান লাভ করিতে পারে না
নচ সন্ন্যসনাদেব সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি

কেবল মাত্র সন্ন্যাসেই সিদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়া যায় না—তবে এ সকল অপবাদ সহ্য করিতে রাজি ছিলাম। ভারতবর্ষ ধর্ম্মনৈতিক সাধনাকেও স্বীকার করে কিন্তু তাহাকে পথ বলিয়া জানে মাত্র, আধ্যাত্মিক সাধনার দ্বারা পরমানন্দ-লাভই তাহার গন্তব্যস্থান।

সেই জন্য যাহা আর কোথাও এমন জোরের সঙ্গে বলা হয় নাই তাহাই ভারতবর্ষ বলিয়াছে যে পরিবর্ত্তনের নিয়ম, অভিব্যক্তির নিয়ম সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে কাজ করিলেও একটি জায়গা আছে যেখানে সমাপ্তি—কিন্তু শেষ নহে—অনন্ত পরিপূর্ণতা—সে আত্মায়। সেই খানেই

* "To you" নামক কবিতা হইতে।
† "Song of the open road" নামক কবিতা হইতে।

কেয়ার্ড যাহাকে here and now realisation বলিয়াছেন তাহাই আছে। সেখানে সকল চলা থামিয়াছে, সকল খণ্ডতা মিলিয়াছে, সকল বৈচিত্র্য ঐক্য লাভ করিয়াছে। সে অখণ্ড, অদ্বৈত পরিপূর্ণ আনন্দময় অন্তর-বাহির-পূর্ণ-করা সত্তা।

ইউরোপীয় কাব্যে যেরূপ দেখা গেল, তেমনি যদি আমরা ভারতবর্ষীয় কোন তত্ত্বদর্শী কবির কাব্য আলোচনা করি, তবে কি ইউরোপীয় কবিদের মত সেখানেও দেখিতে পাইব যে, জীবনের অভিজ্ঞতাগুলি যেমন সিঁড়ির ধাপের মত একটা আরেকটার উপরে উঠিয়াছে, কেমন সবটাকে মিলাইয়া একটা চলনশীল ব্যাপ্তির পরিচয় পাওয়া যাইতেছে? না। এমন করিয়া আপনাকে আপনার গণ্ডী দিয়া ঘিরিয়া রাখিয়া জীবনকে কেবলি নানাখানার মধ্যে আমাদের কবিরা ছাড়িয়া দেন্ নাই।

ইউরোপীয় কাব্য খুবই বাস্তবাশ্রিত সন্দেহ নাই, কিন্তু তথাপি তাহার অমৃতধারা যে মানুষের হৃদয়কে পরিতৃপ্ত করিতেছে না তাহা আধুনিক একজন লোকের একটি উক্তি হইতেই প্রতীয়মান হইবেঃ—"সমস্ত জীবনের সত্তাটা কি একটা অন্তবিহীন ইস্কুলের মত, যাহার খেলিবার প্রাঙ্গণের দেয়ালগুলি পর্য্যন্ত বিধিনিষেধের ছাপমারা, যাহার উপরের জানালা হইতে মাষ্টাররাও পাহারা দিতেছে? আমাদের কি এই কথা বলিয়াই নিজেদের ভুলাইতে হইবে যে চেষ্টাই পুরস্কার?"

ভারতবর্ষের বড় ধর্ম্মসাহিত্যে এবং কাব্যে প্রাপ্তির কথাই আনন্দে বলিয়াছে, পথের কথা তেমনি করিয়া বলে নাই। অর্থাৎ সে সকল কবিতা objective কিনা, বাহিরের বাস্তব সত্যের উপর দাঁড়াইয়াছে কি না সে সম্বন্ধে সন্দেহ হইতে পারে। তবু এ কথা বলিতে হইবে যে, তাহার মধ্যে বিচিত্রতার ছবি নাই বটে কিন্তু বিচিত্রতার স্বাদ আছে। তাহা বিনা মূলের গাছের মত, "সাখা পত্র নহী কছু তাকে, সকল কমল দল গাজৈ"—শাখাপত্র কিছুই তাহার নাই, সর্ব্বত্রই কমলদল বিকশিত। পরিপূর্ণ প্রাপ্তির আনন্দের সেই কমলদলই তাহার মধ্যে একমাত্র দেখিবার বিষয়।

উপনিষদ্ হইতে আরম্ভ করিয়া মধ্যযুগের কবীর, নানক, দাদূ প্রভৃতির রচনায়, বাংলাদেশের বৈষ্ণব সাহিত্যে এবং আধুনিক বাংলা গীতিকাব্যের মধ্যে আধ্যাত্মিক এবং ধর্ম্মনৈতিক এই দুই সাধনার বার্ত্তাই পরিপূর্ণভাবে মিলিয়া আছে।

প্রথমেই উপনিষদের কথা ধরা যাক্।

অধ্যাপক পোল্ ডয়্সন্ তাঁহার উপনিষদের তত্ত্ব নামক গ্রন্থে এক জায়গায় বলিয়াছেন যে বুদ্ধির মুক্তির দিকে আমাদের ঋষিরা যত দৃষ্টি দিয়াছিলেন, এমন বাসনার মুক্তির দিকে দেন্ নাই।

কিন্তু তাহার কারণ এই যে, উপনিষদ্ যে কাব্য; তাহাতো অন্যান্য ধর্ম্মগ্রন্থের ন্যায় কিসে মানুষের মুক্তি হইবে, গোড়া হইতেই সেই চিন্তায় প্রবৃত্ত হয় নাই। সে একেবারে দেখিয়াছে যে, আনন্দ হইতে সমস্ত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড জন্ম লাভ করিয়াছে এবং সেই আনন্দে, সেই প্রাণে সমস্তই অহরহ কম্পিত হইতেছে। বিশ্বের সেই আনন্দময় প্রকাশকে শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত আত্মার ভিতরেই উপলব্ধি করা যায়, এই কথা উপনিষদ্ বলিয়াছে। জ্ঞানের মুক্তিই মুক্তি, না বাসনার মুক্তিই মুক্তি, এ সকল প্রশ্নই তাহার মধ্যে নাই। তথাপি ডয়্সন্ যাহা বলিয়াছেন তাহা সত্য নয়। কারণ উপনিষদে নানাস্থানে এই ধরণের উক্তিও দেখিতে পাই;—

নাবিরতো দুশ্চরিতান্নাশান্তো না সমাহিতঃ
না শান্তমানসোবাপি প্রজ্ঞানেনৈনমাপ্নুয়াৎ।

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি দুষ্কর্ম্ম হইতে বিরত হয় নাই, ইন্দ্রিয় চাঞ্চল্য হইতে শান্ত হয় নাই, যাহার চিত্ত সমাহিত হয় নাই এবং কর্ম্মফলকামনাপ্রযুক্ত যাহার মন শান্ত হয় নাই, সে ব্যক্তি কেবল জ্ঞানের দ্বারা পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হয় না।

ধর্ম্মনৈতিক জীবনের প্রতি দৃষ্টি না থাকিলে এ সকল কথা কখনই তাহার ভিতরে স্থান পাইত না। ক্ষেত্র চাষ করিতেই হইবে, আগাছা উপড়াইয়া মাটী হলদ্বারা দীর্ণ করিয়া ঢেলা ভাঙ্গিয়া জমি প্রস্তুত করিতে হইবে;—কিন্তু কেবলি হল চালনা করিব, কোথাও থামিব না, একথা এ দেশীয় সাধকেরা বলেন না। তাঁহারা বলেন যে, এক জায়গায় থামিতেই হইবে। যখন আষাঢ়ের মেদুর শ্যামল মেঘে দশদিক্ আচ্ছন্ন হইবে, তখন ধারাবর্ষণে সমস্ত উপ্তবীজ দেখিতে দেখিতে শ্যামল শস্যের অপূর্ব্ব প্রকাশকে বিকীর্ণ করিয়া দিবে, তখন চেষ্টার আর কোন প্রয়োজন থাকিবেনা। শেষ আছেই, কেবলি চেষ্টা নয়—এই কথাই আমাদের শাস্ত্র সাহিত্যের ভিতরের কথা।

কবীরও ঠিক এই কথাই বলিয়াছেন;—

"জবলগ মেরী মেরী করে
তবলগ কাজ একৌ না সরে॥
জব মেরী মমতা মর্ যায়
তব লগ প্রভু কাজ সবারে আয়॥
জ্ঞানকে কারণ করম কমায়
হোয় জ্ঞান তব করম না সায়॥
ফল কারণ ফুলৈ বনরায়
ফল লাগে পর ফূল সুখায়॥"

"যতক্ষণ লোক আমার আমার করে—ততক্ষণ একটি

কার্য্যও নিষ্পন্ন হয় না। যখন আমার আমিত্ব মরিয়া যায় তখনি প্রচুর কার্য্য সুসম্পন্ন হয়। জ্ঞান উৎপন্ন হইবার জন্যই কর্ম্ম করা, জ্ঞান হইলে কর্ম্ম বিনষ্ট হইয়া যায়। ফলের জন্য পুষ্প উদ্‌গত হয় ফল হইলে পুষ্প আপনিই ঝড়িয়া পড়ে।" *

উপরে কবীরের যে শ্লোক উদ্ধৃত করা গেল, তাহা হইতে মনে হইতে পারে যে তিনি বুঝি কেবল কর্ম্ম কতদূর পর্য্যন্ত এবং প্রাপ্তিরই বা কোথায় আরম্ভ তাহা নির্দ্দেশ মাত্র করিয়াছেন, কিন্তু তাহা নহে। সমস্ত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সঙ্গে আত্মার পরমানন্দময় যোগ ও একাত্মকতার ভাবটি তাঁহার কবিত্বকে উৎসারিত করিয়াছে। সেই প্রাপ্তির আনন্দে তিনিও ভরপুর। তিনি বলিতেছেন ;—

"ইস ঘট অন্তর বাগ বগীচে
ইসী মেঁ সিরজনহারা।
ইস ঘট অন্তর সাত সমুন্দর
ইসী মেঁ নৌলখতারা।
ইস ঘট অন্তর পারসমোতী
ইসী মেঁ পরখনহারা—
ইস ঘট অন্তর অনহদ গরজৈ
ইসী মেঁ ফুটত ফুহারা।
কহত কবীর সুনো ভাই সাধো
ইসী মেঁ সাঁঈ হমারা।"

"এই ঘটের মধ্যেই কুঞ্জ নিকুঞ্জ, ইহারি মধ্যে তাহার সৃষ্টিকর্ত্তা। এই ঘটের মধ্যে সপ্ত সমুদ্র, ইহার মধ্যে নবলক্ষ তারা, এই ঘটের মধ্যেই পরশমণি, ইহারি মধ্যে রত্ন-পরীক্ষক। এই ঘটের মধ্যে অনীব নিনাদিত, ইহারি মধ্যে উৎস উঠিতেছে, কবীর কহেন, শুন ভাই সাধু, ইহারি মধ্যে আমার স্বামী।" *

ইউরোপীয় কবির যে সর্ব্বোচ্চ উপলব্ধি,—"আমি সেই একটি আবির্ভাব অনুভব করিয়াছি, যাহা সমুচ্চ চিন্তার আনন্দে আমায় অধীর করিয়া তুলিতেছে ; সে একটি সমস্তের সঙ্গে সমস্তের গভীরতর যোগের পরম চৈতন্য"†—আমি নিশ্চয় বলিতে পারি যে সেই সর্ব্বোচ্চ উপলব্ধিকেও কবীরের এই বাণী অতিক্রম করিয়াছে। এ যেন অন্তঃপুরের দরজার বাহিরের কথা—ভয়ে ভয়ে বলা যে আমি অনুভব করিয়াছি। কবীরের কবিতা তো তাহা নয়। সে বলিতেছে এই আমারি মধ্যে কুঞ্জনিকুঞ্জ পুষ্পিত, সপ্ত সমুদ্র উদ্বেল, নবলক্ষ তারা প্রকাশিত, আমিই ইহার, আমিই এই। এ একাত্মকতা এ বিশ্বযোগ এমন ভাষায় কোন্ ইউরোপীয় কবির মুখে প্রকাশ পাইয়াছে জানি না!

* শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন কর্ত্তৃক অনুবাদিত কবীরের বাক্যাবলী।

† ওয়ার্ডস্বার্থের কবিতা।

অথচ আশ্চর্য্য এই যে কেবলি আত্মগতভাবের মধ্যে বাঁধা থাকিবার কোন লক্ষণ কবীরের মধ্যে দেখা যায় না। বিশ্বের বস্তুগত বাহ্য সত্তাকেও তিনি তেমনই স্বীকার করেন, যেমন তাঁহার নিজের উপলব্ধিকে। এক রকম করিয়া প্রত্যক্ষ জগৎকে বাদ দিয়া জগতের দার্শনিক ভাবটিকে খুব বড় করিয়া দেখান যাইতে পারে। কিন্তু কবীর যে কবি, তিনি রূপ-রস-গন্ধ-শব্দময় জগৎকে মায়া-ছায়া বলিয়া উড়াইতে কি পারেন? তিনি সীমাকে এবং অসীমকে, ভাবকে এবং রূপকে, বিচিত্রকে এবং এককে গায়ে গায়ে মিলাইয়া দেখিয়াছেন। নিম্নে উদ্ধৃত শ্লোকটিই তাহার প্রমাণ ;—

"ঐসালো নহিঁ তৈসালো
মৈঁ কেহি বিধি কথৌ গম্ভীরালো।
ভীতর কহুঁ তো জগময় লাজৈ
বাহর কহুঁ তো ঝূটা লো।
বাহর ভীতর সকল নিরন্তর
চিত অচিত দউ পীঠালো।
দৃষ্টি ন মুষ্ট পরগট অগোচর
বাতন কহা ন জাঈ লো।"

"এমন নহেন তিনি তেমন গো, কেমন করিয়া সেই গম্ভীর কথা বলিব গো। যদি বলি তিনি অন্তরে আছেন, তবে বিশ্বজগৎ লজ্জায় পড়ে—যদি বলি তিনি বাহিরে, তবে যে সে কথা মিথ্যা হয় গো। বাহির ভিতর সকলকেই নিরন্তর করিয়া আছেন—চেতন অচেতন এ দুই তাঁহার পাদপীঠ। তিনি দৃষ্টও নহেন তিনি প্রচ্ছন্নও নহেন, তিনি প্রকটও নহেন অগোচরও নহেন। বাক্যে যে সে বলা যায় না গো।"*

এ সকল উক্তি নৈতিকবোধমাত্রের ন্যায় কোন খণ্ডতাবোধের উক্তি নয়, পরন্তু বিশ্ববোধের উক্তি। এই উক্তিই ভারতবর্ষের, এ কথা আমাদের নিশ্চয় জানিতে হইবে। আমাদের শেষ লক্ষ্য কেবল অন্তহীন শক্তি ও উন্নতি লাভ নহে, আমাদের শেষ-লক্ষ্য সমগ্রের সঙ্গে সমগ্রের যোগ—সমগ্র সত্তার সঙ্গে সমগ্র জীবনের যোগ।

"বিশ্ব সাথে যোগে যেথায় বিহারো
সেইখানে যোগ তোমার সাথে আমারো।"

বাহির ভিতরকে নিরন্তর করিবার সাধনাই সকলের চেয়ে সত্যতম সাধনা এবং বৃহত্তম সাধনা, এই কথা আমাদের দেশেই বলা হইয়াছে।

* শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন কর্ত্তৃক অনুবাদিত কবীরের বাক্যাবলী।

কত যুগ ধরিয়া চৈতন্যময় জীব এই পৃথিবীতে আপনার পরিবেষ্টনের সম্পূর্ণ উপযোগী হইবার জন্য কত সংগ্রাম করিয়া ক্রমাগত নানা বিশিষ্ট বিশিষ্টতর অভিব্যক্তিতে প্রকাশ পাইয়াছে। অবশেষে মানুষে আসিয়া আত্মচৈতন্য জিনিসটা উদ্ভূত হইয়াছে। এই আত্মচৈতন্যই কি কম সংগ্রাম, কম বিরোধ করিল? ভিতরের সঙ্গে বাহিরের, আপনার সঙ্গে আপনার চেয়ে যাহা বড় তাহার, আবার আপনার ভিতরে যে নানা বৃত্তি রহিয়াছে তাহাদের পরস্পরের সঙ্গে পরস্পরের কত লড়াই! সে সকল সংগ্রাম পার হইয়া আজ আবার আত্মচৈতন্য ছাড়িয়া বিশ্বচৈতন্যে উঠিবার জন্য মানবের মধ্যে প্রয়াস লক্ষিত হইতেছে। কবি রবীন্দ্রনাথ ইহাকেই বিশ্ববোধ নাম দিয়াছেন। সেই চৈতন্যে উত্তীর্ণ হইলেই সকল সংগ্রামের অবসান, সকল বিরোধের সমাপ্তি।

সেই জন্য প্রবন্ধারম্ভেই আমি বলিয়াছি যে, আধুনিক যুগে পূর্ব্ব পশ্চিমে মিলিয়া বিশ্বমানব নামক একটি অখণ্ড বস্তুর জন্ম লাভ হইতেছে। আমি জোর করিয়া বলিতেছি যে ইউরোপীয় দর্শন বিজ্ঞানে আজকাল এই বিশ্ববোধের কথাই নানা দিক্ দিয়া জাগিয়া উঠিতেছে; আবার আমাদের দেশের আধুনিক সাহিত্য, কাব্য, শিল্প, ধর্ম্মসাধনা সমস্তই এই বিশ্ববোধের বৃহৎ ভাবের দ্বারা উদ্বোধিত ও অনুপ্রাণিত হইতেছে। কি আশ্চর্য্য, যে বিশ্বমানবের এই নূতন জন্মলাভের পরম মঙ্গলমুহূর্ত্তে আমরা জীবন ধারণ করিয়া আছি! গুটি হইতে প্রজাপতি বাহির হইলে বনের সমস্ত পুষ্পরাজির নিগূঢ় মর্ম্মকোষে যেমন একটা অনমুভূত পুলক কোথা হইতে কাঁপিতে থাকে তেমনি সমস্ত মানুষ এদেশে এবং বিদেশে এই বিশ্ববোধ, এই অখণ্ড প্রাপ্তির আনন্দানুভূতিময় জীবনে সকল খণ্ডতার সংস্কারের বাধা বিদীর্ণ করিয়া বাহির হইবার উপক্রম করিতেছে বলিয়া সকল হৃদয়ের শতদলমর্ম্মকোষের মধ্যে তাহার বার্ত্তা কি আজ কম্পিত হইতেছেনা?

শ্রীঅজিতকুমার চক্রবর্ত্তী।

হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়। *

আজকালকার দিনে পৃথিবী জুড়িয়া আনাগোনা মেলামেশা চলিতেছে। মানুষের নানা জাতি নানা উপলক্ষ্যে পরস্পরের পরিচয় লাভ করিতেছে। অতএব ভিন্ন ভিন্ন জাতির স্বাতন্ত্র্য ঘুচিয়া গিয়া পরস্পর মিলিয়া যাইবার সময় এখন উপস্থিত হইয়াছে একথা মনে করা যাইতে পারিত।

কিন্তু আশ্চর্য্য এই, বাহিরের দিকে দরজা যতই খুলিতেছে, প্রাচীর যতই ভাঙিতেছে, মানুষের জাতিগুলির স্বাতন্ত্র্যবোধ ততই যেন আরো প্রবল হইয়া উঠিতেছে। এক সময় মনে হইত মিলিবার উপায় ছিল না বলিয়াই মানুষেরা পৃথক হইয়া আছে—কিন্তু এখন মিলিবার বাধাসকল যথাসম্ভব দূর হইয়াও দেখা যাইতেছে পার্থক্য দূর হইতেছে না।

য়ুরোপের যেসকল রাজ্যে খণ্ড খণ্ড জাতিরা একপ্রকার মিলিয়া ছিল এখন তাহারা প্রত্যেকেই আপন স্বতন্ত্র আসন গ্রহণ করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছে। নরোয়ে সুইডেন ভাগ হইয়া গিয়াছে। আয়র্লণ্ড আপন স্বতন্ত্র অধিকার লাভের জন্য বহু দিন হইতে অশ্রান্ত চেষ্টা করিতেছে। এমন কি, আপনার বিশেষ ভাষা, বিশেষ সাহিত্যকে আইরিশ্‌রা জাগাইয়া তুলিবার প্রস্তাব করিতেছে। ওয়েল্‌স্‌বাসীদের মধ্যেও সে চেষ্টা দেখিতে পাওয়া যায়। বেল্‌জিয়মে এতদিন একমাত্র ফরাসী ভাষার প্রাধান্য প্রবল ছিল। আজ ফ্লেমিশ্‌রা নিজের ভাষায় স্বাতন্ত্র্যকে জয়ী করিবার জন্য উৎসাহিত হইয়াছে। অষ্ট্রীয়া রাজ্যে বহুবিধ ছোট ছোট জাতি একসঙ্গে বাস করিয়া আসিতেছে—তাহাদিগকে এক করিয়া মিলাইয়া ফেলিবার সম্ভাবনা আজ স্পষ্টই দুরপরাহত হইয়াছে। রুষিয়া আজ ফিন্‌দিগকে আত্মসাৎ করিবার জন্য বিপুল বল প্রয়োগ করিতেছে বটে কিন্তু দেখিতেছে গেলা যত সহজ পরিপাক করা তত সহজ নহে। তুরস্ক সাম্রাজ্যে যে নানা জাতি বাস করিতেছে বহু রক্তপাতেও তাহাদের ভেদচিহ্ন বিলুপ্ত হইতে চাহিতেছে না।

ইংলণ্ডে হঠাৎ একটা ইম্পিরীয়ালিজ্‌মের ঢেউ উঠিয়াছিল। সমুদ্রপারের সমুদয় উপনিবেশগুলিকে এক সাম্রাজ্যতন্ত্রে বাঁধিয়া ফেলিয়া একটা বিরাট কলেবর ধারণ করিবার প্রলোভন ইংলণ্ডের চিত্তে প্রবল হইয়া উঠিতেছিল। এবারে উপনিবেশগুলির কর্ত্তৃপক্ষেরা মিলিয়া ইংলণ্ডে যে এক মহাসমিতি বসিয়াছিল তাহাতে যতগুলি বন্ধনের প্রস্তাব হইয়াছে তাহার কোনোটাই টিঁকিতে পারে নাই। সাম্রাজ্যকে এককেন্দ্রগত করিবার খাতিরে যেখানেই উপনিবেশগুলির স্বাতন্ত্র্য হানি হইবার লেশমাত্র আশঙ্কা দেখা দিয়াছে সেই খানেই প্রবল আপত্তি উঠিয়াছে।

একান্ত মিলনেই যে বল এবং বৃহৎ হইলেই যে মহৎ হওয়া যায় একথা এখনকার কথা নহে। আসল কথা, পার্থক্য যেখানে সত্য, সেখানে সুবিধার খাতিরে, বড় দল বাঁধিবার প্রলোভনে তাহাকে চোখ বুজিয়া লোপ করিবার চেষ্টা করিলে সত্য তাহাতে সম্মতি দিতে চায় না।

* চৈতন্য লাইব্রেরির অধিবেশন উপলক্ষ্যে রিপন কলেজ হলে, ১২ই কার্ত্তিক পঠিত।

চাপা-দেওয়া পার্থক্য ভয়ানক একটা উৎক্ষেপক পদার্থ, তাহা কোনো না কোনো সময়ে ধাক্কা পাইলে হঠাৎ ফাটিয়া এবং ফাটাইয়া একটা বিপ্লব বাধাইয়া তোলে। যাহারা বস্তুতই পৃথক, তাহাদের পার্থক্যকে সম্মান করাই মিলন রক্ষার সদুপায়।

আপনার পার্থক্য যখন মানুষ যথার্থভাবে উপলব্ধি করে তখনি সে বড় হইয়া উঠিতে চেষ্টা করে। আপনার পার্থক্যের প্রতি যাহার কোনো মমতা নাই সেই হাল ছাড়িয়া দিয়া দশের সঙ্গে মিশিয়া একাকার হইয়া যায়। নিদ্রিত মানুষের মধ্যে প্রভেদ থাকে না—জাগিয়া উঠিলেই প্রত্যেকের ভিন্নতা নানা প্রকারে আপনাকে ঘোষণা করে। বিকাশের অর্থ ই ঐক্যের মধ্যে পার্থক্যের বিকাশ। বীজের মধ্যে বৈচিত্র্য নাই। কুঁড়ির মধ্যে সমস্ত পাপ্‌ড়ি ঘনিষ্ঠ ভাবে মিলিয়া এক হইয়া থাকে—যখন তাহাদের ভেদ ঘটে তখনি ফুল বিকশিত হইয়া উঠে। প্রত্যেক পাপ্‌ড়ি ভিন্ন ভিন্ন মুখে আপন পথে আপনাকে যখন পূর্ণ করিয়া তোলে তখনি ফুল সার্থক হয়। আজ পরস্পরের সংঘাতে সমস্ত পৃথিবীতেই একটা জাগরণ সঞ্চারিত হইয়াছে বলিয়া বিকাশের অনিবার্য্য নিয়মে মনুষ্য-সমাজের স্বাভাবিক পার্থক্যগুলি আত্মরক্ষার জন্য চতুর্দ্দিকে সচেষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। আপনাকে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত করিয়া অন্যের সঙ্গে একেবারে মিলিয়া গিয়া যে বড় হওয়া তাহাকে কোনো জাগ্রৎসত্তা বড় হওয়া মনে করিতেই পারে না। যে ছোট সেও যখনি আপন সত্যকার স্বাতন্ত্র্য সম্বন্ধে সচেতন হইয়া উঠে তখনি সেটিকে বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য প্রাণপণ করে—ইহাই প্রাণের ধর্ম্ম। বস্তুত সে ছোট হইয়াও বাঁচিতে চায়, বড় হইয়া মরিতে চায় না।

ফিন্‌রা যদি কোনোক্রমে রুষ হইয়া যাইতে পারে তবে অনেক উৎপাত হইতে তাহারা পরিত্রাণ পায়—তবে একটি বড় জাতির সামিল হইয়া গিয়া ছোটত্বের সমস্ত দুঃখ একেবারে দূর হইয়া যায়। কোনো একটা নেশনের মধ্যে কোনো প্রকার দ্বিধা থাকিলেই তাহাতে বলক্ষয় করে এই আশঙ্কায় ফিন্‌ল্যাণ্ডকে রাশিয়ার সঙ্গে বলপূর্ব্বক অভিন্ন করিয়া দেওয়াই রুষের অভিপ্রায়। কিন্তু ফিন্‌ল্যাণ্ডের ভিন্নতা যে একটা সত্যপদার্থ; রাশিয়ার সুবিধার কাছে সে আপনাকে বলি দিতে চায় না। এই ভিন্নতাকে যথোচিত উপায়ে বশ করিতে চেষ্টা করা চলে, এক করিতে চেষ্টা করা হত্যা করার মত অন্যায়। আয়র্লণ্ডকে লইয়াও ইংলণ্ডের সেই সঙ্কট। সেখানে সুবিধার সঙ্গে সত্যের লড়াই চলিতেছে। আজ পৃথিবীর নানা স্থানেই যে এই সমস্যা দেখা যাইতেছে তাহার একমাত্র কারণ সমস্ত পৃথিবীতেই একটা প্রাণের বেগ সঞ্চারিত হইয়াছে।

আমাদের বাংলা দেশের সমাজের মধ্যে সম্প্রতি যে ছোট খাট একটি বিপ্লব দেখা দিয়াছে তাহার মূল কথাটি সেই একই। ইতিপূর্ব্বে এ দেশে ব্রাহ্মণ ও শূদ্র এই দুই মোটা ভাগ ছিল। ব্রাহ্মণ ছিল উপরে, আর সকলেই ছিল তলায় পড়িয়া।

কিন্তু যখনি নানা কারণে আমাদের দেশের মধ্যে একটা উদ্বোধন উপস্থিত হইল তখনি অব্রাহ্মণ জাতিরা শূদ্র শ্রেণীর এক সমতল হীনতার মধ্যে একাকার হইয়া থাকিতে রাজি হইল না। কায়স্থ আপনার যে একটি বিশেষত্ব অনুভব করিতেছে তাহাতে সে আপনাকে শূদ্রত্বের মধ্যে বিলুপ্ত করিয়া রাখিতে পারে না। তাহার হীনতা সত্য নহে। সুতরাং সামাজিক শ্রেণীবন্ধনের অতি প্রাচীন সুবিধাকে সে চিরকাল মানিবে কেমন করিয়া? ইহাতে দেশাচার যদি বিরুদ্ধ হয় তবে দেশাচারকে পরাভূত হইতেই হইবে। আমাদের দেশের সকল জাতির মধ্যেই এই বিপ্লব ব্যাপ্ত হইবে। কেন না, মূর্চ্ছাবস্থা ঘুচিলেই মানুষ সত্যকে অনুভব করে; সত্যকে অনুভব করিবামাত্র সে কোনো কৃত্রিম সুবিধার দাসত্ববন্ধন স্বীকার করিতে পারে না, বরঞ্চ সে অসুবিধা ও অশান্তিকেও বরণ করিয়া লইতে রাজি হয়।

ইহার ফল কি? ইহার ফল এই যে, স্বাতন্ত্র্যের গৌরব বোধ জন্মিলেই মানুষ দুঃখ স্বীকার করিয়াও আপনাকে বড় করিয়া তুলিতে চাহিবে। বড় হইয়া উঠিলে তখনি পরস্পরের মিলন, সত্যকার সামগ্রী হইবে। দীনতার মিলন, অধীনতার মিলন, এবং দায়ে পড়িয়া মিলন গোঁজামিলন মাত্র।

মনে আছে আমারই কোনো ব্যাকরণ-ঘটিত প্রবন্ধ লইয়া একবার সাহিত্য পরিষৎ সভায় এমন একটি আলোচনা উঠিয়াছিল যে, বাংলা ভাষাকে যতদূর সম্ভব সংস্কৃতের মত করিয়া তোলা উচিত—কারণ, তাহা হইলে গুজরাটি মারাঠা সকলেরই পক্ষে বাংলা ভাষা সুগম হইবে।

অবশ্য একথা স্বীকার করিতেই হইবে বাংলা ভাষার যে একটি নিজত্ব আছে অন্য দেশবাসীর পক্ষে বাংলা ভাষা বুঝিবার সেইটেই প্রধান বাধা। অথচ বাংলা ভাষার যাহা কিছু শক্তি যাহা কিছু সৌন্দর্য্য সমস্তই তাহার সেই নিজত্ব লইয়া। আজ ভারতের পশ্চিমতম প্রান্তবাসী গুজরাটি বাংলা পড়িয়া বাংলা সাহিত্য নিজের ভাষায় অনুবাদ করিতেছে। ইহার কারণ এ নয় যে বাংলা ভাষাটা সংস্কৃতের কৃত্রিম ছাঁচে ঢালা সর্ব্বপ্রকার বিশেষত্ব-বর্জ্জিত সহজ ভাষা। সাঁওতাল যদি বাঙালী পাঠকের কাছে তাহার লেখা চলিত হইবে আশা করিয়া নিজের ভাষা হইতে সমস্ত সাঁওতালিত্ব বর্জ্জন করে তবেই কি তাহার সাহিত্য আমাদের কাছে আদর পাইবে? কেবল ঐ বাধাটুকু দূর করার পথ চাহিয়াই কি আমাদের মিলন প্রতীক্ষা করিয়া বসিয়া আছে।

অতএব, বাঙ্গালী বাংলা ভাষার বিশেষত্ব অবলম্বন করিয়াই সাহিত্যের যদি উন্নতি করে তবেই হিন্দিভাষীদের সঙ্গে তাহার বড় রকমের মিলন হইবে। সে যদি হিন্দুস্থানীদের সঙ্গে সস্তায় ভাব করিয়া লইবার জন্য হিন্দির ছাঁদে বাংলা লিখিতে থাকে তবে বাংলা সাহিত্য অধঃপাতে যাইবে এবং কোনো হিন্দুস্থানী তাহার দিকে দৃক্‌পাতও করিবে না। আমার বেশ মনে আছে অনেকদিন পূর্ব্বে একজন বিশেষ বুদ্ধিমান শিক্ষিত ব্যক্তি আমাকে বলিয়াছিলেন, বাংলা সাহিত্য যতই উন্নতিলাভ করিতেছে ততই তাহা আমাদের জাতীয় মিলনের পক্ষে অন্তরায় হইয়া উঠিতেছে। কারণ এ সাহিত্য যদি শ্রেষ্ঠতা লাভ করে তবে ইহা মরিতে চাহিবে না—এবং ইহাকে অবলম্বন করিয়া শেষ পর্য্যন্ত বাংলা ভাষা মাটি কাম্‌ড়াইয়া পড়িয়া থাকিবে। এমন অবস্থায় ভারতবর্ষে ভাষার ঐক্য সাধনের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা বাধা দিবে বাংলা ভাষা। অতএব বাংলা সাহিত্যের উন্নতি ভারতবর্ষের পক্ষে মঙ্গলকর নহে। সকল প্রকার ভেদকে ঢেঁকিতে কুটিয়া একটা পিণ্ডাকার পদার্থ গড়িয়া তোলাই যে জাতীয় উন্নতির চরম পরিণাম, তখনকার দিনে ইহাই সকল লোকের মনে জাগিতেছিল। কিন্তু আসল কথা, বিশেষত্ব বিসর্জ্জন করিয়া যে সুবিধা তাহা দু'দিনের ফাঁকি—বিশেষত্বকেই মহত্ত্বে লইয়া গিয়া যে সুবিধা তাহাই সত্য।

আমাদের দেশে ভারতবর্ষীয়দের মধ্যে রাষ্ট্রীয় ঐক্যলাভের চেষ্টা যখনি প্রবল হইল, অর্থাৎ যখনি নিজের সত্তা সম্বন্ধে আমাদের বিশেষভাবে চেতনার উদ্রেক হইল তখনি আমরা ইচ্ছা করিলাম বটে মুসলমানদিগকেও আমাদের সঙ্গে এক করিয়া লই, কিন্তু তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারিলাম না। এক করিয়া লইতে পারিলে আমাদের সুবিধা হইতে পারিত বটে, কিন্তু সুবিধা হইলেই যে এক করা যায় তাহা নহে। হিন্দু মুসলমানের মধ্যে যে একটি সত্য পার্থক্য আছে তাহা ফাঁকি দিয়া উড়াইয়া দিবার জো নাই। প্রয়োজন সাধনের আগ্রহবশতঃ সেই পার্থক্যকে যদি আমরা না মানি তবে সেও আমাদের প্রয়োজনকে মানিবে না।

হিন্দু মুসলমানের মধ্যে সকল দিক দিয়া একটা সত্যকার ঐক্য জন্মে নাই বলিয়াই রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রে তাহাদিগকে এক করিয়া তুলিবার চেষ্টায় সন্দেহ ও অবিশ্বাসের সূত্রপাত হইল। এই সন্দেহকে অমূলক বলিয়া উড়াইয়া দিলে চলিবে না। আমরা মুসলমানকে যখন আহ্বান করিয়াছি তখন তাহাকে কাজ উদ্ধারের সহায় বলিয়া ডাকিয়াছি, আপন বলিয়া ডাকি নাই। যদি কখনো দেখি তাহাকে কাজের জন্য আর দরকার নাই তবে তাহাকে অনাবশ্যক বলিয়া পিছনে ঠেলিতে আমাদের বাধিবে না। তাহাকে যথার্থ আমাদের সঙ্গী বলিয়া অনুভব করি নাই, আনুসঙ্গিক বলিয়া মানিয়া লইয়াছি। যেখানে দুই পক্ষের মধ্যে অসামঞ্জস্য আছে সেখানে যদি তাহারা শরিক হয়, তবে কেবল ততদিন পর্য্যন্ত তাহাদের বন্ধন থাকে যতদিন বাহিরের কোনো বাধা অতিক্রমের জন্য তাহাদের একত্র থাকা আবশ্যক হয়,—সে আবশ্যকটা অতীত হইলেই ভাগবাটোয়ারার বেলায় উভয় পক্ষেই ফাঁকি চলিতে থাকে।

মুসলমান এই সন্দেহটি মনে লইয়া আমাদের ডাকে সাড়া দেয় নাই। আমরা দুই পক্ষ একত্র থাকিলে মোটের উপর লাভের অঙ্ক বেশী হইবে বটে, কিন্তু লাভের অংশ তাহার পক্ষে বেশী হইবে কি না, মুসলমানের সেইটেই বিবেচ্য। অতএব মুসলমানের এ কথা বলা অসঙ্গত নহে যে আমি যদি পৃথক থাকিয়াই বড় হইতে পারি তবেই তাহাতে আমার লাভ।

কিছুকাল পূর্ব্বে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে এই স্বাতন্ত্র্য-অনুভূতি তীব্র ছিল না। আমরা এমন এক রকম করিয়া মিলিয়া ছিলাম যে আমাদের মধ্যেকার ভিন্নতাটা চখে পড়িত না। কিন্তু স্বাতন্ত্র্য-অনুভূতির অভাবটা একটা অ-ভাবমাত্র, ইহা ভাবাত্মক নহে। অর্থাৎ আমাদের মধ্যে সত্যকার অভেদ ছিল বলিয়াই যে ভেদ সম্বন্ধে আমরা অচেতন ছিলাম তাহা নহে—আমাদের মধ্যে প্রাণশক্তির অভাব ঘটিয়াছিল বলিয়াই একটা নিশ্চেতনতায় আমাদিগকে অভিভূত করিয়াছিল। একটা দিন আসিল যখন হিন্দু আপন হিন্দুত্ব লইয়া গৌরব করিতে উদ্যত হইল। তখন মুসলমান যদি হিন্দুর গৌরব মানিয়া লইয়া নিজেরা চুপ চাপ পড়িয়া থাকিত তবে হিন্দু খুব খুসি হইত সন্দেহ নাই, কিন্তু যে কারণে হিন্দুর হিন্দুত্ব উগ্র হইয়া উঠিল সেই কারণেই মুসলমানের মুসলমানী মাথা তুলিয়া উঠিল। এখন সে মুসলমানরূপেই প্রবল হইতে চায়, হিন্দুর সঙ্গে মিশিয়া গিয়া প্রবল হইতে চায় না।

এখন জগৎ জুড়িয়া সমস্যা এ নহে যে, কি করিয়া ভেদ ঘুচাইয়া এক হইব—কিন্তু কি করিয়া ভেদ রক্ষা করিয়াই মিলন হইবে। সে কাজটা কঠিন—কারণ, সেখানে কোনো প্রকার ফাঁকি চলে না, সেখানে পরস্পরকে পরস্পরের জায়গা ছাড়িয়া দিতে হয়। সেটা সহজ নহে, কিন্তু যেটা সহজ সেটা সাধ্য নহে; পরিণামের দিকে চাহিলে দেখা যায় যেটা কঠিন সেটাই সহজ।

আজ আমাদের দেশে মুসলমান স্বতন্ত্র থাকিয়া নিজের উন্নতি সাধনের চেষ্টা করিতেছে। তাহা আমাদের পক্ষে যতই অপ্রিয় এবং তাহাতে আপাতত আমাদের যতই অসুবিধা হউক, একদিন পরস্পরের যথার্থ মিলন সাধনের ইহাই প্রকৃত উপায়। ধনী না হইলে দান

করা কষ্টকর;—মানুষ যখন আপনাকে বড় করে তখনি আপনাকে ত্যাগ করিতে পারে। যত দিন তাহার অভাব ও ক্ষুদ্রতা ততদিনই তাহার ঈর্ষা ও বিরোধ। ততদিন যদি সে আর কাহারো সঙ্গে মেলে তবে দায়ে পড়িয়া মেলে—সে মিলন কৃত্রিম মিলন। ছোটি বলিয়া আত্মলোপ করাটা অকল্যাণ, বড় হইয়া আত্মবিসর্জ্জন করাটাই শ্রেয়।

আধুনিক কালের শিক্ষার প্রতি সময় থাকিতে মনোযোগ না করায় ভারতবর্ষের মুসলমান হিন্দুর চেয়ে অনেক বিষয়ে পিছাইয়া পড়িয়াছে। সেখানে তাহাকে সমান হইয়া লইতে হইবে। এই বৈষম্যটি দূর করিবার জন্য মুসলমান সকল বিষয়েই হিন্দুর চেয়ে বেশি দাবি করিতে আরম্ভ করিয়াছে। তাহাদের এই দাবিতে আমাদের আন্তরিক সম্মতি থাকাই উচিত। পদ-মান-শিক্ষায় তাহারা হিন্দুর সমান হইয়া উঠে ইহা হিন্দুরই পক্ষে মঙ্গলকর।

বস্তুত বাহির হইতে যেটুকু পাওয়া যাইতে পারে, যাহা অন্যের নিকট প্রার্থনা করিয়া পাওয়া যায় তাহার একটা সীমা আছেই। সে সীমা হিন্দু মুসলমানের কাছে প্রায় সমান। সেই সীমায় যতদিন পর্য্যন্ত না পৌঁছানো যায় ততদিন মনে একটা আশা থাকে বুঝি সীমা নাই, বুঝি এই পথেই পরমার্থ লাভ করা যায়। তখনই সেই পথের পাথেয় কার একটু বেশি জুটিয়াছে কার একটু কম তাই লইয়া পরস্পর ঘোরতর ঈর্ষা বিরোধ ঘটিতে থাকে।

কিন্তু খানিকটা দূরে গিয়া স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে নিজের গুণে ও শক্তিতেই আমরা নিজের স্থায়ী মঙ্গল সাধন করিতে পারি। যোগ্যতা লাভ ছাড়া অধিকার লাভের অন্য কোনো পথ নাই। এই কথাটা বুঝিবার সময় যত অবিলম্বে ঘটে ততই শ্রেয়। অতএব অন্যের আনুকূল্যলাভের যদি কোনো স্বতন্ত্র সীধা রাস্তা মুসলমান আবিষ্কার করিয়া থাকে তবে সে পথে তাহাদের গতি অব্যাহত হউক! সেখানে তাহাদের প্রাপ্যের ভাগ আমাদের চেয়ে পরিমাণে বেশি হইতেছে বলিয়া অহরহ কলহ করিবার ক্ষুদ্রতা যেন আমাদের না থাকে। পদ-মানের রাস্তা মুসলমানের পক্ষে যথেষ্ট পরিমাণে সুগম হওয়াই উচিত—সে রাস্তার শেষ গম্যস্থানে পৌঁছিতে তাহাদের কোনো বিলম্ব না হয় ইহাই যেন আমরা প্রসন্ন মনে কামনা করি।

কিন্তু এই যে বাহ্য অবস্থার বৈষম্য ইহার' পরে আমি বেশি ঝোঁক দিতে চাই না—ইহা ঘুচিয়া যাওয়া কিছুই শক্ত নহে। যে কথা লইয়া এই প্রবন্ধে আলোচনা করিতেছি তাহা সত্যকার স্বাতন্ত্র্য। সে স্বাতন্ত্র্যকে বিলুপ্ত করা আত্মহত্যা করারই সমান।

আমার নিশ্চয় বিশ্বাস, নিজেদের স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন প্রভৃতি উদ্যোগ লইয়া মুসলমানেরা যে উৎসাহিত হইয়া উঠিয়াছে তাহার মধ্যে প্রতিযোগিতার ভাব যদি কিছু থাকে তবে সেটা স্থায়ী ও সত্য পদার্থ নহে। ইহার মধ্যে সত্য পদার্থ নিজেদের স্বাতন্ত্র্য উপলব্ধি। মুসলমান নিজের প্রকৃতিতেই মহৎ হইয়া উঠিবে এই ইচ্ছাই মুসলমানের সত্য ইচ্ছা।

এইরূপ বিচিত্র স্বাতন্ত্র্যকে প্রবল হইয়া উঠিতে দেখিলে আমাদের মনে প্রথমে একটা ভয় হয়। মনে হয় স্বাতন্ত্র্যের যে যে অংশে আজ বিরুদ্ধতা দেখিতেছি সেইগুলাই প্রশ্রয় পাইয়া অত্যন্ত বাড়িয়া যাইবে, এবং তাহা হইলে মানুষের মধ্যে পরস্পরের প্রতিকূলতা ভয়ঙ্কর উগ্র হইয়া উঠিবে।

একদা সেই আশঙ্কার কাল ছিল। তখন এক এক জাতি আপনার মধ্যেই আবদ্ধ থাকিয়া আপনার বিশেষত্বকে অপরিমিতরূপে বাড়াইয়া চলিত। সমস্ত মানুষের পক্ষে সে একটা ব্যাধি ও অকল্যাণের রূপ ধারণ করিত।

এখন সেরূপ ঘটা সম্পূর্ণ সম্ভবপর নহে: এখন আমরা প্রত্যেক মানুষই সকল মানুষের মাঝখানে আসিয়া পড়িয়াছি। এখন এত বড় কোণ কেহই খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিবে না, যেখানে অসঙ্গতরূপে অবাধে এক-ঝোঁকা রকম বাড় বাড়িয়া একটা অদ্ভুত সৃষ্টি ঘটিতে পারে।

এখনকার কালের যে দীক্ষা তাহাতে প্রাচ্য পাশ্চাত্য সকল জাতিরই যোগ আছে। কেবল নিজের শাস্ত্র পড়িয়া পণ্ডিত হইবার আশা কেহ করিতে পারে না। অন্তত এই দিকেই মানুষের চেষ্টার গতি দেখা যাইতেছে। বিদ্যা এখন জ্ঞানের একটি বিশ্বযজ্ঞ হইয়া উঠিতেছে—সে সমস্ত মানুষের চিত্ত-সম্মিলনের ক্ষেত্র প্রস্তুত করিতেছে।

মানুষের এই বৃহৎ চেষ্টাই আজ মুসলমানের দ্বারে এবং হিন্দুর দ্বারে আঘাত করিতেছে। আমরা এতদিন পুরা-পুরি পাশ্চাত্য শিক্ষা পাইতেছিলাম। এ শিক্ষা যখন এদেশে প্রথম আরম্ভ হইয়াছিল তখন সকল প্রকার প্রাচ্যবিদ্যার প্রতি তাহার অবজ্ঞা ছিল। আজ পর্য্যন্ত সেই অবজ্ঞার মধ্যে আমরাও বাড়িয়া উঠিয়াছি। তাহাতে মাতা সরস্বতীর ঘরে গৃহবিচ্ছেদ ঘটিয়াছে। তাহার পূর্ব্বমহলের সন্তানেরা পশ্চিম মহলের দিকের জানলা বন্ধ করিয়াছে এবং পশ্চিম মহলের সন্তানেরা পূবে হাওয়াকে জঙ্গলের অস্বাস্থ্যকর হাওয়া জ্ঞান করিয়া তাহার একটু আভাসেই কান পর্য্যন্ত মুড়ি দিয়া বসিয়াছেন।

ইতিমধ্যে ক্রমশই সময়ের পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। সর্ব্বত্রই প্রাচ্যবিদ্যার অনাদর দূর হইতেছে। মানবের জ্ঞানের বিকাশে তাহারও প্রয়োজন সামান্য নহে সে পরিচয় প্রতিদিন পাওয়া যাইতেছে।

অথচ, আমাদের বিদ্যাশিক্ষার বরাদ্দ সেই পূর্ব্বের

মতই রহিয়া গিয়াছে। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে কেবল আমাদেরই বিদ্যার উপযুক্ত স্থান নাই। হিন্দুমুসলমান-শাস্ত্রঅধ্যয়নে একজন জর্ম্মান ছাত্রের যে সুবিধা আছে আমাদের সে সুবিধা নাই। এরূপ অসম্পূর্ণ শিক্ষালাভে আমাদের ক্ষতি করিতেছে সে বোধ যে আমাদের মনে জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছে, তাহা এখনকারই কালের ধর্ম্ম-বশতঃ। আমরা যদি কেবল পশ্চিমের পড়া পাখী হইয়া শেখা বুলি আওড়াই তবে তাহাতে রাস্তার লোকের ক্ষণকালীন বিস্ময় ও কৌতুক উৎপাদন করিবে মাত্র, পৃথিবীর তাহাতে কোনো লাভ নাই। আমরা নিজের বাণীকে লাভ করিব, সমস্ত মানব আমাদের কাছে এই প্রত্যাশা করিতেছে।

সেই প্রত্যাশা যদি পূর্ণ করিতে না পারি তবে মানুষের কাছে আমাদের কোনো সম্মান নাই। এই সম্মানলাভের জন্য প্রস্তুত হইবার আহ্বান আসিতেছে। তাহারই আয়োজন করিবার উদ্যোগ আমাদিগকে করিতে হইবে।

অল্পদিন হইতে আমাদের দেশে বিদ্যাশিক্ষার উপায় ও প্রণালী পরিবর্ত্তনের যে চেষ্টা চলিতেছে সেই চেষ্টার মূলে আমাদের এই আকাঙ্ক্ষা রহিয়াছে। চেষ্টা যে ভাল করিয়া সফলতা লাভ করিতে পারিতেছে না তাহারও মূল কারণ আমাদের এতকালের অসম্পূর্ণ শিক্ষা। আমরা যাহা ঠিকমত পাই নাই তাহা দিতে চেষ্টা করিয়াও দিতে পারিতেছি না।

আমাদের স্বজাতির এমন কোনো একটি বিশিষ্টতা আছে যাহা মূল্যবান, একথা সম্পূর্ণ অশ্রদ্ধা করেন এমন লোকও আছেন, তাঁহাদের কথা আমি একেবারেই ছাড়িয়া দিতেছি।

এই বিশিষ্টতাকে স্বীকার করেন অথচ ব্যবহারের বেলায় তাহাকে ন্যূনাধিক অগ্রাহ্য করিয়া থাকেন এমন লোকের সংখ্যা অল্প নহে। তাঁহাদের মধ্যে অনেকে হয় ত আহ্নিক তর্পণও করেন এবং শাস্ত্রালাপেও পটু কিন্তু জাতীয় আদর্শকে তাঁহারা অত্যন্ত আংশিকভাবে গ্রহণ করেন এবং মুখে যতটা করেন কাজে ততটা করেন না। ইঁহারা নিজেরা যে-বিদ্যালয়ে পড়া মুখস্থ করিয়া আসিয়াছেন তাহাকে বেশিদূর ছাড়াইয়া যাইতে ভরসা করেন না।

আর একদল আছেন তাঁহারা স্বজাতির বিশিষ্টতা লইয়া গৌরব করেন কিন্তু এই বিশিষ্টতাকে তাঁহারা অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ করিয়া দেখিয়া থাকেন। যাহা প্রচলিত তাহাকেই তাঁহারা বড় আসন দেন, যাহা চিরন্তন তাহাকে নহে। আমাদের দুর্গতির দিনে যে বিকৃতিগুলি অসঙ্গত হইয়া উঠিয়া সমস্ত মানুষের সঙ্গে আমাদের বিরোধ ঘটাইয়াছে, খণ্ড খণ্ড করিয়া আমাদিগকে দুর্ব্বল করিয়াছে, এবং ইতিহাসে বারবার করিয়া কেবলি আমাদের মাথা হেঁট করিয়া দিতেছে, তাঁহারা তাহাদিগকেই আমাদের বিশেষত্ব বলিয়া তাহাদের প্রতি নানাপ্রকার কাল্পনিক গুণের আরোপ করিবার চেষ্টা করিতেছেন। ইঁহারা কালের আবর্জ্জনাকেই স্বজাতির প্রকৃত পরিচয় মনে করিয়া তাহাকেই যে চিরস্থায়ী করিবার চেষ্টা করিবেন এবং দূষিত বাষ্পের আলেয়া-আলোককেই চন্দ্রসূর্য্যের চেয়ে সনাতন বলিয়া সম্মান করিবেন তাহাতে সন্দেহ নাই।

অতএব যাঁহারা স্বতন্ত্রভাবে হিন্দু বা মুসলমান বিশ্ব-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাকে ভয় করেন তাঁহাদের ভয়ের কোনো কারণ নাই এমন কথা বলিতে পারি না। কিন্তু তৎসত্ত্বে একথা জোর করিয়া বলিতে হইবে যে, যে শিক্ষার মধ্যে প্রাচ্য পাশ্চাত্য সকল বিদ্যারই সমাবেশ হইতেছে সে শিক্ষা কখনই চিরদিন কোনো একান্ত আতিশয্যের দিকে প্রশ্রয় লাভ করিতে পারিবে না। যাহারা স্বতন্ত্র তাহারা পরস্পর পাশাপাশি আসিয়া দাঁড়াইলে তবেই তাহাদের বাড়াবাড়ি কাটিয়া যায় ও তাহাদের সত্যটি যথার্থভাবে প্রকাশ পায়। নিজের ঘরে বসিয়া ইচ্ছামত যিনি যতবড় খুসি নিজের আসন প্রস্তুত করিতে পারেন, কিন্তু পাঁচ-জনের সভার মধ্যে আসিয়া পড়িলে স্বতই নিজের উপযুক্ত আসনটি স্থির হইয়া যায়। হিন্দু বা মুসলমান বিশ্ববিদ্যালয়ে যদি বিশ্বকে স্থান দেওয়া হয় তবে সেই সঙ্গে নিজের স্বাতন্ত্র্যকে স্থান দিলে কোনো বিপদের সম্ভাবনা থাকিবে না। ইহাতেই বস্তুত স্বাতন্ত্র্যের যথার্থ মূল্য নির্দ্ধারিত হইয়া যাইবে।

এ পর্য্যন্ত আমরা পাশ্চাত্য শাস্ত্রসকলকে যে প্রকার বৈজ্ঞানিক, ঐতিহাসিক ও যুক্তিমূলক প্রণালীর দ্বারা বিচার করিয়া আসিতেছি নিজেদের শাস্ত্রগুলিকে সেরূপ করিতেছি না। যেন জগতে আর সর্ব্বত্রই অভিব্যক্তির নিয়ম কাজ করিয়া আসিয়াছে কেবল ভারতবর্ষেই সে প্রবেশ করিতে পারে নাই—এখানে সমস্তই অনাদি এবং ইতিহাসের অতীত। এখানে কোনো দেবতা ব্যাকরণ, কোনো দেবতা রসায়ন, কোনো দেবতা আয়ুর্ব্বেদ আস্ত সৃষ্টি করিয়াছেন—কোনো দেবতার মুখ হস্ত পদ হইতে একে-বারেই চারি বর্ণ বাহির হইয়া আসিয়াছে—সমস্তই ঋষি ও দেবতায় মিলিয়া এক মুহূর্ত্তেই খাড়া করিয়া দিয়াছেন। ইহার উপরে আর কাহারো কোনো কথা চলিতেই পারে না। সেই জন্যই ভারতবর্ষের ইতিহাস রচনায় অদ্ভুত অনৈসর্গিক ঘটনা বর্ণনায় আমাদের লেখনীর লজ্জাবোধ হয় না—শিক্ষিত লোকেদের মধ্যেও ইহার পরিচয় প্রতিদিনই পাওয়া যায়। আমাদের সামাজিক আচার ব্যবহারেও বুদ্ধিবিচারের কোনো অধিকার নাই—কেন আমরা একটা কিছু করি বা করি না তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করাই অসঙ্গত।

কেননা কার্য্যকারণের নিয়ম বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে কেবলমাত্র ভারতবর্ষেই খাটিবে না—সকল কারণ শাস্ত্রবচনের মধ্যে নিহিত। এইজন্য সমুদ্রযাত্রা ভাল কি মন্দ শাস্ত্র খুলিয়া তাহার নির্ণয় হইবে, এবং কোন্ ব্যক্তি ঘরে ঢুকিলে হুকার জল ফেলিতে হইবে পণ্ডিতমশায় তাহার বিধান দিবেন। কেন যে একজনের ছোঁয়া দুধ বা খেজুর রস বা গুড় খাইলে অপরাধ নাই, জল খাইলেই অপরাধ—কেন যে যবনের প্রস্তত মদ খাইলে জাত যায় না, অন্ন খাইলেই জাত যায়, এসব প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে ধোবা নাপিত বন্ধ করিয়াই মুখ বন্ধ করিয়া দিতে হয়।

শিক্ষিত সমাজেও যে এমন অদ্ভুত অসঙ্গত ব্যবহার চলিতেছে তাহার একটা কারণ আমার এই মনে হয়, পাশ্চাত্য শাস্ত্র আমরা বিদ্যালয়ে শিখিয়া থাকি এবং প্রাচ্য-শাস্ত্র আমরা ইস্কুলের কাপড় ছাড়িয়া অন্যত্র অন্য অবস্থার মধ্যে শিক্ষা করি। এইজন্য উভয়ের সম্বন্ধে আমাদের মনের ভাবের একটা ভেদ ঘটিয়া যায়—অনায়াসেই মনে করিতে পারি বুদ্ধির নিয়ম কেবল এক জায়গায় খাটে—অন্য জায়গায় বড় জোর কেবল ব্যাকরণের নিয়মই খাটিতে পারে। উভয়কেই এক বিদ্যামন্দিরে এক শিক্ষার অঙ্গ করিয়া দেখিলে আমাদের এই মোহ কাটিয়া যাইবার উপায় হইবে।

কিন্তু আধুনিক শিক্ষিত সমাজেই এই ভাবটা বাড়িয়া উঠিতেছে কেন, এ প্রশ্ন স্বতই মনে উদিত হয়। শিক্ষা পাইলে বুদ্ধিবৃত্তির প্রতি লোকের অনাস্থা জন্মে বলিয়াই যে এমনটা ঘটে তাহা আমি মনে করি না; আমি পূর্ব্বেই ইহার কারণ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছি।

শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে আমাদের স্বাতন্ত্র্য-অভিমানটা প্রবল হইয়া উঠিতেছে। এই অভিমানের প্রথম জোয়ারে বড় একটা বিচার থাকে না, কেবল জোরই থাকে। বিশেষতঃ ততদিন আমরা আমাদের যাহা কিছু সমস্তকেই নির্ব্বিচারে অবজ্ঞা করিয়া আসিয়াছি—আজ তাহার প্রবল প্রতিক্রিয়ার অবস্থায় আমরা মাঝে মাঝে বৈজ্ঞানিক বিচারের ভাণ করি, কিন্তু তাহা নির্ব্বিচারেরও বাড়া।

এই তীব্র অভিমানের আবিলতা কথনই চিরদিন টিঁকিতে পারে না—এই প্রতিক্রিয়ার ঘাত প্রতিঘাত শান্ত হইয়া আসিবেই—তখন ঘর হইতে এবং বাহির হইতে সত্যকে গ্রহণ করা আমাদের পক্ষে সহজ হইবে।

হিন্দুসমাজের পূর্ণ বিকাশের মূর্ত্তি আমাদের কাছে প্রত্যক্ষ ব্যাপার নহে। সুতরাং হিন্দু কি করিয়াছে ও কি করিতে পারে সে সম্বন্ধে আমাদের ধারণা দুর্ব্বল ও অস্পষ্ট। এখন আমরা যেটাকে চোখে দেখিতেছি সেইটেই আমাদের কাছে প্রবল। তাহা যে নানারূপে হিন্দুর যথার্থ প্রকৃতি ও শক্তিকে আচ্ছন্ন করিয়া তাহাকে বিনাশ করিতেছে একথা মনে করা আমাদের পক্ষে কঠিন। পাঁজিতে যে সংক্রান্তির ছবি দেখা যায় আমাদের কাছে হিন্দু সভ্যতার মূর্ত্তিটা সেই রকম। সে কেবলি যেন স্নান করিতেছে, জপ করিতেছে, এবং ব্রত উপবাসে কৃশ হইয়া জগতের সমস্ত কিছুর সংস্পর্শ পরিহার করিয়া অত্যন্ত সঙ্কোচের সঙ্গে এক পাশে দাঁড়াইয়া আছে। কিন্তু একদিন এই হিন্দুসভ্যতা সজীব ছিল, তখন সে সমুদ্র পার হইয়াছে, উপনিবেশ বাঁধিয়াছে, দিগ্‌বিজয় করিয়াছে, দিয়াছে এবং নিয়াছে; তখন তাহার শিল্প ছিল, বানিজ্য ছিল, তাহার কর্ম্মপ্রবাহ ব্যাপক ও বেগবান ছিল; তখন তাহার ইতিহাসে নব নব মতের অভ্যুত্থান, সমাজবিপ্লব ও ধর্ম্মবিপ্লবের স্থান ছিল; তখন তাহার স্ত্রীসমাজেও বীরত্ব, বিদ্যা ও তপস্যা ছিল; তখন তাহার আচার ব্যবহার যে চিরকালের মত লোহার ছাঁচে ঢালাই করা ছিল না মহাভারত পড়িলে পাতায় পাতায় তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। সেই বৃহৎ বিচিত্র, জীবনের-বেগে-চঞ্চল, জাগ্রত চিত্তবৃত্তির তাড়নায় নব নব অধ্যবসায়ে প্রবৃত্ত হিন্দুসমাজে—যে সমাজ ভুলের ভিতর দিয়া সত্যে চলিয়াছিল; পরীক্ষার ভিতর দিয়া সিদ্ধান্তে ও সাধনার ভিতর দিয়া সিদ্ধিতে উত্তীর্ণ হইতেছিল যাহা শ্লোকসংহিতার জটিল রজ্জুতে বাঁধা কলের পুত্তলীর মত একই নির্জীব নাট্য প্রতিদিন পুনরাবৃত্তি করিয়া চলিতেছিল না;—বৌদ্ধ যে সমাজের অঙ্গ, জৈন যে সমাজের অংশ; মুসলমান ও খৃষ্টানেরা যে সমাজের অন্তর্গত হইতে পারিত; যে সমাজে এক মহাপুরুষ একদা অনার্য্যদিগকে মিত্ররূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন, আর এক মহাপুরুষ কর্ম্মের আদর্শকে বৈদিক যাগযজ্ঞের সংকীর্ণতা হইতে উদ্ধার করিয়া উদার মনুষ্যত্বের ক্ষেত্রে মুক্তিদান করিয়াছিলেন এবং ধর্ম্মকে বাহ্য অনুষ্ঠানের বিধিনিষেধের মধ্যে আবদ্ধ না করিয়া তাহাকে ভক্তি ও জ্ঞানের প্রশস্ত পথে সর্ব্বলোকের সুগম করিয়া দিয়াছিলেন; সেই সমাজকে আজ আমরা হিন্দুসমাজ বলিয়া স্বীকার করিতেই চাই না;—যাহা চলিতেছে না তাহাকে আমরা হিন্দুসমাজ বলি;—প্রাণের ধর্ম্মকে আমরা হিন্দুসমাজের ধর্ম্ম বলিয়া মানিই না, কারণ, প্রাণের ধর্ম্ম বিকাশের ধর্ম্ম, পরিবর্ত্তনের ধর্ম্ম, তাহা নিয়ত গ্রহণ বর্জ্জনের ধর্ম্ম।

এই জন্যই মনে আশঙ্কা হয় যাঁহারা হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করিতে উদ্যোগী, তাঁহারা কিরূপ হিন্দুত্বের ধারণা লইয়া এই কার্য্যে প্রবৃত্ত? কিন্তু সেই আশঙ্কা মাত্রেই নিরস্ত হওয়াকে আমি শ্রেয়স্কর মনে করি না। কারণ, হিন্দুত্বের ধারণাকে ত আমরা নষ্ট করিতে চাই না, হিন্দুত্বের ধারণাকে আমরা বড় করিয়া তুলিতে চাই। তাহাকে চালনা করিতে দিলে আপনি সে বড় হইবার দিকে যাইবেই

—তাহাকে গর্ত্তের মধ্যে বাঁধিয়া রাখিলেই তাহার ক্ষুদ্রতা ও বিকৃতি অনিবার্য্য। বিশ্ববিদ্যালয় সেই চালনার ক্ষেত্র—কারণ সেখানে বুদ্ধিরই ক্রিয়া, সেখানে চিত্তকে সচেতন করারই আয়োজন। সেই চেতনার স্রোত প্রবাহিত হইতে থাকিলে আপনিই তাহা ধীরে ধীরে জড় সংস্কারের সঙ্কীর্ণতাকে ক্ষয় করিয়া আপনাকে প্রশস্ত করিয়া তুলিবেই। মানুষের মনের উপর আমি পুরা বিশ্বাস রাখি;—ভুল লইয়াও যদি আরম্ভ করিতে হয় সেও ভাল, কিন্তু আরম্ভ করিতেই হইবে, নতুবা ভুল কাটিবে না। সে ছাড়া পাইলে চলিবেই। এই জন্য যে সমাজ অচলতা-কেই পরমার্থ বলিয়া জ্ঞান করে সে সমাজ অচেতনতাকেই আপনার সহায় জানে এবং সর্ব্বাগ্রে মানুষের মন জিনিষকেই অহিফেন খাওয়াইয়া বিহ্বল করিয়া রাখে। সে এমন সকল ব্যবস্থা করে যাহাতে মন কোথাও বাহির হইতে পায় না, বাঁধা নিয়মে একেবারে বদ্ধ হইয়া থাকে, সন্দেহ করিতে ভয় করে, চিন্তা করিতেই ভুলিয়া যায়। কিন্তু কোনো বিশেষ বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য যেমনই হোক্ সে মনকে ত বাঁধিয়া ফেলিতে পারিবে না, কারণ, মনকে চলিতে দেওয়াই তাহার কাজ। অতএব যদি হিন্দু সত্যই মনে করে শাস্ত্রশ্লোকের দ্বারা চিরকালের মত দৃঢ়বদ্ধ জড়নিশ্চলতাই হিন্দুর প্রকৃত বিশেষত্ব—তবে সেই বিশেষত্ব রক্ষা করিতে হইলে বিশ্ববিদ্যালয়কে সর্ব্বতোভাবে দূরে পরিহার করাই তাহার পক্ষে কর্ত্তব্য হইবে। বিচারহীন আচারকে মানুষ করিবার ভার যদি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর দেওয়া হয় তবে ডাইনের হাতে পুত্র সমর্পণ করা হইবে।

কিন্তু যাঁহারা সত্যই বিশ্বাস করেন, হিন্দুত্বের মধ্যে কোনো গতিবিধি নাই—তাহা স্থাবর পদার্থ—বর্ত্তমান-কালের প্রবল আঘাতে পাছে সে লেশমাত্র বিচলিত হয়, পাছে তাহার স্থাবরধর্ম্মের তিলমাত্র বৈলক্ষণ্য হয় এই জন্য তাহাকে নিবিড় করিয়া বাঁধিয়া রাখাই হিন্দুসন্তানের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য—তাঁহারা মানুষের চিত্তকে প্রাচীর ঘেরিয়া বন্দীশালায় পরিণত করিবার প্রস্তাব না করিয়া বিশ্ববিদ্যার হাওয়া বহিবার জন্য তাহার চেরিদিকে বড় বড় দরজা ফুটাইবার উদ্যোগ যে করিতেছেন ইহা ভ্রমক্রমে অবিবে-চনাবশতই করিতেছেন তাহা সত্য নহে। আসল কথা, মানুষ মুখে যাহা বলে তাহাই যে তাহার সত্য বিশ্বাস তাহা সকল সময়ে ঠিক নহে। তাহার অন্তরতম সহজবোধের মধ্যে অনেক সময় এই বাহ্যবিশ্বাসের একটা প্রতিবাদ বাস করে। বিশেষতঃ যে সময়ে দেশে প্রাচীন সংস্কারের সঙ্গে নূতন উপলব্ধির দ্বন্দ্ব চলিতেছে সেই ঋতুপরিবর্ত্তনের সন্ধিকালে আমরা মুখে যাহা বলি সেটাকেই আমাদের অন্তরের প্রকৃত পরিচয় বলিয়া গ্রহণ করা চলে না। ফাল্গুন মাসে মাঝে মাঝে বসন্তের চেহারা বদল হইয়া গিয়া হঠাৎ উত্তরে হাওয়া বহিতে থাকে, তখন পৌষ মাস ফিরিয়া আসিল বলিয়া ভ্রম হয়, তবু একথা জোর করিয়াই বলা যাইতে পারে উত্তরে হাওয়া ফাল্গুনের অন্তরের হাওয়া নহে। আমের যে বোল ধরিয়াছে, নব কিশলয়ে যে চিক্কণ তরুণতা দেখিতেছি, তাহাতেই ভিতরকার সত্য সংবাদটা প্রকাশ হইয়া পড়ে। আমাদেরও দেশের মধ্যে প্রাণের হাওয়াই বহিয়াছে—এই হাওয়া বহিয়াছে বলিয়াই আমাদের জড়তা ভাঙিয়াছে এবং গলা ছাড়িয়া বলিতেছি যাহা আছে তাহাকে রাখিয়া দিব। এ কথা ভুলিতেছি যাহা যেখানে যেমন আছে তাহাকে সেখানে তেমনি করিয়া ফেলিয়া রাখিতে যদি চাই তবে কোন চেষ্টা না করাই তাহার পন্থা। ক্ষেতের মধ্যে আগাছাকে প্রবল করিয়া তুলিবার জন্য কেহ চাষ করিয়া মই চালাইবার কথা বলে না। চেষ্টা করিতে গেলেই সেই নাড়াচাড়াতেই ক্ষয়ের কার্য্য পরিবর্ত্তনের কার্য্য দ্রুতবেগে অগ্রসর হইবেই। নিজের মধ্যে যে সঞ্জীবনী শক্তি অনুভব করিতেছি, মনে করিতেছি সেই সঞ্জীবনী শক্তি প্রয়োগ করিয়াই মৃতকে রক্ষা করিব। কিন্তু জীবনীশক্তির ধর্ম্মই এই তাহা মৃতকে প্রবলবেগে মারিতে থাকে এবং যেখানে জীবনের কোনো আভাস আছে সেইখানেই আপনাকে প্রয়োগ করে। কোনও জিনিষকে স্থির করিয়া রাখা তাহার কাজ নহে—যে জিনিষ বাড়িতে পারে তাহাকে সে বাড়াইয়া তুলিবে, আর যাহার বাড় ফুরাইয়াছে তাহাকে সে ধ্বংস করিয়া অপসারিত করিয়া দিবে। কিছুকেই সে স্থির রাখিবে না। তাই বলিতেছিলাম, আমাদের মধ্যে জীবনীশক্তির আবির্ভাব হইয়া আমাদিগকে নানা চেষ্টায় প্রবৃত্ত করি-তেছে—এই কথাই এখনকার দিনের সকলের চেয়ে বড় সত্য—তাহা মৃত্যুকে চিরস্থায়ী করিবার পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হইয়াছে ইহাই বড় কথা নহে—ইহা তাহার একটা ক্ষণিক লীলা মাত্র।

শ্রীযুক্ত গোখেলের প্রাথমিক শিক্ষার অবশ্যপ্রবর্ত্তনের বিল সম্বন্ধে কোনো কোনো শিক্ষিত লোক এমন কথা বলিতেছেন যে আধুনিক শিক্ষায় আমাদের ত মাথা ঘুরাইয়া দিয়াছে আবার দেশের জনসাধারণেরও কি বিপদ ঘটাইবে? যাঁহারা এই কথা বলিতেছেন তাঁহারা নিজের ছেলেকে আধুনিক বিদ্যালয়ে শিক্ষা দিতে ক্ষান্ত হইতেছেন না। এরূপ অদ্ভুত আত্মবিরোধ কেন দেখিতেছি? ইহা যে কপটাচার তাহা নহে। ইহা আর কিছু নয়,—অন্তরে নব বিশ্বাসের বসন্ত আসিয়াছে, মুখে পুরাতন সংস্কারের হাওয়া মরে নাই। সেই জন্য, আমরা যাহা করিবার তাহা করিতে বসিয়াছি অথচ বলিতেছি আর এক কালের কথা। আধু-নিক শিক্ষায় যে চঞ্চলতা আনিয়াছে সেই চঞ্চলতা সত্ত্বেও তাহার মঙ্গলকে আমরা মনের মধ্যে উপলব্ধি করিয়াছি

তাহাতে যে বিপদ আছে সেই বিপদকেও আমরা স্বীকার করিয়া লইয়াছি। নিরাপদ মৃত্যুকে আর আমরা বরণ করিতে রাজি নই, সেইজন্য জীবনের সমস্ত দায় সমস্ত পীড়াকেও মাথায় করিয়া লইবার জন্য আজ আমরা বীরের মত প্রস্তুত হইতেছি। জানি উলটপালট হইবে, জানি বিস্তর ভুল করিব,—জানি কোনো পুরাতন ব্যবস্থাকে নাড়া দিতে গেলেই প্রথমে দীর্ঘকাল বিশৃঙ্খলতার নানা দুঃখ ভোগ করিতে হইবে—চিরসঞ্চিত ধুলার হাত হইতে ঘরকে মুক্ত করিবার জন্য ঝাঁট দিতে গেলে প্রথমটা সেই ধুলাই খুব প্রচুর পরিমাণে ভোগ করিতে হইবে—এই সমস্ত অসুবিধা ও দুঃখ বিপদের আশঙ্কা নিশ্চয় জানি তথাপি আমাদের অন্তরের ভিতরকার নূতন প্রাণের আবেগ আমাদিগকে ত স্থির থাকিতে দিতেছে না। আমরা বাঁচিব, আমরা অচল হইয়া পড়িয়া থাকিব না,—এই ভিতরের কথাটাই আমাদের মুখের সমস্ত কথাকে বারম্বার সবেগে ছাপাইয়া উঠিতেছে।

জাগরণের প্রথম মুহূর্ত্তে আমরা আপনাকে অনুভব করি, পরক্ষণেই চারিদিকের সমস্তকে অনুভব করিতে থাকি। আমাদের জাতীয় উদ্বোধনের প্রথম আরম্ভেই আমরা যদি নিজেদের পার্থক্যকেই প্রবলভাবে উপলব্ধি করিতে পারি তবে ভয়ের কারণ নাই—সেই জাগরণই চারিদিকের বৃহৎ উপলব্ধিকেও উন্মেষিত করিয়া তুলিবে। আমরা নিজকে পাইবার সঙ্গে সঙ্গেই সমস্তকে পাইবার আকাঙ্খা করিব।

আজ সমস্ত পৃথিবীতেই একদিকে যেমন দেখিতেছি প্রত্যেক জাতিই নিজের স্বাতন্ত্র্যরক্ষার জন্য প্রাণপণ করিতেছে, কোনো মতেই অন্য জাতির সঙ্গে বিলীন হইতে চাহিতেছে না, তেমনি দেখিতেছি প্রত্যেক জাতিই বৃহৎ মানবসমাজের সঙ্গে আপনার যোগ অনুভব করিতেছে। সেই অনুভূতির বলে সকল জাতিই আজ নিজেদের সেই সকল বিকট বিশেষত্ব বিসর্জ্জন দিতেছে—যাহা অসঙ্গত অদ্ভুতরূপে তাহার একান্ত নিজের—যাহা সমস্ত মানুষের বুদ্ধিকে রুচিকে ধর্ম্মকে আঘাত করে—যাহা কারাগারের প্রাচীরের মত, বিশ্বের দিকে যাহার বাহির হইবার বা প্রবেশ করিবার কোনো প্রকার পথই নাই। আজ প্রত্যেক জাতিই তাহার নিজের সমস্ত সম্পদকে বিশ্বের বাজারে যাচাই করিবার জন্য আনিতেছে। তাহার নিজত্বকে কেবল তাহার নিজের কাছে চোখ বুজিয়া বড় করিয়া তুলিয়া তাহার কোনো তৃপ্তি নাই, তাহার নিজত্বকে কেবল নিজের ঘরে ঢাক পিটাইয়া ঘোষণা করিয়া তাহার কোনো গৌরব নাই—তাহার নিজত্বকে সমস্ত জগতের অলঙ্কার করিয়া তুলিবে তাহার অন্তরের মধ্যে এই প্রেরণা আসিয়াছে। আজ যে দিন আসিয়াছে আজ আমরা কেহই গ্রাম্যতাকেই জাতীয়তা বলিয়া অহঙ্কার করিতে পারিব না। আমাদের যে সকল আচার ব্যবহার সংস্কার আমাদিগকে ক্ষুদ্র করিয়া পৃথক করিয়াছে, যে সকল সংস্কার থাকাতে কেবলি আমাদের সকলদিকে বাধাই বাড়িয়া উঠিয়াছে, ভ্রমণে বাধা, গ্রহণে বাধা, দানে বাধা, চিন্তায় বাধা, কর্ম্মে বাধা,—সেই সমস্ত কৃত্রিম বিঘ্ন ব্যাঘাতকে দূর করিতেই হইবে—নহিলে মানবের রাজধানীতে আমাদের লাঞ্ছনার সীমা থাকিবে না। একথা আমরা মুখে স্বীকার করি আর না করি, অন্তরের মধ্যে ইহা আমরা বুঝিয়াছি। আমাদের সেই জিনিষকেই আমরা নানা উপায়ে খুঁজিতেছি যাহা বিশ্বের আদরের ধন—যাহা কেবলমাত্র ঘরগড়া আচার অনুষ্ঠান নহে। সেইটেকেই লাভ করিলেই আমরা যথার্থভাবে রক্ষা পাইব—কারণ, তখন সমস্ত জগৎ নিজের গরজে আমাদিগকে রক্ষা করিবে। এই ইচ্ছা আমাদের অন্তরের মধ্যে জাগিয়া উঠিয়াছে বলিয়াই আমরা আর কোণে বসিয়া থাকিতে পারিতেছি না। আজ আমরা যেসকল প্রতিষ্ঠানের পত্তন করিতেছি তাহার মধ্যে একই কালে আমাদের স্বাতন্ত্র্যবোধ এবং বিশ্ববোধ দুই প্রকাশ পাইতেছে। নতুবা আর পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের কল্পনাও আমাদের কাছে নিতান্ত অদ্ভুত বোধ হইত। এখনো একদল লোক আছেন যাঁহাদের কাছে ইহার অসঙ্গতি পীড়াজনক বলিয়া ঠেকে। তাঁহারা এই মনে করিয়া গৌরব বোধ করেন যে হিন্দু এবং বিশ্বের মধ্যে বিরোধ আছে—তাই হিন্দু নানাপ্রকারে আটঘাট বাঁধিয়া অহোরাত্র বিশ্বের সংস্রব ঠেকাইয়া রাখিতেই চায়; অতএব হিন্দু টোল হইতে পারে, হিন্দু চতুষ্পাঠী হইতে পারে কিন্তু হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় হইতেই পারে না—তাহা সোনার পাথরবাটি। কিন্তু এই দল যে কেবল কমিয়া আসিতেছে তাহা নহে, ইহাদেরও নিজেদের ঘরের আচরণ দেখিলে বোঝা যায় ইহারা যে কথাকে বিশ্বাস করিতেছেন বলিয়া বিশ্বাস করেন, গভীরভাবে, এমন কি, নিজের অগোচরে তাহাকে বিশ্বাস করেন না।

যেমন করিয়াই হউক আমাদের দেশের মর্ম্মাধিষ্ঠাত্রী দেবতাকে আমরা চিরকাল মন্দিরের অন্ধকার কোণে বসাইয়া রাখিতে পারিব না। আজ রথযাত্রার দিন আসিয়াছে—বিশ্বের রাজপথে, মানুষের সুখদুঃখ ও আদান প্রদানের পণ্যবীথিকায় তিনি বাহির হইয়াছেন। আজ আমরা তাঁহার রথ নিজেদের সাধ্য অনুসারে যে যেমন করিয়াই তৈরি করি না—কেহবা বেশি মূল্যের উপাদান দিয়া, কেহ বা অল্প মূল্যের—কাহারো বা রথ চলিতে চলিতে পথের মধ্যেই ভাঙিয়া পড়ে, কাহারো বা বৎসরের পর বৎসর টিঁকিয়া থাকে—কিন্তু আসল কথাটা এই যে শুভলগ্নে রথের সময় আসিয়াছে। কোন্ রথ কোন্ পর্য্যন্ত

গিয়া পৌঁছিবে তাহা আগে থাকিতে হিসাব করিয়া বলিতে পারি না—কিন্তু আমাদের বড়দিন আসিয়াছে—আমাদের সকলের চেয়ে যাহা মূল্যবান পদার্থ তাহা আজ আর কেবলমাত্র পুরোহিতের বিধিনিষেধের আড়ালে ধূপদীপের ঘন ঘোর বাষ্পের মধ্যে গোপন থাকিবে না—আজ বিশ্বের আলোকে, আমাদের যিনি বরেণ্য তিনি বিশ্বের বরেণ্যরূপে সকলের কাছে গোচর হইবেন। তাহারি একটি রথনির্ম্মাণের কথা আজ আলোচনা করিয়াছি; ইহার পরিমাণ কি তাহা নিশ্চয় জানি না, কিন্তু ইহার মধ্যে সকলের চেয়ে আনন্দের কথা এই যে, এই রথ বিশ্বের পথে চলিয়াছে, প্রকাশের পথে বাহির হইয়াছে,—সেই আনন্দের আবেগেই আমরা সকলে মিলিয়া জয়ধ্বনি করিয়া ইহার দড়ি ধরিতে ছুটিয়াছি।

কিন্তু আমি বেশ দেখিতে পাইতেছি যাঁহারা কাজের লোক তাঁহারা :এই সমস্ত ভাবের কথায় বিরক্ত হইয়া উঠিতেছেন। তাঁহারা বলিতেছেন হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় নাম ধরিয়া যে জিনিষটা তৈরি হইয়া উঠিতেছে কাজের দিক দিয়া তাহাকে বিচার করিয়া দেখ। হিন্দু নাম দিলেই হিন্দুত্বের গৌরব হয় না, এবং বিশ্ববিদ্যালয় নামেই চারিদিকে বিশ্ববিদ্যার ফোয়ারা খুলিয়া যায় না। বিদ্যার দৌড় এখনো আমাদের যতটা আছে তখনো তাহার চেয়ে যে বেশি দূর হইবে এপর্য্যন্ত তাহার ত কোনো প্রমাণ দেখি না; তাহার পরে কমিটি ও নিয়মাবলীর শান-বাঁধানো মেজের কোন্ ছিদ্র দিয়া যে হিন্দুর হিন্দুত্ব-শতদল বিকশিত হইয়া উঠিবে তাহাও অনুমান করা কঠিন।

এ সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই যে, কুম্ভকার মূর্ত্তি গড়িবার আরম্ভে কাদা লইয়া যে তালটা পাকায় সেটাকে দেখিয়া মাথায় হাত দিয়া বসিলে চলিবে না। একেবারেই একমুহূর্ত্তেই আমাদের মনের মত কিছুই হইবে না। এ কথা বিশেষরূপে মনে রাখা দরকার যে, মনের মত কিছু যে হয় না, তাহার প্রধান দোষ মনেরই, উপকরণের নহে। যে অক্ষম সে মনে করে সুযোগ পায় না বলিয়াই সে অক্ষম। কিন্তু বাহিরের সুযোগ যখন জোটে তখন সে দেখিতে পায় পূর্ণ শক্তিতে ইচ্ছা করিতে পারে না বলিয়াই সে অক্ষম। যাহার ইচ্ছার জোর আছে সে অল্প একটু সূত্র পাইলেই নিজের ইচ্ছাকে সার্থক করিয়া তোলে। আমাদের হতভাগ্য দেশেই আমরা প্রতিদিন এই কথা শুনিতে পাই, এই জায়গাটাতে আমার মতের সঙ্গে মিলিলনা অতএব আমি ইহাকে ত্যাগ করিব—এই খানটাতে আমার মনের মত হয় নাই অতএব আমি ইহার সঙ্গে কোনো সম্বন্ধ রাখিব না। বিধাতার আদুরে ছেলে হইয়া আমরা একেবারেই ষোলো আনা সুবিধা এবং রেখায় রেখায় মনের মিল দাবী করিয়া থাকি—তাহার কিছু ব্যত্যয় হইলেই অভিমানের অন্ত থাকে না। ইচ্ছাশক্তি যাহার দুর্ব্বল ও সংকল্প যাহার অপরিস্ফুট তাহারি দুর্দ্দশা। যখন যেটুকু সুযোগ পাই তাহাকেই ইচ্ছার জোরে সম্পূর্ণ করিব, নিজের মন দিয়া মনের মত করিয়া তুলিব—একদিনে না হয় বহুদিনে, একলা না হয় দল বাঁধিয়া, জীবনে না হয় জীবনের অন্তে এই কথা বলিবার জোর নাই বলিয়াই আমরা সকল উদ্যোগের আরম্ভেই কেবল খুঁৎ খুঁৎ করিতে বসিয়া যাই, নিজের অন্তরের দুর্ব্বলতার পাপকে বাহিরের ঘাড়ে চাপাইয়া দূরে দাঁড়াইয়া ভারি একটা শ্রেষ্ঠতার বড়াই করিয়া থাকি। যে টুকু পাইয়াছি তাহাই যথেষ্ট, বাকি সমস্তই আমার নিজের হাতে, ইহাই পুরুষের কথা। যদি ইহাই নিশ্চয় জানি যে আমার মতই সত্য মত—তবে সেই মত গোড়াতেই গ্রাহ্য হয় নাই বলিয়া তখনি গোসা-ঘরে গিয়া দ্বার রোধ করিয়া বসিব না—সেই মতকে জয়ী করিয়া তুলিবই বলিয়া কোমর বাঁধিয়া লাগিতে হইবে। এ কথা নিশ্চয় সত্য, কোনো বিশেষ প্রতিষ্ঠানের দ্বারাই আমরা পরমার্থ লাভ করিব না—কেননা কলে মানুষ তৈরি হয় না। আমাদের মধ্যে যদি মনুষ্যত্ব থাকে তবেই প্রতিষ্ঠানের সাহায্যে আমাদের মনোরথ-সিদ্ধি হইবে। হিন্দুর হিন্দুত্বকে যদি :আমরা স্পষ্ট করিয়া না বুঝি তবে হিন্দুবিশ্ববিদ্যালয় হইলেই বুঝিব তাহা নহে—যদি তাহা স্পষ্ট করিয়া বুঝি তবে বাহিরে তাহার প্রতিকূলতা যত প্রবলই থাক সমস্ত ভেদ করিয়া আমাদের সেই উপলব্ধি আমাদের কাজের মধ্যে আকার ধারণ করিবেই। এই জন্যই হিন্দুবিশ্ববিদ্যালয় কি ভাবে আরম্ভ হইতেছে, কিরূপে দেহ ধারণ করিতেছে, সে সম্বন্ধে মনে কোনো প্রকার সংশয় রাখিতে চাহি না। সংশয় যদি থাকে তবে সে যেন নিজের সম্বন্ধেই থাকে; সাবধান যদি হইতে হয় তবে নিজের অন্তরের দিকেই হইতে হইবে। কিন্তু আমার মনে কোনো দ্বিধা নাই। কেননা আলাদিনের প্রদীপ পাইয়াছি বলিয়া আমি উল্লাস করিতেছি না, রাতারাতি একটা মস্ত ফল লাভ করিব বলিয়াও আশা করি না। আমি দেখিতেছি আমাদের চিত্ত জাগ্রত হইয়াছে। মানুষের সেই চিত্তকে আমি বিশ্বাস করি—সে ভুল করিলেও নির্ভুল যন্ত্রের চেয়ে আমি তাহাকে শ্রদ্ধা করি। আমাদের সেই জাগ্রত চিত্ত যে-কোনো কাজে প্রবৃত্ত হইতেছে সেই আমাদের যথার্থ কাজ—চিত্তের বিকাশ যতই পূর্ণ হইতে থাকিবে কাজের বিকাশও ততই সত্য হইয়া উঠিবে। সেই সমস্ত কাজই আমাদের জীবনের সঙ্গী—আমাদের জীবনের সঙ্গে সঙ্গে তাহারা বাড়িয়া চলিবে—তাহাদের সংশোধন হইবে,

তাহাদের বিস্তার হইবে; বাধার ভিতর দিয়াই তাহারা প্রবল হইবে, সঙ্কোচের ভিতর দিয়াই তাহারা পরিস্ফূর্ত্ত হইবে এবং ভ্রমের ভিতর দিয়াই তাহারা সত্যের মধ্যে সার্থক হইয়া উঠিবে।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

চিরসুখ।

সঙ্কটে পড়িলে আমি
ডাকি হে তোমায়,
সঙ্কট রহে না তাই
ছাড়িয়া আমায়,
সুখ আশা এ জীবনে
তাই হে বিফল,
দুখ সনে চিরদিন
জড়িত মঙ্গল।
সুখ মাঝে আপনায়
না পারি ভুলিতে,
না পারি আমার সুখ
তোমারে সঁপিতে;
ফিরে ফিরে আসা-যাওয়া
ঘটিছে হে তাই,
চিরসুখ মম বুকে
না পাইছে ঠাঁই।

শ্রীহেমলতা দেবী।

বাহাই ধর্ম্ম।

কিছু দিন ধরিয়া তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় বাবীধর্ম্ম সম্বন্ধে আলোচনা করা হইতেছে; তাহা হইতে বুঝিতে পারা যাইবে যে পারস্য দেশে কিছুকাল হইতে একটি নূতন ধর্ম্মান্দোলন চলিয়া আসিতেছে। মানুষের মন আর সাম্প্রদায়িকতার গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ হইয়া থাকিতে চাহিতেছে না। মানবচিত্ত ক্ষুদ্রতার প্রাচীর-বেষ্টনের মধ্যে হাঁপাইয়া উঠিয়া বিস্তৃতভাবে আপনাকে উপলব্ধি করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে; অনেক স্থান হইতেই আমরা তাহার সংবাদ পাইতেছি। পারস্যের এই ধর্ম্মান্দোলনের মূলের কথাটি মানবচিত্তের এই ব্যাকুলতা।

তিনটি ব্যক্তির জীবনের সহিত বাহাই ধর্ম্মান্দোলন বিশেষভাবে যুক্ত। প্রথম—বাব, দ্বিতীয়—বাহাউল্লা, তৃতীয়—আব্দুল বাহা। আমরা একে একে ইঁহাদের কথা বলিতেছি।

পারস্যদেশের সিরাজ নগরে ১৮১৭ খৃঃ অব্দে বাব (দ্বার) নামে খ্যাত মির্জাআলি মহম্মদ একজন পণ্য-বিক্রেতার গৃহে জন্মগ্রহণ করেন। অতি শৈশবে তিনি পিতৃহীন হইয়া তাঁহার মাতুল মির্জা সৈএদ্ আলির দ্বারা পালিত হন। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বালকের লাবণ্য যেন আর দেহে ধরিত না; তাঁহার নম্রস্বভাব এবং পবিত্র চরিত্রে সকলেই মুগ্ধ হইত। ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দের ২৩ শে মে তিনি ঘোষণা করিলেন যে, তিনি ঈশ্বরপ্রেরিত দূত; জ্ঞানবান ও শক্তিসম্পন্ন এক মহাপুরুষ আসিতেছেন, তাঁহারই জন্য তিনি পথ প্রস্তুত করিতে প্রেরিত হইয়াছেন। তিনি ১৮ জন শিষ্য সংগ্রহ করিলেন, তাঁহাদের মধ্যে একজন স্ত্রীলোকও ছিলেন। ইহারা সকলে সেই মহাপুরুষের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। তাঁহার প্রদত্ত শিক্ষার মূলের কথা—একেশ্বরে বিশ্বাস। জীবনে সততা, জীবে দয়া, স্ত্রীপুরুষের অধিকারের সাম্য সম্বন্ধে তিনি বিশেষভাবে উপদেশ দিতেন। কিন্তু অল্প দিনের মধ্যেই রাজশক্তি এবং প্রচলিত ধর্ম্মসম্প্রদায়ের পুরোহিতেরা তাঁহাকে এবং তাঁহার অনুগামীদিগকে সন্দেহের চক্ষে দেখিতে লাগিল এবং তাঁহাদের উপর প্রবল অত্যাচার আরম্ভ হইল। তিনি আপনাকে প্রচার করিবার দুই বৎসর পরে প্রচলিত ধর্ম্মের বিরুদ্ধাচরণের অপরাধে কারারুদ্ধ হইলেন এবং চারি বৎসর পরে মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা পাইলেন ও টাব্রিজে তাঁহাকে গুলি করিয়া মারা হইল। যাহাতে এই ধর্ম্মান্দোলনের একেবারে মূলোৎপাটন করা যায় তজ্জন্য প্রায় ২০,০০০ বাব জীবন হারাইলেন। কিন্তু বাবের দ্বারা যে সত্যের বীজ উপ্ত হইল তাহাকে নষ্ট করে অতি প্রবল অত্যাচারীরও এত বড় যোগ্যতা নাই।

বাব আপন জীবনে গভীর আধ্যাত্মিকতার একটি জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন এবং ধর্ম্ম ও সমাজ বিষয়ে মানবের কি প্রয়োজন তাহাও শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন। কারারুদ্ধ হইবার পূর্ব্বে এবং বন্দী অবস্থায়ও তিনি শিক্ষা দিতেন এবং গ্রন্থ রচনা করিতেন।

তাঁহার অনুগামীদিগের মধ্যে যাঁহারা টিহারণে বন্দী হইয়া ছিলেন তাঁহাদের মধ্যে মির্জা হুশেন্ আলি নামে একব্যক্তি বিশেষ প্রাধান্য লাভ করিয়াছিলেন। তিনি ধনীর বংশে জন্মগ্রহণ করেন; টিহারণে সকলে তাঁহাকে "দরিদ্রের পিতা" নাম প্রদান করিয়াছিল, —তিনি এতই দয়ালু ছিলেন। তাঁহার আধ্যাত্মিকতা অতি গভীর ছিল। তাঁহার প্রভূত সম্পত্তি রাজশক্তি বলপূর্ব্বক অধিকার করিয়া লইয়াছিল। প্রথমে তিনি বোগদাদে আবদ্ধ হইয়াছিলেন এবং পরে টিহারণে কারারুদ্ধ হন। কিছু পরিমাণে স্বাধীনতা পাইয়া তিনি সেই প্রদেশের পার্ব্বত্য অংশে গমন করিয়া দুই বৎসর নির্জ্জনে প্রার্থনায় যাপন করেন।

তখনো অত্যাচার শেষ হয় নাই। সেই সময় তিনি অনুগামীগণসহ কনষ্টাণ্টিনোপল্-এ তাড়িত হন। সেই খানে যাইবার পথে তিনি আপন পুত্র আব্বাস্ এফেণ্ডি বা আব্দুল বাহাকে (ঈশ্বরের ভৃত্য) বলিলেন যে বাব যে একজনের অভ্যুদয়ের কথা বলিয়া গিয়াছেন, তিনিই সেই একজন। এই মির্জা হুসেন আলিই—বাহাউল্লা (ঈশ্বরের মহিমা)। ইহার পর ইহাদের উপর অত্যাচারের মাত্রা কমিয়া আসিয়াছে। কনষ্টাণ্টিনোপল্ হইতে তাঁহারা এক্কায় তাড়িত হইয়াছিলেন। সেখানে তাঁহাদের ৭০ জনকে প্রথমে ২ টি মাত্র ঘরে আবদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছিল। পরে ক্রমে তাঁহাদের অসম নির্ভীকতা, বাধ্যতা এবং গভীর ধর্ম্মজীবন দেখিয়া শাসনকর্ত্তাদের মন পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল এবং তাঁহারা দুর্গ হইতে ১৮ মাইলের মধ্যে যথেচ্ছা বাস করিবার অনুমতি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বাবীগণের অধিকাংশই বাহাউল্লার পার্শ্বে আসিয়া বাহাই নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। "বাবীধর্ম্ম" শীর্ষক প্রবন্ধে এই ইতিহাস আরো বিস্তৃততর ভাবে আলোচিত হইয়াছে।

বাহাউল্লা ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে স্বর্গারোহণ করেন এবং আপন অনুগামীদিগের মধ্যে জ্যেষ্ঠ পুত্র আব্দুল বাহাকে রাখিয়া যান। পিতার মৃত্যুর পর আব্দুল বাহা বাহাইদিগের নেতা হইয়াছেন।

পূর্ব্বে যাঁহাদের কথা বলিবার সঙ্কল্প করা হইয়াছে আব্দুল বাহা (আব্বাস এফেণ্ডি) সেই তিন জনের আর এক জন। ইনি এখনো জীবিত আছেন; অল্পদিন হইল স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য তিনি ইংলণ্ডে গিয়াছেন। তিনি ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দের ২৩ শে মে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা তাঁহাকে এই সম্প্রদায়ের সেবাকার্য্যের জন্যই প্রস্তুত করিয়াছিলেন। বাল্যকাল হইতেই তিনি জানিতেন এবং জানিয়া অতুল আনন্দ লাভ করিতেন যে, তাঁহার সম্মুখে একটি অতি বিপদসঙ্কুল জীবন রহিয়াছে। বিপদের চিন্তায় তাঁহার মনে কোনো সঙ্কোচের রেখাপাত হয় নাই। তিনি তাঁহার পিতার অনুগামীদিগের ভার স্কন্ধে করিয়াই যেন জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। যে বিশ্বাস বাহাইদিগকে বল দান করিত তিনিও সেই বিশ্বাসবলেই বলীয়ান হইয়াছেন। মানবের সহিত মানবের যে স্বর্গীয় মিলনের কথা তিনি প্রচার করিতেছেন তাহাই মানুষের সহিত মানুষের শত বিচ্ছেদ শত দ্বন্দ্বের সমস্ত ক্ষত আরোগ্য করিবে ইহাই তাঁহার বিশ্বাস। তিনি যে কার্য্যের ভার গ্রহণ করিয়াছেন পরিপূর্ণভাবে সুন্দররূপে তিনি তাহা সম্পন্ন করিতেছেন। তিনি নাম লইয়াছেন "ঈশ্বরের ভৃত্য"—জীবনে এই নামের সার্থকতা সম্পাদন করিয়াছেন এবং এখনো করিতেছেন।

তিনি তাঁহার স্বধর্ম্মাবলম্বীগণের সহিত যে অত্যাচার সহ্য করিয়াছেন তাহাতে তাঁহার শরীর ভগ্ন হইয়া গিয়াছে। তাঁহাকে ৪০ বৎসর বন্দী অবস্থায় কাটাইতে হইয়াছে; কিন্তু কিছুতেই তাঁহার অন্তরের সরলতা, এবং প্রসন্নতা নষ্ট করিতে পারে নাই। তাঁহার জ্ঞান, ধর্ম্মপ্রাণতা এবং ঈশ্বরের উপর বিশ্বাস অগাধ।

তাঁহাকে দেখিলেই ভক্তিতে মস্তক আপনা আপনি নত হইয়া আসে। তাঁহার মুখে অন্তরের আলো সর্ব্বদাই প্রকাশিত হইয়া আছে। তাঁহার গম্ভীর মূর্ত্তি দেখিয়া ইংলণ্ডের সকলেই আশ্চর্য্য হইয়াছেন। যে ধর্ম্মপ্রাণতায় তাঁহার হৃদয় পরিপূর্ণ তাহারই আভায় তাঁহার মুখমণ্ডল সর্ব্বদা উদ্ভাসিত রহিয়াছে—ইহা যে মানবচিত্তকে আকর্ষণ করিবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? এই ঋষির পুণ্যপ্রভায় পাপীর কলুষ নাশ প্রাপ্ত হয়। তিনি জ্ঞানালোক প্রচারব্রতে ব্রতী আছেন—হস্তে তাঁহার সেই স্বর্গীয় আলোক। তাঁহার অন্তর ঈশ্বরের প্রতি, সমগ্র মানবসমাজের প্রতি প্রেমে পরিপূর্ণ। অল্পদিন হইল লণ্ডনের সিটি টেম্প্‌ল্ ধর্ম্মমন্দিরে তিনি যে কয়টি কথা বলিয়াছিলেন আমরা তাহার ইংরাজি অনুবাদ পাইয়াছি। তিনি বলিয়াছিলেন—"সদাশয় বন্ধুগণ, তোমরা ঈশ্বরকে অনুসন্ধান করিতেছ—ধন্য সেই পরমেশ্বর। আজ সত্যের আলোকে জগৎ উদ্ভাসিত। সকল দেশ ব্যাপিয়া স্বর্গের উদ্যানের মলয়বায় প্রবাহিত হইতেছে; সকল দেশেই সেই জগৎপিতার রাজ্যের সংবাদ পাওয়া যাইতেছে, পশ্চিম স্বর্গীয় সুগন্ধে পূর্ণ হইয়াছে এবং সর্ব্বত্রই মানবাত্মা তাহা গ্রহণ করিয়া ধন্য হইতেছে। সকল বিশ্বাসীর হৃদয়েই পবিত্র আত্মার হাওয়া বহিতেছে। পরমাত্মা অনন্ত জীবন দান করিতেছেন। এই অত্যাশ্চর্য্য যুগে পূর্ব্বদেশ আলোকিত হইয়াছে। মানবের একতাবন্ধনের সমুদ্র আনন্দহিল্লোলে তরঙ্গিত হইতেছে, কারণ মানবের হৃদয় ও মন সত্য যোগে এক হইয়া রহিয়াছে। পরমাত্মার পবিত্র নিশান উড়িয়াছে এবং মানব তাহা দেখিতেছে এবং বুঝিতেছে যে এক নূতন দিন আসিতেছে। মানবশক্তির এই এক নূতনতর অভিব্যক্তি। জগতের সকল দিক আজ আলোকিত হইয়া উঠিয়াছে; এই জগৎ আনন্দময় স্বর্গীয় উদ্যানে পরিণত হইবে। মানবসন্তানের মিলনের এবং সকল জাতির ও সকল শ্রেণীর মধ্যে একতাবন্ধনের সময় আসিয়াছে। পুরাতন অন্ধ সংস্কারগুলি, যেগুলি মানুষকে অজ্ঞান করিয়া রাখিয়া তাহাকে প্রকৃতরূপে মানুষ হইতে দিতেছিল না সেগুলি হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া গিয়াছে। এই জ্ঞানালোকের

যুগে ঈশ্বরের দানই এই জ্ঞান যে, মানবসমাজ এক এবং সমস্ত ধর্ম্মই মূলে এক। বিভিন্ন জাতির মধ্যে যুদ্ধ থামিয়া যাইবে এবং ঈশ্বরের ইচ্ছায় মহাশান্তি আসিবে। তখন জগৎকে দেখিয়া মনে হইবে নূতন জগৎ—সকল মানব তাহাতে ভ্রাতার ন্যায় একত্র বাস করিবে। পুরাতন কালে হিংস্র জন্তুদের সহিত যুদ্ধ করিয়াই মানুষের মনে যুদ্ধস্পৃহা জাগ্রত হইয়াছে; এখন আর তাহার কোনো প্রয়োজন নাই। সমবেত চেষ্টায় মানুষের অশেষ মঙ্গল সাধিত হইতেছে। আজকাল শত্রুতা কুসংস্কারের ফল। বাহাউল্লা বলিয়াছেন—'ন্যায়কেই সকলের অধিক ভালো বাসিতে হইবে।' ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে, এ দেশে ন্যায়ের পতাকা উড়িয়াছে। সকল আত্মাকেই সত্যভাবে সমান স্থান দিবার চেষ্টা চলিতেছে। সকল মহান্ চিত্তেরই ইচ্ছা এই। আজ পূর্ব্ব ও পশ্চিম উভয়েরই জন্য এই একই শিক্ষা; অতএব পূর্ব্ব এবং পশ্চিম পরস্পরকে বুঝিবে ও পরস্পরকে ভক্তি করিবে এবং দীর্ঘ বিচ্ছেদের পরে মিলিত প্রেমিকের মত পরস্পরকে আলিঙ্গন করিয়া গ্রহণ করিবে। ভগবান এক, মানব সমাজ এক, এবং সকল ধর্ম্মের মূলের কথা এক। এস আমরা তাঁহার উপাসনা করি এবং যে সকল মহাপুরুষ তাঁহার মহিমা প্রচার করিয়াছেন তাঁহাদের জন্য ভগবানকে ধন্যবাদ প্রদান করি। সেই অনন্তস্বরূপ তাঁহার পূর্ণ সমৃদ্ধিতে তোমাদের সহিত মিলিত থাকুন এবং প্রত্যেক আত্মা তাহার আপন শক্তি অনুসারে তাঁহা হইতে লাভবান হোক। প্রভু, তাহাই হোক!"

তাঁহার এই কথাগুলি হইতেই বেশ বুঝা যায় কি এক বিশ্বজনীন সত্যজ্যোতিতে তাঁহার অন্তরদেশ আলোকিত। মানবসমাজের এক আধ্যাত্মিক মিলনের সংবাদ তিনি প্রচার করিতেছেন; তিনি আপন অন্তরেও সেই যোগ অনুভব করিতেছেন। কয়েক মাস পূর্ব্বে আর্চডিকন্ উইল্‌বারফোর্স তাঁহার নিকট এই কএকটি কথা প্রেরণ করেন—"আমরা সকলে অবগুণ্ঠনের অন্তরালে একই।" আব্দুল বাহা ইহার উত্তরে বলিয়াছিলেন—"তাঁহাকে বল যে,এই অবগুণ্ঠনটি অতি সূক্ষ্ম এবং ইহা সম্পূর্ণরূপেই দূর হইবে।" এ মহামিলনে কোনো ব্যবধান থাকিবে না; সত্য সত্যই মানবসমাজ এক হইবে এই-ই তাঁহার কথা।

বহুকাল কারারুদ্ধ থাকিয়া এই তিন বৎসর হইল তিনি মুক্তিলাভ করিয়াছেন। এই দীর্ঘকাল তিনি আপনার সম্বন্ধে কিছুমাত্র চিন্তা করেন নাই, কেবল অপরের কথাই ভাবিয়াছেন এবং গভীর আধ্যাত্মিক যোগে কালাতিপাত করিয়াছেন। তিনি এইরূপ স্বার্থশূন্য জীবন অতিবাহিত করিয়াছেন বলিয়াই এত কষ্ট সহ্য করিতে পারিয়াছেন এবং জীবিত রহিয়াছেন। ধর্ম্মের জন্য সত্যের জন্য কারারুদ্ধ হইয়া তিনি কারাগারকে রাজপ্রাসাদ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার দেহ ক্লেশানুভব করিতেছিল কিন্তু তাঁহার আত্মা ক্লিষ্ট হয় নাই।

ধর্ম্মসম্প্রদায়ের নেতাকে তাঁহার অনুগামীরা প্রায়ই অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন বলিয়া প্রচার করিয়া থাকেন। আমাদের দেশে ইহার দৃষ্টান্ত আদৌ বিরল নহে। অনেককেই ঈশ্বরের অবতার বলিয়া প্রচার করিবারও চেষ্টা করা হইয়াছে এবং হইতেছে। আব্দুল বাহা দৃঢ়বাক্যে ইহার প্রতিবাদ করেন। তিনি বলেন—"আমি কেবল ঈশ্বরের একজন ভৃত্য মাত্র এবং আমাকে ইহার বেশি আর কিছু বলা হয় ইহা আমি আদৌ ইচ্ছা করি না।" তিনি স্পষ্টই বলিয়াছেন যে তিনি আর একটি নূতন সম্প্রদায় গঠন করিতে চান না। তাঁহারই কথা—"বাহাউল্লা যাহা বলিয়া গিয়াছেন তাহা সকল ধর্ম্মেরই ভিত্তিমূলের কথা। যিশু, মহম্মদ প্রভৃতি লোকশিক্ষক সত্যপ্রচারক মহাত্মাগণ যে সকল কথা বলিয়া গিয়াছেন তাহার মূলগত সত্য অনেকেই ভুলিয়াছেন। বাহাউল্লা সেই সমস্তকে নূতন করিয়া প্রচার করিয়াছেন। বাহাইগণ অন্য ধর্ম্মাবলম্বীদের প্রতি অধিক প্রীতি করিয়া থাকেন এবং তাঁহাদের প্রতিই অধিক আকৃষ্ট হন, কারণ তাঁহারা জানেন মানবসমাজ এক। বাহাউল্লা প্রীতিবন্ধন ও একতার উন্নতি সাধন করিতে চাহিয়াছেন। তিনি শুধু কোনো এক বিশেষ সম্প্রদায়ের নিকটেই তাঁহার কথা প্রচার করিয়াছেন তাহা নহে, সমগ্র জগতের নিকটেই তাঁহার সত্য উপস্থিত করিয়াছেন। আমরা সকলে এক মূলের উপর বিভিন্ন শাখা—একই ক্ষেত্রের তৃণদল। কেবল ভুল বোঝার জন্যই মানবসমাজে বিচ্ছেদ ও পার্থক্য প্রবেশ করিয়াছে। সত্য যদি সকলের নিকট উপস্থাপিত হয় তাহা হইলে সকলেই বুঝিবেন যে, সকলেই এক এবং তখন তাঁহারা বলিবেন—'এই তো, এই সত্যই ত আমরা খুঁজিতেছিলাম।' কারণ সকল সত্যউপদেষ্টার আসল কথা একই—তাঁহাদের মধ্যে কোনো পার্থক্য নাই।"

আব্দুল বাহা যখনই কিছু বলেন, মানবসমাজের আধ্যাত্মিক ঐক্যের কথাই বলিয়া থাকেন। ইহাই তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা বড় কথা এবং তাঁহার ধর্ম্মেরও প্রধান কথা ইহাই। পার্থক্য কি বিচ্ছেদ তিনি স্বীকার করেন না—সকলকে তিনি আপন করিয়া দেখেন—আপনাকে সকলের মধ্যে বিলাইয়া রাখিয়াছেন। তিনি বলেন, "মানুষ যদি তাহারই ভ্রাতৃস্থানীয় আর একজন মানুষকে

ভালবাসিতে না পারে সে ঈশ্বরকে ভালবাসিবে কিরূপে ?"

এবার আমরা এই ধর্ম্মান্দোলনের নেতৃগণের সম্বন্ধে বলিলাম, আগামী বারে বাহাই ধর্ম্ম সম্বন্ধে আলোচনা করা যাইবে।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

সমদৃষ্টি।

ভারতমাতার ছোট ছোট পুত্রকন্যাগণ, তোমরা জান যে রীতিনীতি পদ্ধতিতে তোমরা সকলে এক নহ। তোমরা কেহ হিন্দু, কেহ মুসলমান, কেহ খ্রীষ্টিয়ান ইত্যাদি। কিন্তু তোমরা কখনও ভুলিও না যে তোমরা সকলেই মানুষ ও একই জন্মভূমির সন্তান।

তোমরা একটি কথা স্মরণ রাখিও। তোমাদের প্রাচীন, দয়াবান, জ্ঞানী সম্রাট অশোক তেইশ শতাব্দী হইল এই কথাটি পাথরের উপর লিখিয়া গিয়াছেন ;—

"উপাসনা-পদ্ধতির জন্য কেহ কোন মনুষ্যের অনিষ্ট করিবে না"।

সম্রাট প্রজার প্রতি অধিক আর বলিতে পারেন না কেননা রাজার দৃষ্টি বাহ্য কার্য্যের উপর। আর তাঁহার আজ্ঞালঙ্ঘনে দণ্ড রহিয়াছে। কিন্তু তোমাদিগকে যাঁহারা ভালবাসেন, তোমরা সৎপথে চলিলে যাঁহাদের অন্তঃকরণ আনন্দে ভরিয়া উঠে তাঁহাদের তোমাদিগকে আরও কিছু বলিবার আছে। তাঁহারা বলিবেন, তোমরা সৎপথের পথিক, তোমরা মনুষ্য মাত্রের প্রতি দয়াবান, স্নিগ্ধহৃদয় হও ; স্নেহ দৃষ্টিতে লোকের প্রতি দেখ, তাহাদের জাতি ধর্ম্ম প্রভৃতি চোখের আড়াল করিয়া রাখ, তোমাদের অন্তরের স্নেহ, ন্যায়, সৌজন্য হিতকার্য্যে ফুটিয়া উঠুক।

প্রাচীনকালে এ দেশে জ্ঞানী, দয়াবান, স্নেহশীল ব্যক্তিগণ এই মনোবৃত্তিকে বলিতেন, সমদৃষ্টি। সমদর্শী ব্যক্তি কাহারও প্রতি ইতর বিশেষ করেন না। সকলের প্রতি সমান স্নেহ রাখিয়া সকলের হিতচেষ্টা করেন।

আধুনিক উপদেষ্টা পরমহংস শিবনারায়ণ স্বামী সমদৃষ্টি শিখাইবার জন্য বলিয়াছেন, "তোমরা ধর্ম্ম জাতি প্রভৃতির উপর লক্ষ্য না করিয়া পরস্পরকে সৎপথে চলিতে উৎসাহিত ও সাহায্য করিলে পরমাত্মা সমস্ত অহিত লুপ্ত করিয়া জগতে অখণ্ড মঙ্গল স্থাপনা করিবেন তাহাতে প্রত্যেকেই পরমানন্দে অবস্থিতি করিবে"।

সমদৃষ্টি শব্দ সংস্কৃত হইলেও যে গুণের এই নাম তাহা কোন বিশেষ ভাষা ব্যবহারের উপর নির্ভর করে না।

মহানুভব সর চার্লস এলেন একজন সমদর্শী পুরুষ। অল্পদিন হইল তাঁহার দেহান্ত হইয়াছে। অনেক দেশীয় লোকে তাঁহাকে চিনিত। এক সময়ে তিনি আলিপুরে জেলার হাকিম ছিলেন। সেই সময়ে কার্য্যের অনুরোধে তাঁহাকে ঘোড়ায় চড়িয়া স্থানে স্থানে বেড়াইতে হইত। এক দিন তিনি দেখিলেন এক গ্রামে পথের ধারে একজন অসহায়া স্ত্রীলোক পড়িয়া আছে। তাহার ওলাউঠা রোগ হইয়াছে বলিয়া গ্রামের লোক তাহার নিকট যাইতে চাহে না। পিপাসায় তাহার ছাতি ফাটিয়া যাইতেছে। সর চার্লস তাহার জাতিকুল অনুসন্ধান করিলেন না। তাঁহারই মত একজন মনুষ্য পীড়ায় অসমর্থ ও নিরাশ্রয় দেখিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ তাহাকে স্বহস্তে উঠাইয়া চিকিৎসার জন্য নিজে দূরবর্ত্তী ডাক্তারখানায় লইয়া গেলেন। তিনি এই বিষয় কাহারও নিকট কখনো উল্লেখ করিতেন না। বন্ধুরা করিলে লজ্জিত হইতেন।

কলিকাতার সহরতলী ভবানীপুরে নফরচন্দ্র কুণ্ডু নামে একটি যুবক ছিলেন। জীবদ্দশায় তাঁহাকে কেহ চিনিত না। তাঁহার মৃত্যুতে দেশশুদ্ধ সকলে জানিল যে তিনি কিরূপ হিতব্রত সমদর্শী পুরুষ ছিলেন। কলিকাতার ময়লা নিঃসারণের জন্য রাস্তার নীচে প্রকাণ্ড নল রহিয়াছে। নিয়মমত পরিষ্কার না করিলে নলের ভিতর বিষময় বায়ু জন্মিয়া সহরের স্বাস্থ্য নষ্ট হয়। এজন্য মধ্যে মধ্যে নলের ভিতর কুলি নামাইতে হয়। যে গর্ত্ত দিয়া নলে নামে তাহার নাম ম্যানহোল। একদিন দুইজন মুসলমান কুলি ম্যানহোল দিয়া নলের ভিতরে নামে। তখন নলে এত বিষময় বায়ু ছিল যে কুলিদ্বয় তাহাতে অভিভূত হইয়া পড়িল। নফর দেখিবামাত্র তাহাদের জাতি, ধর্ম্ম, অবস্থা বিচার না করিয়া তাহাদের উদ্ধারের জন্য ম্যানহোল পথে নলে প্রবেশ করিয়া প্রাণ হারাইলেন। তাঁহার গুণে মুগ্ধ স্বদেশী, বিদেশী ব্যক্তিগণ চাঁদা তুলিয়া তাঁহার স্মরণ-স্তম্ভ স্থাপন করিয়াছেন, তাহাতে খোদিত কথাগুলি এইঃ—

"যিনি সম্মুখবর্ত্তী ম্যানহোল হইতে দুইজন মুসলমান কুলিকে উদ্ধার করিতে গিয়া নিজের প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন,

যিনি ইটালির রামকৃষ্ণ মিশনের একজন সভ্য ছিলেন, পরহিতসাধন যাঁহার জীবনের মহাব্রত ছিল

সেই

স্বর্গীয় নফরচন্দ্র কুণ্ডুর

স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ

এই কীর্ত্তিস্তম্ভ

তাঁহার সদ্গুণের পক্ষপাতী ইউরোপীয় ও দেশীয়

জনসমূহ কর্ত্তৃক প্রদত্ত অর্থে স্থাপিত হইল।

জন্ম ১০ই চৈত্র ১২৮৭ সাল

মৃত্যু ২৯ শে বৈশাখ১৩১৪ সাল।"

কাবেরী নদীতে বন্যা। জল যেন পাগল হইয়া ছুটি-

তেছে। পড়িলে জীবনের আশা কিছুমাত্র নাই। এই অবস্থায় একটি নৌকা হইতে একজন কুলি পড়িয়া যায়। হিতব্রত সমদর্শী কাপ্তেন ডস্ তাহাকে উঠাইবার জন্য সেই মুহূর্ত্তে জলে ঝাঁপাইয়া কুলিকে বাঁচাইতে গিয়া নিজে প্রাণ হারাইলেন। ইঁহার স্মৃতিস্তম্ভ নাই। কিন্তু ভারতমাতার হৃদয় হইতে এই ইংরাজ পুরুষসিংহের স্মৃতি কখনো বিলুপ্ত হইবে না, আশা করা যায়।

বাদসাহ আকবরও এইরূপ একজন পুরুষসিংহ ছিলেন। তিনি জাতি কুল ধর্ম্মকে নগণ্য করিয়া গুণের আদর করিতেন।

যে সৎপথে এত মহাপুরুষের পদাঙ্ক রহিয়াছে, হে বালক বালিকাগণ, সেই পথে চলিতে কি তোমরা বিরত বা সঙ্কুচিত হইবে?

শ্রীমোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়।

বৈজ্ঞানিক বার্ত্তা।

(১) নিঃশব্দ গৃহ।

কিছুদিন হইল য়ুট্রেক্ট্ বিশ্ববিদ্যালয়ে বাহির হইতে কোনো প্রকার শব্দ প্রবেশ করিতে না পারে এমন একটী অত্যাশ্চর্য্য কক্ষ প্রস্তুত করা হইয়াছে। কক্ষটী দৈর্ঘ্যে প্রস্থে সাড়ে সাত ফুট্ ও এক বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগারের সর্ব্বোচ্চ স্থানে নির্ম্মিত। বহুকক্ষপরিবেষ্টিত হইলেও ঘরটীতে এমন ব্যবস্থা করা হইয়াছে যে প্রয়োজন হইলে আলো ও বাতাসের কোনো অভাব না ঘটে। দেওয়াল ছাদ ও মেঝে প্রত্যেকটী প্রায় ছয় রকমের বিভিন্ন জিনিষের স্তরে নির্ম্মিত; এবং ছিদ্রগুলি শব্দরোধক পদার্থের দ্বারা পূর্ণ। গৃহাগারে কোনো কোনো ব্যক্তি কানে এক অস্বাভাবিক অনুভূতি বোধ করেন। শব্দ-সম্বন্ধীয় বৈজ্ঞানিক তত্ত্বানুসন্ধান উদ্দেশ্যে এই কক্ষটী প্রস্তুত হইয়াছে বলিয়া যেমন একদিকে বাহিরের শব্দ রোধ করিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে আবার আবশ্যক মত বাহির হইতে শব্দ প্রবেশ করাইবার জন্য একটী তামার নল ব্যবহৃত হইয়াছে; যখন প্রয়োজন না হয় তখন সীসা দ্বারা নলের মুখ বন্ধ রাখা হয়।

(২) পাকস্থলীর সহিষ্ণুতা।

উন্মাদগ্রস্ত ব্যক্তির পাকস্থলীতে প্রচুর পরিমাণে আবর্জ্জনা পাওয়া গিয়াছে সময়ে সময়ে চিকিৎসকদের নিকট একথা শোনা যায়; কিন্তু দীর্ঘকাল নানা প্রকার কঠিন পদার্থ পাকস্থলীতে স্থান পাইতে পারে ইহা কেহ মনে করিতে পারে না। কিছুকাল হইল লণ্ডন ল্যান্সেট্ পত্রিকায় একটী অদ্ভুত ঘটনা বিবৃত করা হইয়াছে। অতিরিক্ত উত্তেজক দ্রব্য সেবনের ফলে ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া মিসৌরি ষ্টেট্ হাঁসপাতালে ৩৩ বৎসর বয়স্কা একজন স্ত্রীলোক প্রায় সাত বৎসর ছিল। এই দীর্ঘকাল মধ্যে উন্মাদের লক্ষণ ব্যতীত পাকস্থলীর কোনো প্রকার ব্যাধির চিহ্ন দৃষ্ট হয় নাই। অনেক সময় দেখা যাইত স্ত্রীলোকটী আল্‌পিন্, রুলের কাঁটা, পেরেক ইত্যাদি কুড়াইতেছে কিন্তু কেহ তাহাকে ঐ গুলি গলাধঃকরণ করিতে দেখে নাই। স্ত্রীলোকটীর মৃত্যুর পর পরীক্ষা করিতে গিয়া দেখা গেল তাহার পাকস্থলীটি যেন নীচের দিকে একটু বেশি ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। আমেরিকার দুই জন লব্ধপ্রতিষ্ঠ চিকিৎসক পাকস্থলীটি কাটিয়া প্রায় আড়াইসের নানাবিধ কঠিন পদার্থ বাহির করিয়াছেন; নিম্নে তাহার তালিকা দেওয়া হইলঃ—৪৫৩টা পেরেক, ৪২টা স্ক্রু, ১৩৬টা আল্‌পিন্, ১৫৫টা সেফ্‌টি পিন্, ৫২টা কার্পেট লাগাইবার পেরেক, ৬৩টা বোতাম ও ১৪৪৬টা ছোট বড় নানা প্রকার বিভিন্ন পদার্থ। আশ্চর্য্য এই, এতগুলি কঠিন পদার্থ উদরে রাখিয়া সাত বৎসরের মধ্যে পাকস্থলীর কোনো প্রকার ব্যাধির লক্ষণ প্রকাশ পায় নাই। মানুষের পাকস্থলী কতটা ভার বহন করিতে পারে, এই ঘটনাটি তাহারই পরিচায়ক।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

(৩) নিরামিষ আহার।

একটা কথা আছে আমিষাশী জীব অপেক্ষা নিরামিষভোজী জীবেরা অধিক কষ্টসহিষ্ণু হইয়া থাকে। গরু ও ঘোড়ার আহার তৃণ ও শস্য, কিন্তু তাহারা কিরূপ ভার বহন করিতে পারে, সহিষ্ণুতার সহিত বহুক্ষণব্যাপী কষ্ট সহ্য করিতে পারে তাহা আমরা জানি। আমিষাশী জীব সিংহ ব্যাঘ্র সেরূপ পারে না—অল্পেই তাহারা ক্লান্ত হইয়া পড়ে। মানুষের মধ্যেও যাহারা নিরামিষভোজী তাহারা যে আমিষাশীগণ অপেক্ষা অধিক সবলদেহ ও কষ্টসহিষ্ণু হয় তাহা নিম্নলিখিত দুইটি পরীক্ষা হইতে সুস্পষ্টরূপে বুঝিতে পারা যায়।

লণ্ডনের নিরামিষ-আহার-প্রচারিণী সভার সম্পাদিকা কুমারী শ্রীমতী এম্, আই, নিকোল্‌সন্ ১০,০০০ বালক-বালিকাকে কেবলমাত্র নিরামিষ আহার দিয়া ছয় মাস রাখিয়াছিলেন এবং অন্যত্র লণ্ডনের কাউন্টি কাউন্সিলের অর্থে ১০,০০০ বালক-বালিকাকে আমিষ আহার দিয়া ছয় মাস রাখা হইয়াছিল। ছয় মাসের পর এই উভয় দলকে পরীক্ষা করিয়া দেখা গেল যে নিরামিষ আহার্য্য-প্রাপ্ত বালক-বালিকারাই অপর দল অপেক্ষা অধিক স্বাস্থ্যবান হইয়াছে এবং তাহাদের দেহের ভার, মাংসপেশির দৃঢ়তা এবং গাত্রবর্ণের শুভ্রতা অধিক হইয়াছে।

তিন বৎসর পূর্ব্বে ব্রুসেল্‌স্‌ বিশ্ববিদ্যালয়ের শারীর-বিদ্যার অধ্যাপিকা চিকিৎসাশাস্ত্রবিৎ কুমারী শ্রীমতী টৌটেকো মানবদেহের উপর সুরাসার, ক্যাফীন্‌ প্রভৃতি পদার্থের কার্য্য পরীক্ষা করিবার সময় যে সকল লোকেরা অধিক পরিমাণে য়ুরিক এ্যাসিড্‌ গ্রহণ করে না এরূপ কতকগুলি লোকের উপর পরীক্ষা করিবার প্রয়োজন বোধ করেন। মাংসে য়ুরিক্‌ এ্যাসিড্‌ বহুল পরিমাণে থাকে, কাজেই তাঁহার পরীক্ষার জন্য নিরামিষভোজী লোকের প্রয়োজন হওয়ায় তিনি কতকগুলি সেইরূপ ব্যক্তিকে তাঁহার পরীক্ষাগারে আগমন করিতে অনুরোধ করেন। তাঁহারা আসিলেন। তিনি এর্গোগ্রাফ্‌ নামক মাংসপেশির বল-পরিমাপক যন্ত্রের সাহায্যে সমাগত নিরামিষভোজী ব্যক্তিগণের শক্তির পরীক্ষা গ্রহণ করিয়া ইঁহাদের শক্তি এবং কষ্টসহিষ্ণুতা দেখিয়া এতদূর আশ্চর্য্য হইলেন যে, তিনি মনে করিলেন এই লোকগুলি বিশেষভাবে শক্তিসম্পন্ন, সাধারণ শ্রেণীর লোক নহেন। এইরূপ মনে করিয়া এ বিষয়ে আরো গভীরভাবে পরীক্ষা করিবার জন্য তিনি নিরামিষভোজীদিগের সমিতির সকলকে তাঁহার পরীক্ষাগারে আহ্বান করিলেন। তার পর যতদূর সম্ভব সাবধানতার সহিত পরীক্ষা করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন যে, একজন সাধারণ শ্রেণীর নিরামিষভোজীর বল এবং কষ্টসহিষ্ণুতা একজন সাধারণ আমিষাশীর তিন গুণ। ইহার অল্পকাল পরেই ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডাক্তার ফিশার আমেরিকায় এই বিষয়ে পরীক্ষা করেন।

কুমারী টৌটেকো পূর্ব্বে আমিষভোজী ছিলেন; এই পরীক্ষার পর তিনি নিজেও আমিষ আহার ত্যাগ করিয়াছেন। এই বিষয়ের পরীক্ষার জন্য তিনি ফ্রান্সের চিকিৎসক-সমিতির নিকট হইতে পুরস্কার লাভ করিয়াছেন।

মানুষের পক্ষে নিরামিষ আহারই যে প্রশস্ত আজকাল অনেক চিকিৎসাশাস্ত্রজ্ঞেরই এই মত। নানা পরীক্ষা করিয়া তাঁহারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। এই সকল তথ্য প্রচার করিয়া নিরামিষ-আহার-প্রচারিণী সভা সকলকে আহারের জন্য প্রাণীহত্যা-রূপ হিংস্র বৃত্তি ত্যাগ করিয়া যাহা বিজ্ঞানানুমোদিত সেই আহার্য্যই গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিতেছেন।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

নানা কথা।

শোক সংবাদ।

(১)

বিগত ১৮ই কার্ত্তিক শনিবার শ্রদ্ধেয় প্রিয়নাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের দেহান্ত ঘটিয়াছে। তিনি প্রায় দুইমাস ধরিয়া রোগে শয্যাশায়ী ছিলেন, দিন দিন দেহের বল ক্ষয় হইয়া আসিতেছিল। বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য মধুপুর গমন করিয়াছিলেন। তথায় তাঁহার অমর আত্মা অনন্ত ধামে গমন করিয়াছে। মহর্ষির প্রিয় শিষ্য তাঁহার শেষ জীবনের সঙ্গী উপনিষদ্‌ভক্ত শাস্ত্রী মহাশয়ের অভাবে আদি ব্রাহ্মসমাজের যে সমূহ ক্ষতি হইল তাহা সহজে পূর্ণ হইবার নহে। মহর্ষিদেবের পরলোকগমনের পরে আমরা একে একে পণ্ডিত হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন, ভক্ত শম্ভুনাথ গড়গড়ি মহাশয়কে হারাইয়াছি। প্রাচীন দলের প্রায় সকলেই চলিয়া যাইতেছেন। যে সকল ভক্ত সাধু ও পণ্ডিতমণ্ডলীর দ্বারা মহর্ষিদেব পরিবেষ্টিত ছিলেন তিনি তাঁহাদের সকলকে ক্রমে ক্রমে আহ্বান করিয়া লইয়া সেই পবিত্র দেবলোকে নব নব উৎসবানন্দ উপভোগের আয়োজন করিতেছেন। শাস্ত্রী মহাশয় ব্রাহ্মসমাজের সকল সম্প্রদায়ের নিকট হইতেই গভীর শ্রদ্ধা ও ভক্তি আকর্ষণ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। তিনি অনেকগুলি ধর্ম্মপুস্তক রচনা করিয়া গিয়াছেন। মহর্ষির আত্মজীবনীর পরিশিষ্ট তাঁহারই রচিত। মহর্ষির পত্রাবলী বহুকষ্টে সংগ্রহ করিয়া তিনি প্রকাশিত করেন। গত ২৮এ কার্ত্তিক তাঁহার আদ্যশ্রাদ্ধ আদি ব্রাহ্মসমাজের পদ্ধতি অনুসারে তাঁহার বালিগঞ্জের ভবনে সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। অনেকগুলি দীনদরিদ্রকে অন্নবস্ত্র দান করা হইয়াছে। ঈশ্বর তাঁহার পরলোকগত আত্মার কল্যাণ বিধান করুন, তাঁহার শোক সন্তপ্ত পরিবারবর্গ ও বন্ধুবর্গের অন্তরে শান্তিবারি বর্ষণ করুন ইহাই আমাদিগের আন্তরিক প্রার্থনা।

(২)

আমাদের সুপরিচিত জ্ঞানী পণ্ডিত বেদান্তশাস্ত্রবিৎ কালিবর বেদান্তবাগীশ আজ কয়েকদিন হইল পরলোকে গমন করিয়াছেন। তাঁহার সহিত তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার বহুকালের ঘনিষ্ঠতম যোগ ছিল। তাঁহার রচিত সাংখ্য পাতঞ্জলের বহুল অংশ সর্ব্বপ্রথম তত্ত্ববোধিনীতেই বাহির হয়। মহর্ষিদেব ও শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় তাঁহাকে প্রথমাবধি যথেষ্ট উৎসাহ দিয়া আসিয়াছেন। তাঁহার অন্যান্য প্রবন্ধও পত্রিকাতে মধ্যে মধ্যে বাহির হইয়াছে। বেদান্তশাস্ত্রে পারদর্শী তাঁহার মত অতি অল্প লোকই বর্ত্তমান সময়ে জন্মিয়াছে। বেদান্ততত্ত্ব প্রচারের জন্য তিনি সারাজীবন পরিশ্রম করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুতে আমরা আত্মীয়ের অভাব অনুভব করিতেছি। দয়াময় তাঁহার পরলোকগত আত্মার মঙ্গল বিধান করুন।

শ্রীচিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়।

একমেবাদ্বিতীয়ং

অষ্টাদশ কল্প

প্রথম ভাগ।

পৌষ, ব্রাহ্মসম্বৎ ৮২।

৮২১ সংখ্যা

১৮৩৩ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্ সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়ং সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যং সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।"

বৌদ্ধধর্ম্মে ভক্তিবাদ।

ডাক্তার রিচার্ড দীর্ঘকাল চীনদেশে বাস করিতেছেন। তিনি খৃষ্টান মিশনরি।

তিনি লিখিতেছেন একবার তিনি কার্য্যবশত ন্যানকিং সহরে গিয়াছিলেন। সেখানে একটি বৌদ্ধশাস্ত্রপ্রকাশ সভা আছে। টাইপিং বিপ্লবের সময় যে সকল গ্রন্থ নষ্ট হইয়াছে তাহাই পুনরুদ্ধার করা এই সভার উদ্দেশ্য।

এই সভার প্রধান উদ্যোগী যিনি তাঁহার নাম য়াঙ্ বেন্ হুই। তিনি চীনের রাজপ্রতিনিধির অনুচররূপে দীর্ঘকাল য়ুরোপে যাপন করিয়াছেন। কন্‌ফুসিয় শাস্ত্র-শিক্ষায় তিনি উচ্চ উপাধিধারী।

ডাক্তার রিচার্ড তাঁহাকে যখন জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কন্‌ফুসিয় উপাধি লইয়া কি করিয়া বৌদ্ধ হইলেন," তিনি উত্তর করিলেন "আপনি মিশনরি হইয়া আমাকে এমন প্রশ্ন করিলেন ইহাতে আমি বিস্মিত হইতেছি। আপনি ত জানেন কেবলমাত্র সাংসারিক ব্যাপারের প্রতিই কন্‌ফুসিয় ধর্ম্মের লক্ষ্য—যাহা সংসারের অতীত তাহার প্রতি তাহার দৃষ্টি নাই।" রিচার্ড সাহেব কহিলেন "যাহা সংসারের অতিবর্ত্তী তাহার সম্বন্ধে মানব-মনের যে প্রশ্ন, বৌদ্ধধর্ম্মে তাহার কি কোনো সত্য মীমাংসা আছে?" তিনি কহিলেন "হাঁ"। পাদ্রি সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথায় তাহা পাওয়া যায়?" বেন্ হুই উত্তর করিলেন "ভক্তিউদ্বোধন' নামক একটি গ্রন্থে পাইবেন। এই পুস্তক পড়িয়াই কন্‌ফুসিয় ধর্ম্ম ছাড়িয়া আমি বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছি।"

ডাক্তার রিচার্ড এই বই আনাইলেন। পড়িতে আরম্ভ করিয়া প্রায় সমস্ত রাত্রি বই ছাড়িতে পারিলেন না। আর একজন মিশনরি রাত্রি জাগিয়া তাঁহার পাশে কাজ করিতেছিলেন—তাঁহাকে ডাকিয়া বলিলেন, "এ আমি আশ্চর্য্য একটি খৃষ্টান বই পড়িতেছি।"

ডাক্তার রিচার্ড যে বইটির কথা বলিয়াছেন তাহার মূল গ্রন্থটি সংস্কৃত—অশ্বঘোষের রচনা। এই সংস্কৃত গ্রন্থ লুপ্ত হইয়াছে কেবল চীনভাষায় ইহার অনুবাদ এখন বর্ত্তমান আছে।

বৌদ্ধধর্ম্ম জিনিষটা কি সে সম্বন্ধে আমরা একটা ধারণা করিয়া লইয়াছি। আমাদের বিশ্বাস এই যে, এই ধর্ম্মে ধর্ম্মের আর সমস্ত অঙ্গই আছে কেবল ইহার মধ্যে ঈশ্বরের কোনো স্থান নাই। জ্ঞানে ইহার ভিত্তি এবং কর্ম্মে ইহার মন্দিরটি গড়া, কিন্তু মন্দিরের মধ্যে কেহ নাই, সেখানে নির্ব্বাণের অন্ধকার, ভক্তি সেখান হইতে নির্ব্বাসিত।

আমরা ত বৌদ্ধধর্ম্মকে এই ভাবে দেখি অথচ দেখিতে পাইতেছি বৌদ্ধশাস্ত্র হইতে খৃষ্টান এমন কিছু লাভ করিতেছেন যাহার সঙ্গে তিনি আপন ধর্ম্মের প্রভেদ দেখিতেছেন না,—এবং যাহার রসে আকৃষ্ট হইয়া কন্‌-ফুসিয়শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া তাহার প্রচারে উৎসাহিত হইয়া উঠিয়াছেন।

ইহার উত্তরে কেহ কেহ বলিবেন, "হাঁ, চারিত্রনীতির উপদেশে খৃষ্টানধর্ম্মের সঙ্গে বৌদ্ধধর্ম্মের মিল আছে একথা সকলেই স্বীকার করে।" কিন্তু একটি কথা মনে রাখা উচিত, চারিত্রনীতির উপদেশ জিনিষটা মনোরম নহে;—তাহা ঔষধ; তাহা খাদ্য নহে; তাহার সাড়া পাইলে ছুটিয়া লোক জড় হয় না, বরঞ্চ উল্টাই হয়। বৌদ্ধধর্ম্মের মধ্যে যদি এমন কিছু থাকে যাহা আমাদের হৃদয়কে টানে

এবং তাহাকে পরিতৃপ্ত করে তবে জানিব তাহার মর্ম্মটি তাহার ধর্ম্মটি সেই জায়গাতেই আছে।

ডাক্তার রিচার্ড অশ্বঘোষের গ্রন্থটির মধ্যে এমন কিছু দেখিয়াছিলেন যাহা নীতি উপদেশের অপেক্ষা গভীরতর, পূর্ণতর;—যাহা দার্শনিকতত্ত্ব নহে, যাহা আচার অনুষ্ঠানের পদ্ধতিমাত্র নহে। সেই জিনিষটি কোথা হইতে আসিল?

সম্প্রতি ইংলণ্ডে কোনো সভায় কয়েকজন ভিন্নজাতীয় ব্যক্তি আপন আপন ধর্ম্ম লইয়া আলোচনা করিয়াছিলেন। একজন জাপানী বক্তা তাঁহার দেশের বিখ্যাত বৌদ্ধ আচার্য্যের ধর্ম্মোপদেশ হইতে স্থানে স্থানে উদ্ধৃত করিয়া বৌদ্ধমতের ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। এই বৌদ্ধ আচার্য্যের নাম সোয়েন্ শাকু; ইনি কামাকুরার এঙ্গাকুজি এবং কেঙ্কোজি মঠের অধ্যক্ষ। ইনি এক স্থানে বলিয়াছেন "আমরা বস্তুমাত্রের সীমাবদ্ধ বিশেষ সত্তা মানিয়া থাকি। সকল বস্তুই দেশে কালে বদ্ধ হইয়া কার্য্যকারণের নিয়মে চালিত হয়। বিষয়রাজ্যের বহুত্ব আমরা স্বীকার করি। এই সংসার বাস্তব, ইহা শূন্য নহে, এই জীবন সত্য, ইহা স্বপ্ন নহে। আমরা বৌদ্ধরা একটি আদিকারণ মানি, যাহা সর্ব্বশক্তিমান, সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বপ্রেমী। এই জগৎ সেই মহাপ্রজ্ঞা, মহাপ্রাণের প্রকাশ। ইহার সকল বস্তুতেই সেই আদিকারণের প্রকৃতির অংশ আছে। কেবল মনুষ্যে নহে, পশু ও জড়বস্তুতেও আদিকারণের দিব্যস্বভাব প্রকাশমান হইতেছে।

"ইহা হইতেই বুঝা যাইবে আমাদের মতে একই বহু এবং বহুই এক। এই জীবন এবং জগতের বাহিরে জগতের কারণকে খুঁজিতে যাওয়া ভ্রম। তাহা আমাদের মধ্যেই অধিষ্ঠিত। কিন্তু তাই বলিয়া এই জগতের মধ্যেই তাহার শেষ নহে—জগতের সমস্ত পদার্থসমষ্টিকে অতিক্রম করিয়াও সে আছে। সংক্ষেপে বলিতে গেলে বৌদ্ধেরা বিশ্বাস করে যে এই বিষয়রাজ্য অসত্য নহে, ইহার মূল কারণ জ্ঞানস্বরূপ, এবং তাহা সমস্ত জগতে পরিব্যাপ্ত।"

উপরে যাহা উদ্ধৃত করা গেল তাহা হইতে বুঝা যাইবে যে বৌদ্ধধর্ম্মসম্বন্ধে সাধারণত আমাদের যে ধারণা তাহার সহিত এই বৌদ্ধাচার্য্যের মতের মিল নাই। সম্ভবত কোনো কোনো বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মতের সঙ্গেও ইহার অনৈক্য হইবে।

কিন্তু ভাবিয়া দেখিবার বিষয় এই যে, কোনো কোনো বৌদ্ধসমাজে বৌদ্ধধর্ম্ম এইরূপ পরিণতি লাভ করিয়াছে—এবং নামান্তর গ্রহণ না করিয়া ইহা বৌদ্ধধর্ম্ম বলিয়াই পরিচিত। ইতিহাসের কোনো একটা বিশেষ স্থানে যাহা থামিয়া গিয়াছে তাহাকেই বৌদ্ধধর্ম্ম বলিব—আর যাহা মানুষের জীবনের মধ্যে নব নব কালে প্রবাহিত হইয়া চলিয়াছে, নব নব খাদ্যকে আত্মসাৎ করিয়া আপন জীবনকে পরিপুষ্ট প্রশস্ত করিয়া তুলিতেছে তাহাকে বৌদ্ধধর্ম্ম বলিব না এই যদি পণ করিয়া বসি তবে কোনো জীবিত ধর্ম্মকে ধর্ম্ম নাম দেওয়া চলে না।

কোনো বৃহৎ ধর্ম্মই একটিমাত্র সরল সূত্র নহে—তাহাতে নানা সূত্র জড়াইয়া আছে। সেই ধর্ম্মকে যাহারা আশ্রয় করে তাহারা আপনার প্রকৃতির বিশেষত্ব অনুসারে তাহার কোনো একটা সূত্রকেই বিশেষ করিয়া বা বেশি করিয়া বাছিয়া লয়। খৃষ্টানধর্ম্মে রোমান ক্যাথলিকদের সঙ্গে ক্যাল্‌ভিন্‌পন্থীদের অনেক প্রভেদ আছে। দুই ধর্ম্মের মূল এক জায়গায় থাকিলেও তাহার পরিণতিতে গুরুতর পার্থক্য ঘটিয়াছে। আমরা যদি কেবলমাত্র ক্যাল্‌ভিন্‌পন্থীদের মত হইতে খৃষ্টানধর্ম্মকে বিচার করি তবে নিশ্চয়ই তাহা অসম্পূর্ণ হইবে।

বৌদ্ধধর্ম্মসম্বন্ধেও সেইরূপ। সকলেই জানেন এই ধর্ম্ম হীনযান এবং মহাযান এই দুই শাখায় বিভক্ত হইয়া গিয়াছে। এই দুই শাখার মধ্যে প্রভেদ গুরুতর। আমরা সাধারণতঃ হীনযান মতাবলম্বী বৌদ্ধদের ধর্ম্মকেই বিশুদ্ধ বৌদ্ধধর্ম্ম বলিয়া গণ্য করিয়া লইয়াছি।

তাহার একটা কারণ, মহাযান সম্প্রদায়ী বৌদ্ধদিগকে ভারতবর্ষে আমরা দেখিতে পাই না। দ্বিতীয় কারণ, যে পালি-সাহিত্য অবলম্বন করিয়া য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণ বৌদ্ধধর্ম্মসম্বন্ধে আলোচনা করিতেছেন তাহার মধ্যে মহাযান সম্প্রদায়ের মতগুলি পরিণত আকার ধারণ করে নাই।

ধর্ম্মকে চিনিতে গেলে তাহাকে জীবনের মধ্যে দেখিতে হয়। পুরাতত্ত্ব আলোচনার দ্বারা তাহার ইতিহাসের উপকরণ সংগ্রহ করা যাইতে পারে কিন্তু তাহার পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায় না। অনেক সময় মিশনরিরা যখন আমাদের ধর্ম্মসম্বন্ধে বিচার করেন তখন দেখিতে পাই তাঁহারা কেবলমাত্র বই পড়িয়া বা সাময়িক বিকৃতির প্রতি লক্ষ্য করিয়া বিদেশীর ধর্ম্মসম্বন্ধে যে জ্ঞান লাভ করেন তাহা নিতান্তই অঙ্গহীন। বস্তুত শাস্ত্রবচন খুঁটিয়া লইয়া, টুক্‌রা জোড়া দিয়া ধর্ম্মকে চেনা যায় না। তাহার একটি সমগ্র ভাব আছে। সেই ভাবটিকে ঠিকমত ধরা শক্ত—এবং ধরিলেও তাহাকে পরিস্ফুট করিয়া নির্দ্দেশ করা সহজ নহে।

আমাদের দেশে যাঁহারা খৃষ্টানধর্ম্মসম্বন্ধে আলোচনা করেন তাঁহাদের একটা মস্ত সুবিধা এই যে, খৃষ্টানের মুখ হইতেই তাঁহারা খৃষ্টানধর্ম্মের কথা শুনিতে পান—এইজন্য তাহার ভিতরকার সুরটা তাঁহাদের কানে গিয়া পৌঁছায়। যদি কেবল প্রাচীন শাস্ত্র পড়িয়া বচন জোড়া দিয়া তাঁহাদিগকে এই কাজটি করিতে হইত তবে অন্ধ যেমন হাত বুলাইয়া রূপ নির্ণয় করে তাঁহাদেরও সেই দশা ঘটিত।

অর্থাৎ মোটামুট একটা আকৃতির ধারণা হইত কিন্তু সেই ধারণাটাই সর্ব্বোচ্চ ধারণা নহে। রূপের সঙ্গে যে বর্ণ, যে লাবণ্য, যে সকল অনির্ব্বচনীয় প্রকাশ আছে তাহা তাঁহাকে সম্পূর্ণ এড়াইয়া যাইত।

বৌদ্ধধর্ম্ম সম্বন্ধে আমাদের সেই দশা ঘটিয়াছে। পুঁথি-পড়া বিদেশী পুরাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতদের গ্রন্থের শুষ্কপত্র হইতে আমরা এই ধর্ম্মের পরিচয় গ্রহণ করি। এই ধর্ম্মের রসধারায় সেই পণ্ডিতদের চিত্ত স্তরে স্তরে অভিষিক্ত নহে। এক প্রদীপের শিখা হইতে আর এক প্রদীপ যেমন করিয়া শিখা গ্রহণ করে তেমন করিয়া তাঁহারা এই ধর্ম্মকে সমগ্রভাবে লাভ করেন নাই। এমন অবস্থায় তাঁহাদের কাছ হইতে আমরা যাহা পাই তাহা নিতান্ত মোটা জিনিষ; তাহা আলোকহীন চক্ষুহীন স্পর্শগত অনুভব মাত্র।

এই জন্য এইরূপ শাস্ত্রগড়া বৌদ্ধধর্ম্ম হইতে আমরা এমন জিনিষ পাই না যাহা আমাদের অন্তঃকরণের গভীর ক্ষুধার খাদ্য জোগাইতে পারে। একজন ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তি অনেককাল পালি গ্রন্থ আলোচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার মুখের কথার আভাসে একদিন বুঝিয়াছিলাম যে তিনি এই আলোচনায় রস পান নাই—তাঁহার সময় মিথ্যা কাটিয়াছে।

অথচ এই ধর্ম্ম হইতে কেহ রস পায় নাই এমন কথা বলিতে পারি না। ইহার মধ্যে একটি গভীর রসের প্রস্রবণ আছে যাহা ভক্তচিত্তকে আনন্দে মগ্ন করিয়াছে। দ্বাদশ ত্রয়োদশ শতাব্দীতে জাপানে বৌদ্ধধর্ম্মকে অবলম্বন যে ভক্তির বন্যা দেশকে প্লাবিত করিয়াছিল তাহার সঙ্গে আমাদের দেশে বৈষ্ণবধর্ম্মের আন্দোলনের বিশেষ প্রভেদ দেখি না।

আমাদের দেশে এক বেদান্তসূত্রকে অবলম্বন করিয়া দুই বিপরীত মতবাদ দেখা দিয়াছে—শঙ্করের অদ্বৈতবাদ আর বৈষ্ণবের দ্বৈতবাদ। শঙ্করের অদ্বৈতবাদকে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধমত বলিয়া কেহ কেহ নিন্দা করিয়াছেন। ইহা হইতে অন্ততঃ একথা বুঝা যায় যে বৌদ্ধদর্শনের সংঘাতে এবং অনেক পরিমাণে তাহার সহায়তায় শঙ্করের এই মতের উৎপত্তি হইয়াছে।

কিন্তু সেই দ্রাবিড় হইতেই যে প্রেমের ধর্ম্মের স্রোত সমস্ত ভারতবর্ষে একদিন ব্যাপ্ত হইয়াছে সেই বৈষ্ণব ধর্ম্মকেও কি এই বৌদ্ধধর্ম্মই সঞ্জীবিত করিয়া তোলে নাই? আমরা দেখিয়াছি বৌদ্ধ মন্দিরে বৈষ্ণব দেবতা স্থান লইয়াছে, এক কালে যাহা বুদ্ধের পদচিহ্ন বলিয়া পূজিত হইত তাহাই বিষ্ণুপদচিহ্ন বলিয়া গণ্য হইয়াছে, রথযাত্রা প্রভৃতি বৌদ্ধ উৎসবকে বৈষ্ণব আত্মসাৎ করিয়াছে।

বৌদ্ধযুগের পূর্ব্বে আমরা যে বৈদিক দেবতাদিগকে দেখি তাঁহারা স্বর্গবাসী দিব্যপুরুষ। সংসারপাশে আবদ্ধ মানুষকে মুক্তিদান করিবার জন্য পরমদয়া যে মানবরূপে মর্ত্ত্যলোকে আবির্ভূত—এই ভাবটির উদ্ভব কি সর্ব্ব প্রথমে বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মধ্যেই নহে? বৈদিক যুগে কি কোথাও আমরা ইহার কোনো আভাস পাইয়াছি?

জাপানী অধ্যাপক আনেসাকি হিবার্ট জর্নালে খৃষ্টান ও বৌদ্ধধর্ম্মের তুলনা করিয়া এক জায়গায় লিখিয়াছেন যে এই দুই ধর্ম্মধারার মূলে আমরা একটি জিনিষ দেখিতে পাই—উভয় স্থানেই সত্য মানবরূপ গ্রহণ করিয়াছে, ভক্তি নরদেহ ধারণ করিয়াছে, প্রেমেতে এবং ভক্তিতে সত্যকে সম্মিলিত করিয়া উপলব্ধি করিবার জন্য বিশ্ব-মানবের প্রতিনিধিস্বরূপ একজন মানুষের প্রয়োজন হইয়াছে।—

বস্তুতঃ বৌদ্ধধর্ম্মেই সর্ব্বপ্রথমে কোনো একজন মানুষকে মানুষের চেয়ে অনেক বেশি করিয়া দেখা হইয়াছিল। বৌদ্ধধর্ম্মের যিনি প্রতিষ্ঠাতা তিনি তাঁহার ভক্তদের চক্ষে মানুষের সমস্ত স্বাভাবিক সীমা অতিক্রম করিয়াই যেন প্রতিভাত হইয়াছেন। তিনি যে অসামান্য শক্তিসম্পন্ন গুরু তাহা নহে—তিনি যেন মূর্ত্তিমান অসীম প্রজ্ঞা, অসীম করুণা। তিনি মুক্ত হইয়াও কেবল জীবকে দুঃখ হইতে ত্রাণ করিবার জন্যই বন্ধন স্বীকার করিয়াছেন—সে তাঁহার কর্ম্মফলের অনিবার্য্য বন্ধন নহে সে তাঁহার প্রেমের দ্বারা দয়ার দ্বারা স্বেচ্ছারচিত বন্ধন।

কোনো বিশেষ একজন মানুষকে এমন করিয়া অসীম করিয়া দেখা বৌদ্ধধর্ম্মে প্রথম প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল এবং যিশুকে ত্রাণকর্ত্তা অবতাররূপে স্বীকার করা যে এই বৌদ্ধ মতেরই অনুসরণ করিয়া ঘটে নাই তাহা বলিতে পারিব না। বৌদ্ধধর্ম্মের এই অবতারবাদ এই ভক্তি-বাদের দিকটাই বৈষ্ণব ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া ভারতে বৌদ্ধ-ধর্ম্মের পরিণামরূপে বিরাজ করিতেছে এইরূপ আমার বিশ্বাস।

ত্রয়োদশ শতাব্দীতে সাধু হোনেন জাপানে বৌদ্ধ-ধর্ম্মের মধ্যে হইতে যে ভক্তির উৎস উৎসারিত করিয়া-ছিলেন তাহার বিবরণ অধ্যাপক আনেসাকি ধর্ম্ম-ইতিহাস আলোচনার আন্তর্জাতিকসম্মিলনসভায় বিবৃত করিয়াছিলেন। ভাগবত ধর্ম্মের সঙ্গে তাঁহার সে ভক্তিধর্ম্মের মর্ম্মগত প্রভেদ নাই বলিলেই হয়। তিনি বলিয়াছেন, অমিত বুদ্ধের দয়াতেই জীবের মুক্তি। এই অমিত, সুখাবতী নামক বৌদ্ধশাস্ত্রের আনন্দলোকের অধীশ্বর। ইনি সর্ব্বশক্তিমান, করুণাময়, মুক্তিদাতা। যে কেহ ব্যাকুল-চিত্তে তাঁহার শরণ গ্রহণ করিবে সে বুদ্ধকে মনশ্চক্ষুতে দেখিতে পাইবে ও মৃত্যুকালে সমস্ত পার্ষদমণ্ডলীসহ অমিত আসিয়া তাহাকে আদরে গ্রহণ করিবেন। এই অমিতাভের জ্যোতি বিশ্বজগতে ব্যাপ্ত, দৃষ্টি মেলিলেই

দেখা যায়; এই অমিতায়ুর প্রাণ মুক্তিধামে নিত্যকাল উপলব্ধ, যিনি ইচ্ছা করেন লাভ করিতে পারেন।

ইহা হইতে পাঠকেরা দেখিতে পাইবেন, বুদ্ধ যেখানেই মানুষের জ্ঞানকে ছাড়াইয়া তাহার ভক্তিকে অধিকার করিয়াছেন সেখানেই তাঁহার মানবভাব বিলুপ্ত হইয়াছে—সেখানে তাঁহার ধারণার সঙ্গে ভগবানের ধারণা এক হইয়া গিয়াছে।

বৌদ্ধধর্ম্মের তিনটি মুখ বুদ্ধ, ধর্ম্ম এবং সংঘ। তাহার ধর্ম্মে জ্ঞান, সঙ্ঘে কর্ম্ম ও বুদ্ধে ভক্তি আশ্রিত হইয়া আছে। যদিও এই তিনের পরিপূর্ণ সম্মিলনই বৌদ্ধধর্ম্মের পূর্ণ আদর্শ তবু দেশ কাল পাত্রের প্রকৃতি অনুসারে সে আদর্শ বিভক্ত হইয়া পড়ে এবং তখন ইহার কোনো একটা দিকই প্রবল হইয়া দেখা দেয়। হীনযান ও মহাযানে তাহারই প্রমাণ পাওয়া যায়। হীনযানের দিকে যখন দেখি তখন মনে হয় বৌদ্ধধর্ম্মে পূজাভক্তি বুঝি নাই—প্রত্যক্ষের অতীত কোনো মহৎ সত্তাকে বৌদ্ধধর্ম্ম বুঝি একেবারেই অস্বীকার করে—আবার মহাযানের দিকে তাকাইলে মনে হয়—ভক্তির প্রবল উচ্ছ্বাসে বৌদ্ধধর্ম্ম নানা বিচিত্র রূপরস সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছে কোথাও তাহার জ্ঞানের সংযম নাই।

কিন্তু আসল কথা, বৌদ্ধধর্ম্মের মধ্যে এই দুটা দিকই আছে। সমস্ত বাসনা ও কর্ম্ম নিঃশেষে ধ্বংস করিয়া নির্ব্বাণমুক্তির মধ্যেই আপনাকে একেবারে "না" করিয়া দেওয়াই যে বৌদ্ধধর্ম্মের চরম লক্ষ্য নহে তাহা একটু চিন্তা করিয়া দেখিলেই বুঝা যাইবে। সর্ব্বভূতের প্রতি প্রেম জিনিষটি শূন্য পদার্থ নহে। এমন বিশ্বব্যাপী প্রেমের অনুশাসন কোনো ধর্ম্মেই নাই। প্রেমের দ্বারা সমস্ত সম্বন্ধ সত্য এবং পূর্ণ হয়, কোনো সম্বন্ধ ছিন্ন হয় না। অতএব প্রেমের চরমে যে বিনাশ ইহা কোনোমতেই শ্রদ্ধেয় নহে।

একদিকে স্বার্থপর বাসনাকে ক্ষয় ও অন্য দিকে স্বার্থত্যাগী প্রেমকে সমস্ত সীমা অবলুপ্ত করিয়া বিস্তার করা এই দুই শিক্ষাই যেখানে প্রবল মাত্রায় একত্র মিলিত হইয়াছে বুঝিতেই হইবে শূন্যতাই সেখানে লক্ষ্য নহে। কোনো এক সম্প্রদায়ের বৌদ্ধদলের বা কোনো বিশেষ বৌদ্ধগ্রন্থের মধ্যে পোষক প্রমাণ থাকিলেও আমরা তাহাকেই সম্পূর্ণ সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিব না। মাটি চাষ করাটাকেই মুখ্য বলিয়া গণ্য করিব এবং ফসল বোনাটাকেই গৌণ বলিয়া উপেক্ষা করিব ইহা হইতেই পারে না।

এই ফসলের কথাটা যেখানে আছে, সেইখানেই মানুষের মন বিশেষ করিয়া আকৃষ্ট হইয়াছে—এবং সেই আকর্ষণেই কঠিন সাধনার দুঃখ মানুষ মাথায় করিয়া লইয়াছে। একদল তার্কিক এমন ভাবে তর্ক করে যে যেহেতু ক্ষেত্রকে দীর্ণ বিদীর্ণ করিতে বলা হইয়াছে অতএব সমস্ত ফসল নষ্ট করিয়া ফেলাই এই উপদেশের তাৎপর্য্য। আগাছা উৎপাটন করিয়া ফেলাই যে তাহার উদ্দেশ্য সে কথা বুঝিতে বাকি থাকে না, যখন শুনিতে পাই, প্রেমের বীজ মুঠা মুঠা দিকে দিকে ছড়াইয়া দিবে। এই প্রেমের ফসল নির্ব্বাণ নহে, আনন্দ, সে কথা বলাই বাহুল্য।

শ্রাবণ মাসের প্রবাসীতে শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র ঘোষ মহাশয় দেখাইয়া দিয়াছেন যে, বুদ্ধদেব শূন্যবাদী ছিলেন না ও তিনি ব্রহ্মকে স্বীকার করিয়াছেন। লেখক বলিয়াছেন "ইতিবুত্তকং" নামক পালিগ্রন্থে লিখিত আছে যে, এক সময়ে ভগবান বুদ্ধ নিম্নলিখিত গাথা উচ্চারণ করিয়াছিলেন :—

যস্‌স রাগো চ দোসো চ অবিজ্জা চ বিরাজিতা ;
তম্ ভাবিতত্তঞ্ঞতরম্ ব্রহ্মভূতম্ তথাগতম্
বুদ্ধম্ বেরভয়াতীতম্ আহু সব্বপহায়িনন্তি।

যাঁহার রাগ দ্বেষ এবং অবিদ্যা তিরোহিত হইয়াছে তাঁহাকে ধর্ম্মে সুপ্রতিষ্ঠিত, ব্রহ্মভূত, তথাগত এবং বৈর ও ভয়াতীত এবং সর্ব্বত্যাগী বুদ্ধ বলা হয়।"

"ব্রহ্মভূত" শব্দের অর্থ এই যে, যিনি ব্রহ্মস্বরূপে বিরাজ করেন।

মহেশ বাবু যে শ্লোকটি উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহাতে ব্রহ্মভূত ব্যক্তির যে সকল লক্ষণ ব্যক্ত হইয়াছে তাহা ত্যাগমূলক। কিন্তু বৌদ্ধধর্ম্ম কেবলমাত্র ত্যাগের ধর্ম্ম নহে। তা যদি হইত তবে তাহার মধ্যে প্রেমের কোনো স্থান থাকিত না।

বস্তুত বৌদ্ধধর্ম্মের বিশেষত্বই এই যে একদিকে তাহার যেমন কঠোর ত্যাগ অন্য দিকে তাহার তেমনি উদার প্রেম। ইহা কেবলমাত্র জ্ঞানের ধর্ম্ম ধ্যানের ধর্ম্ম নহে। বুদ্ধদেব নিজের জীবনেই তাহা সপ্রমাণ করিয়াছেন। তিনি যখন দীর্ঘকাল তপস্যার পর তপস্যা পরিত্যাগ করিলেন তখন যাহারা তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধাবান হইয়াছিল তাহাদের শ্রদ্ধা তিনি হারাইলেন। কারণ তখনকার বিশ্বাস ছিল এই যে, তপশ্চরণের দ্বারা সমাধি প্রাপ্তিই ব্রহ্মলাভ, তাহাই চরম সিদ্ধি। কিন্তু যখন বুদ্ধদেব বুদ্ধত্ব লাভ করিলেন তখনই তিনি কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলেন। সে কর্ম্ম বিশুদ্ধ কর্ম্ম, কারণ তাহাতে ভয় লোভ মোহ হিংসা নাই—তাহা স্বার্থবন্ধনের অতীত—তাহা দয়ার কর্ম্ম, প্রেমের কর্ম্ম।

অতএব যেখানে বাসনার ক্ষয় হয় সেখানে যে কিছুই বাকি থাকে না তাহা নহে। সেখানে সমস্ত আসক্তি ও রিপুর আকর্ষণ দূর হইয়া যায় বলিয়াই দয়া প্রেম আনন্দ পরিপূর্ণ হইয়া উঠে। সেই পরিপূর্ণতাই ব্রহ্মের স্বরূপ।

অতএব যিনি ব্রহ্মভূত হইবেন, ব্রহ্মের স্বরূপে বিরাজ করিবেন তাঁহাকে, কেবল ত্যাগের রিক্ততা নহে, ত্যাগের দ্বারা প্রেমের পূর্ণতা লাভ করিতে হইবে।

এই জন্যই ব্রহ্মবিহার কাহাকে বলে বুদ্ধ তৎসম্বন্ধে বলিয়াছেন :—

মাতা যথা নিযং পুত্তং আয়ুসা একপুত্তমনুরক্খে
এবম্পি সব্বভূতেসু মানসম্ভাবয়ে অপরিমাণং।
মেত্তঞ্চ সব্বলোকস্মিং মানসম্ভাবয়ে অপরিমাণং।
উদ্ধং অধো চ তিরিযঞ্চ অসম্বাধং অবেরমসপত্তং।
তিঠ্‌ঠঞ্চরং নিসিন্নো বা সয়ানো বা যাবতস্স বিগতমিদ্ধো
এতং সতিং অধিট্‌ঠেয্যং ব্রহ্মমেতং বিহারমিধমাহু।

মাতা যেমন প্রাণ দিয়াও নিজের পুত্রকে রক্ষা করেন সেই-রূপ সকল প্রাণীর প্রতি অপরিমাণ দয়াভাব জন্মাইবে। ঊর্দ্ধদিকে অধোদিকে চতুর্দ্দিকে সমস্ত জগতের প্রতি বাধাশূন্য হিংসাশূন্য শত্রুতাশূন্য মানসে অপরিমাণ দয়াভাব জন্মাইবে। কি দাঁড়াইতে, কি চলিতে, কি বসিতে, কি শুইতে, যাবৎ নিদ্রিত না হইবে এই মৈত্রভাবে অধিষ্ঠিত থাকিবে—ইহাকেই ব্রহ্মবিহার বলে।

এইরূপ বিশ্বব্যাপী প্রেমের মধ্যে চিত্তকে প্রসারিত করাকেই বুদ্ধ ব্রহ্মবিহার বলিয়াছেন। ইহাতে প্রমাণ হইতেছে বুদ্ধ ব্রহ্মকে প্রেমস্বরূপ বলিয়াই জানিয়াছেন—ব্রহ্ম তাঁহার কাছে শূন্যতা নহে।

এই প্রেমকেই যদি সর্ব্বব্যাপী পরম সত্য বলিয়া গণ্য করা হয় তবে সংসারকে একেবারে বাদ দিয়া বসিলে চলিবে কেন? করুণা বল, প্রেম বল, আপনাকে লইয়া আপনি থাকিতে পারে না। প্রেমের বিষয়কে বাদ দিয়া প্রেমের সত্যতা নাই।

মহাযান সম্প্রদায়ীরা এ সম্বন্ধে যাহা বলেন তাহা প্রণিধানের যোগ্য। পরে আমরা তাহা আলোচনা করিব।

যিনি নিজে বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী অথচ যিনি আধুনিক কালের পাঠকসমাজের কাছে নিজের মত সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত করিবার যোগ্যতা লাভ করিয়াছেন তাঁহারই নিকট হইতে আমরা এ সম্বন্ধে সহায়তা প্রত্যাশা করিতে পারি।

জাপানী বৌদ্ধ পণ্ডিত তাইতারো সুজুকির নিকট হইতে এ বিষয়ে আমরা জ্ঞান লাভ করিতে পারিব। তিনি অশ্বঘোষের গ্রন্থের অনুবাদ করিয়াছেন এবং মহাযান বৌদ্ধ মতেরও ব্যাখ্যা করিয়া বই লিখিয়াছেন।

তাঁহার গ্রন্থগুলি আমরা দেখিবার সুযোগ পাই নাই। কিন্তু তাঁহার পুস্তক অবলম্বন করিয়া ইংরেজি Quest পত্রে সম্পাদক মহাশয় যে বিস্তৃত প্রবন্ধ লিখিয়াছেন তাহা পাঠ করিলে ইহা বুঝা যায় যে, যেমন বেদান্ত দর্শন সম্বন্ধে কেবলমাত্র শাঙ্কর ভাষ্য পড়িলে ভারতে প্রচলিত বেদান্তকে সম্পূর্ণ আয়ত্ত করা হইল মনে করা যায় না, সেইরূপ পালি গ্রন্থে বৌদ্ধধর্ম্মের যে পরিচয় পাওয়া যায় এবং যাহা অবলম্বন করিয়া সাধারণতঃ য়ুরোপীয় পণ্ডিতেরা অনেক দিন ধরিয়া আলোচনা করিতেছেন বৌদ্ধধর্ম্মের মর্ম্মগত সত্য সন্ধানের পক্ষে তাহাই যথেষ্ট নহে।

একথা স্পষ্টই মনে হয় ভারতবর্ষের চিত্ত হইতে জ্ঞানের ধারা এবং প্রেমের ধারাকে বুদ্ধদেব একত্রে আকর্ষণ করিয়া একদিন মিলাইয়াছিলেন। সেই মিলনের বন্যায় একদিন পৃথিবীর দেশ বিদেশ ভাসিয়া গিয়াছিল। তাহার পরে এতবড় মিলনের একটি বিপুল শক্তি ভারতবর্ষ হইতে যে একেবারে অন্তর্হিত হইয়াছে তাহা নহে। বৌদ্ধযুগের পরবর্ত্তী দর্শনে পুরাণে কোথাও বা নবীনরূপে, কোথাও বা পুরাতনকে নূতন আকার দিয়া সেই ধারা নানা শাখা প্রশাখায় নানা নামে আজও প্রবাহিত হইতেছে।

আমরা পূর্ব্বে একস্থানে আভাস দিয়াছি ভারতবর্ষে বৌদ্ধ ধর্ম্মের সঙ্গে বৈষ্ণব ধর্ম্মের একটা সম্মিলন ঘটিয়াছিল। বস্তুত বৌদ্ধধর্ম্ম বৈষ্ণব ধর্ম্মকে সৃষ্টি করে নাই। তাহার পুষ্টিসাধন করিয়াছে। গুরুকে দেবতা জ্ঞান করা এবং তাঁহার প্রসাদেই মুক্তি এই কথা স্বীকার করা আমাদের আধুনিক পৌরাণিক ধর্ম্মে দেখা যায়—আমার বিশ্বাস এইরূপ গুরুবাদের উৎপত্তি বৌদ্ধধর্ম্ম হইতে। ইহার কারণ এই যে, মানুষের ভক্তিবৃত্তি একটা সত্যপদার্থ, তাহাকে খাদ্য জোগাইতেই হইবে। যে ধর্ম্মের যেমন মতই হোক না কেন, ভক্তির আশ্রয় কাড়িয়া লইলে ভক্তি যেমন করিয়া হোক আপনার একটা আশ্রয় খাড়া করিয়া লয়। বুদ্ধদেব তাঁহার উপদেশে স্পষ্ট করিয়া ভক্তির কোনো চরম আশ্রয় নির্দ্দেশ করেন নাই। এই জন্য তাঁহার অনুবর্ত্তীদের ভক্তিবৃত্তি তাঁহাকেই বেষ্টন করিয়া ধরিয়াছে। এবং ভক্তির স্বাভাবিক চরম গতি যে পরম পুরুষে, বুদ্ধকে তাঁহার সঙ্গেই মিলাইয়া লইয়াছে। এইরূপে বৌদ্ধধর্ম্মে মানুষের ভক্তি অগত্যা মানুষকেই আশ্রয় করিয়াছে এবং সেই সমস্ত সীমাকে ভেদ করিয়া বিদীর্ণ করিয়া ভগবানের মধ্যে উত্তীর্ণ হইবার চেষ্টা করিয়াছে। অশ্বথ গাছ যখন মন্দিরের ভিত্তিতে জন্মায় তখন সেই মন্দিরকে নিজের প্রয়োজন অনুসারে ভাঙিয়া চুরিয়া নানাখানা করিয়া ফেলে—কেননা যেখানে তাহার খাদ্য যেমন করিয়া হোক, সেখানে তাহাকে শিকড় পাঠাইতে হইবে। বৌদ্ধধর্ম্ম একদা দেবতাকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিল বলিয়াই এই ধর্ম্মে ভক্তি মানুষকে আশ্রয় করিয়াছিল—কিন্তু মানুষের মধ্যে তাহার সম্পূর্ণ খাদ্য নাই এই কারণে সে বাঁকিয়া চুরিয়া যেমন করিয়া পারে আপন আশ্রয়কে অতিক্রম করিয়া নিত্য-আশ্রয়ের মধ্যে মুক্তিলাভের চেষ্টা করিয়াছে। এমনি করিয়া এইখানে গুরুবাদের উৎপত্তি ঘটিয়াছে।

মুক্তির পক্ষে আত্মশক্তিই প্রধান এই কথার উপরেই

বৌদ্ধধর্ম্মে বিশেষ জোর দেওয়া হইয়াছে। তাহার কারণও ছিল। ভারতবর্ষে যে সময়ে বুদ্ধের আবির্ভাব সে সময়ে যাগ যজ্ঞ প্রভৃতি বাহ্য ক্রিয়াকাণ্ডের দ্বারা মুক্তি হইতে পারে এই কথার খুব প্রভাব ছিল। হোমাদি করিয়া দেবতাদিগকে খুসি করিতে পারিলেই তাঁহাদের অলৌকিক শক্তি দ্বারা মানুষ সহজেই সদ্গতি লাভ করিবে এই প্রকার তখন বিশ্বাস ছিল। ইহারই বিরুদ্ধে বুদ্ধদেবকে বিশেষ করিয়া বলিতে হইয়াছিল, সাধু চিন্তা, সাধু বাক্য, সাধু কর্ম্মের দ্বারাই মুক্তির পথ সুগম হয়। মুক্তি যথার্থ সাধনার দ্বারাই সাধ্য এখানে অল্পমাত্রও ফাঁকি চলেনা।

কিন্তু মানুষ জানে আত্মশক্তিই পর্য্যাপ্ত নহে। শুধু চোখ দিয়া আমরা দেখি না, বাহিরের আলো নহিলে আমাদের দেখা চলেনা। তাহার একটা দিক আছে শক্তির দিক আর একটা দিক আছে নির্ভরের দিক। এই দুইয়ের যোগ বিচ্ছিন্ন করিয়া দিলে ইহার একটাকেই একান্ত করিয়া দিলে এমন একটা প্রতিক্রিয়ার বিপ্লব উপস্থিত হয় যে উল্টা দিকটা অতিমাত্র প্রবল হইয়া উঠে। বৌদ্ধ ধর্ম্ম আত্মশক্তিতে মানুষকে বলিষ্ঠ করিয়া তুলিবার পক্ষে যত জোরে টান দিয়াছিল তত জোরেই সে দৈবশক্তির দিকে ছুটিয়াছে। এমন দিন আসিল যেদিন মুক্তিলাভের জন্য বুদ্ধের প্রতি বৌদ্ধের নির্ভরের আর সীমা রহিল না। হোনেন বলিয়াছেন বড় বড় ভারি পাথর যেমন জাহাজকে আশ্রয় করিয়া অনায়াসে সমুদ্র পার হইয়া যায় তেমনি পর্ব্বতাকার পাপের বোঝা সত্ত্বেও আমরা অমিত বুদ্ধের দয়াবলেই জন্ম মৃত্যুর সমুদ্র উত্তীর্ণ হইতে পারি। হোনেন স্পষ্টই বলেন, "কখনো মনে করিয়োনা আমরা স্বকর্ম্মের বলে নিজের আন্তরিক ক্ষমতা-তেই পুণ্যলোক প্রাপ্ত হইতে পারি, অসাধুও বুদ্ধের শক্তি-প্রভাবে পরমগতি লাভ করে।

এই যে কথা উঠিল বুদ্ধের প্রসাদ এবং শক্তিই আমা-দিগকে ত্রাণ করিতে পারে—এইখানেই মানবগুরুর অলৌকিক ক্ষমতা প্রথম স্বীকার করা হইয়াছে। অবশ্য মানবকে এখানে যে ভাবে কল্পনা করা হয় তাহাতে তাহার মানবত্বই থাকে না, সর্ব্বত্রই গুরুবাদের সেই বিশেষত্ব; গুরুর মধ্যে এমন শক্তির আরোপ করা হয় যাহা মানুষের শক্তি নহে।

সুফিধর্ম্মেও গুরুবাদের এইরূপ প্রবলতা দেখা যায়। অথচ বিশুদ্ধ মুসলমানধর্ম্ম এই প্রকার গুরুবাদের বিরুদ্ধ। আমার বিশ্বাস, এসিয়াখণ্ডে মানবগুরুকে দৈবশক্তি-সম্পন্ন ত্রাণকর্ত্তা বলিয়া পূজা করিবার যে প্রথা চলিয়াছে বৌদ্ধধর্ম্ম হইতেই তাহার উৎপত্তি। সুফিধর্ম্মের এই গুরু-বাদ পুনশ্চ আমাদের দেশেই বাউল ও কর্ত্তাভজা সম্প্র-দায়ের মধ্যে নূতন করিয়া ফিরিয়া আসিয়াছে। এমনি করিয়া বৌদ্ধধর্ম্ম হইতে জন্মলাভ করিয়া গুরুবাদ ও অবতারবাদ নব নব আকারে আবর্ত্তিত হইতেছে।

বৌদ্ধধর্ম্মেই মানবকে দেবতার স্থান প্রথম দেওয়া হইয়াছে। তাহার পর হইতে মানব সেই দেবসিংহাসনের অধিকার আর সহজে ছাড়িতে পারিতেছেনা। মানুষের মন একবার যখন এই অদ্ভুত কল্পনায় অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছে তখন এই পথে চিন্তা প্রবাহিত হওয়ার বাধা সে আর দেখিতেছে না।

নাম জপ করা এবং নামাবলী আবৃত্তিও আমরা মহাযান বৌদ্ধ সম্প্রদায়ে দেখিতে পাই। হোনেন বলিয়াছেন যে কেহ সর্ব্বান্তঃকরণে অমিতের নাম স্মরণ করিবে তাহাদের কেহই পুণ্য-জীবন লাভে বঞ্চিত হইবে না। যে কোনো প্রাণী বুদ্ধের নাম স্মরণ করে তাহাকে পরমাত্মীয় বলিয়া জ্ঞান করিতে হইবে ইহাও হোনেনের উপদেশ। বস্তুতঃ বুদ্ধই যখন বৌদ্ধের ভক্তির একমাত্র ও চরম লক্ষ্য তখন, তাঁহার অবর্ত্তমানে তাঁহার নামই তাহাদের প্রধান সম্বল হইয়াছিল। তিনি নাই কিন্তু তাঁহার নাম আছে। মানুষের অভাবে মানুষের এই নামকে আশ্রয় না করিয়া উপায় কি?

বৌদ্ধধর্ম্মে একদিন মুক্তির পথ অত্যন্ত দুর্গম ছিল— সংযম এবং ত্যাগের কঠোরতার সীমা ছিল না। এই বৌদ্ধধর্ম্ম করুণাকে আদর করিয়াছে কিন্তু ভক্তিকে অস্বীকার করিয়াছিল। সেই ভক্তি আসিয়া একদিন আপন অবমাননার প্রতিশোধ লইয়াছে। সাধনার সমস্ত কঠোরতা সে অপহরণ করিয়াছে। পাপের বোঝা লইয়াও মানুষ উদ্ধার পাইবে এই কথা প্রচার করিয়াছে, কেবল নাম স্মরণে ও উচ্চারণেই মুক্তি হইতে পারে এই আশ্বাস দিয়া মানুষের পুণ্যচেষ্টাকে শিথিল করিয়া দিয়াছে। অব-শেষে এই নামের মাহাত্ম্যে নির্ভর এতদূর পর্য্যন্ত বাড়িয়া উঠিয়াছে যে, অজ্ঞানে ভ্রমক্রমে নাম উচ্চারণ করিলেও মহাপাপী উদ্ধার পায় এমন বিশ্বাস ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে।

মানবপ্রকৃতির অন্তর্নিহিত কোনো সত্যকে অবজ্ঞা করিয়া কোনো ধর্ম্ম বাঁচে না। জ্ঞানকে হতমান করিলে সে তাহার শোধ লয়, ভক্তিকে অপমান করিলে সে তাহা ক্ষমা করে না। যেখানে অভাব আছে পূরণ করিতে করিতে, যেখানে ত্রুটি আছে সংশোধন করিতে করিতে ধর্ম্ম অগ্রসর হইয়া চলে। যদি না চলে তবে মানুষের উপায় নাই। এই জন্যই কোনো বড় ধর্ম্মকে কোনো এককালে এক অবস্থায় এক ভাবে আবদ্ধ করিয়া দেখিলে ঠিক দেখা হয় না। একদিকে হেলিলে অন্য দিকে হেলিয়া সে আপনার ভারসামঞ্জস্য উদ্ধার করে কিন্তু তাই বলিয়া সেই দিকেই সে হেলিয়া থাকিতে পারে না—মধ্যপথকে

আশ্রয় করিবার জন্যই তাহার চেষ্টা। একেবারেই না যদি করে তবে নৌকাডুবি।

বৌদ্ধধর্ম্ম যে কি তাহা নির্ণয় করিবার বেলায় তাহার সচলতার প্রতি লক্ষ্য করিতে হইবে। হীনযানও পূর্ণ বৌদ্ধধর্ম্ম নহে, মহাযানও পূর্ণ বৌদ্ধধর্ম্ম নহে। বৌদ্ধধর্ম্ম সংসারের অতীত কোনো পূজনীয় সত্তাকে স্বীকার যে করে না একথাকে আমরা বৌদ্ধধর্ম্মের নিত্য সত্য বলিয়া মানি না—এবং বৌদ্ধধর্ম্ম যে আত্মশক্তির সাধনাকে ভক্তির জলে ডুবাইয়া মারিয়াছে একথাও তাহার চিরসত্য নহে। বৌদ্ধধর্ম্ম এখনো মানুষের জ্ঞান ভক্তি কর্ম্মের মধ্যে আপনার অমর সত্তাকে বাধামুক্ত করিয়া তুলিবার জন্য সেই লক্ষ্য অভিমুখে চলিয়াছে সকল ধর্ম্মেরই গম্যস্থান যেখানে।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

গীতাপাঠ।*

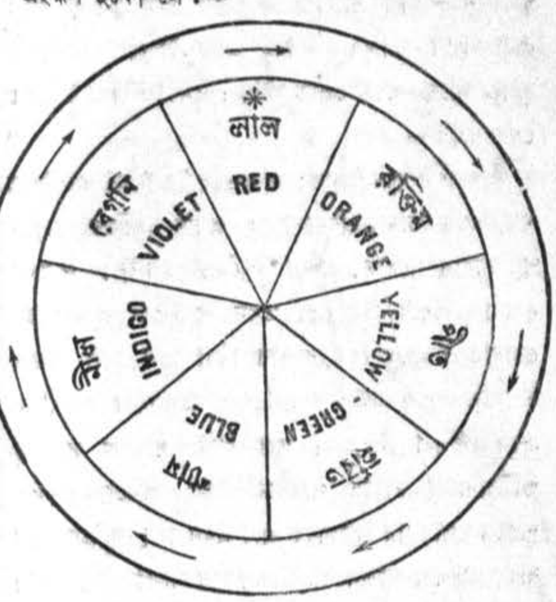
(আবহমান)

ত্রিগুণতত্ত্বের গোড়ার কথাটির অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইবার প্রথম উপক্রমে সত্ত্বগুণের দুইটি অবয়ব প্রধানতঃ আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল—(১) সত্তার প্রকাশ এবং (২) সত্তা'র রসাস্বাদন-জনিত আনন্দ। তাহার পরে সত্ত্বগুণের আর-একটি অবয়ব সহসা আমাদের দৃষ্টিক্ষেত্রে নিপতিত হইল—(৩) সত্তা'র আত্মসমর্থনী শক্তি, সংক্ষেপে—আত্মশক্তি। ঐ তিনটি সত্ত্বাঙ্গের পরস্পরের সহিত পরস্পরের কিরূপ সহযোগিতা-সম্বন্ধ—বিগত প্রবন্ধাংশে আমি তাহার ঈষৎ আভাস মাত্র প্রদর্শন করিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছিলাম;—বলিয়াছিলাম কেবল এইমাত্র যে,

আনন্দ সত্ত্বগুণের হৃদয়;
প্রকাশ সত্ত্বগুণের বামহস্ত;
আত্মশক্তি সত্ত্বগুণের দক্ষিণ হস্ত।

এই স্বল্প ইঙ্গিতটুকুর মধ্যে মনোনিবেশপূর্ব্বক তলাইয়া দেখিলে আমরা দেখিতে পাই যে, আত্মসত্তা'র প্রকাশ ঘটাইয়া তোলা একটা-শুধু মনোবৃত্তির অ্যাক্‌টার কার্য্য নহে;—চলন-কার্য্যের পক্ষে যেমন দুই পদের পরিচালনা সমান-আবশ্যক, সন্তরণ-কার্য্যের পক্ষে যেমন দুই হস্তের পরিচালনা সমান-আবশ্যক, আত্মসত্তার প্রকাশের পক্ষে তেমনি সাক্ষাৎ উপলব্ধি এবং স্মৃতি এই দুই বৃত্তির উভয়েরই পরিচালনা সমান আবশ্যক। আবার, চলন-কালে যেমন দুই পদ স্বভাবতই একযোগে কার্য্য করে, আত্মসত্তার প্রকাশকালে তেমনি সাক্ষাৎ উপলব্ধি এবং স্মৃতি উভয়ে মিলিয়া স্বভাবতই একযোগে কার্য্য করে। ভূতপূর্ব্ব বিষয়ের স্মরণ কিরূপে বর্ত্তমান বিষয়ের সাক্ষাৎ উপলব্ধির সঙ্গে মিশিয়া সাক্ষাৎ উপলব্ধি হইয়া দাঁড়ায়, তাহার গোটাদুই দৃষ্টান্ত দেখাইতেছি—প্রণিধান কর।

বিদ্যালয়ের অধ্যাপকেরা যখন সাত রঙ এক সঙ্গে মিশিয়া কিরূপে সাদা রঙ্ হইয়া দাঁড়ায়, তাহা ছাত্রবর্গের প্রত্যক্ষগোচরে আনিতে ইচ্ছা করেন, তখন তাঁহারা তাঁহাদের সেই অভিপ্রেত কার্য্যটি নিষ্পাদন করেন এইরূপ সুকৌশলে:—



অধ্যাপক চূড়ামণি একটি চক্রফলক'কে সাতরঙের সাতটি কেন্দ্রোত্থপুচ্ছাকৃতি খণ্ডে বিভক্ত করিয়া যন্ত্রযোগে দ্রুতবেগে ঘুরাইতে থাকেন, আর, তাহারই গুণে সাতরঙ এক সঙ্গে মিশিয়া ছাত্রবর্গের চক্ষের সম্মুখে সাদা রঙে পরিণত হয় (ক্ষেত্র দেখ)। তারা-চিহ্নিত চূড়াস্থানটিতে প্রথমে :ছিল ঘূর্ণায়মান চক্রটা'র বেগ্নি খণ্ড, তাহার পরে আসিল নীল খণ্ড, তাহার পরে শ্যাম খণ্ড, তাহার পরে হরিত খণ্ড, তাহার পরে পীত খণ্ড, তাহার পরে রক্তিম খণ্ড। এইরূপে ঐ তারা-চিহ্নিত চূড়াস্থানটিতে ছয় রঙের ছয় খণ্ড একে একে আসিয়া ওখান হইতে ঘুরিয়া গেল যেমি-মাত্র, তৎক্ষণাৎ অমি লাল-খণ্ডটি ঐ স্থান অধিকার করিল। তারা-চিহ্নিত চূড়াস্থানে লাল-খণ্ডটি যখন উপস্থিত, তখন দর্শক ঐ স্থানটিতে সাক্ষাৎ উপলব্ধি করিতেছে শুদ্ধ কেবল লালরঙ, তা ছাড়া আর কোনো রঙ নহে; কিন্তু, হইলে কি হয়—

[নীলমণি এবং শ্যামচাঁদ দুই নামই শ্রীকৃষ্ণের বর্ণ-পরিচায়ক; তা'ছাড়া কালিদাস একস্থানে আকাশের বিশেষণ দিয়াছেন অসি-শ্যাম অর্থাৎ তলোয়ারের মতো শ্যামবর্ণ। আকাশের বর্ণ ইংরাজি ভাষায় blue। আকাশের বর্ণকে শ্যাম বলাও যাইতে পারে, নীল বলাও যাইতে পারে, কিন্তু indigo'কে নীল ভিন্ন শ্যাম বলা যাইতে পারে না।]

* শান্তিনিকেতন ব্রহ্মবিদ্যালয়ের প্রবন্ধ-পাঠ সভায় পঠিত।

আর-ছয়টা রঙের সব-ক'টাই দর্শকের স্মরণের খিড়্‌কি দ্বার দিয়া সাক্ষাৎ উপলব্ধি-ক্ষেত্রে চুপি চুপি প্রবেশ করিয়া লালরঙের সঙ্গে জোড়া লাগিয়া গেল। লাল, তাই, এক্ষণে আর লাল নাই—লাল এক্ষণে সবার'ই সমক্ষে সাদা। চূড়াস্থানের এ যেমন দেখা গেল—সব স্থানেরই ঐ দশা; ঘূর্ণায়মান চক্রফলকটা'র ব্যাপ্তিস্থানের প্রত্যেক বিভাগেই সব-ক'টা রঙ স্মরণ এবং সাক্ষাৎ উপলব্ধির যোগে প্রতিমুহূর্ত্তে একসঙ্গে জড়ো হইয়া সাদা রঙে পরিণত হইতেছে। এরূপ স্থলে স্মরণ স্মরণ-মাত্র হইয়াই ক্ষান্ত থাকে না—স্মরণ সাক্ষাৎ উপলব্ধির পদে আরূঢ় হয়। এটা চাক্ষুষ দৃষ্টান্ত;—ইহারই জুড়ি ধাঁচার আর-একটি দৃষ্টান্ত আছে—সেটা শ্রৌত দৃষ্টান্ত; সেটাও দেখা উচিত। সেটা এই :—

তুমি যখন মুখে উচ্চারণ করিতেছে "শ্রী" এই একটিমাত্র শব্দ, তখন তোমার শ্রবণগোচরে প্রথমে উপস্থিত হইয়াছে শ্, তাহার পরে র্, শেষে উপস্থিত হইল ঈ। ঈ যখন তোমার শ্রবণে উপস্থিত, তখন শ্ এবং র্ উভয়েই তোমার স্মরণের খিড়্‌কি-দ্বার দিয়া চুপি চুপি সাক্ষাৎ উপলব্ধি-ক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া ঈ'র সঙ্গে দিব্য অবলীলা-ক্রমে মিশিয়া গিয়াছে; আর সেই গতিকে তুমি ঈ শুনিবামাত্রই তাহার পরিবর্ত্তে "শ্রী" শুনিতেছ। এই দৃষ্টান্তের পরিষ্কার আলোকে এটা এখন বেস্ বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, আত্মসত্তার উদ্দ্যোতনে সাক্ষাৎ উপলব্ধিরও যেমন, স্মরণেরও তেমনি, দুয়েরই কার্য্যকারিতা সমান। একটি বিষয় কিন্তু এখনো বুঝিতে বাকি আছে—সেটা হ'চ্চে এই যে, সাক্ষাৎ উপলব্ধির সঙ্গে স্মরণের সংযোগ ঘটে কিরূপে? এ প্রশ্নের সোজা উত্তর এই যে, সংযোগ ঘটে আত্মশক্তির বলে। আত্মসত্তার উদ্দ্যোতনের অর্থই হ'চ্চে আত্মসমর্থন—তাহা আত্মসমর্থনী শক্তিরই কার্য্য। যখন আমরা চলিতে আরম্ভ করি তখন স্বভাবতই আমাদের দুই পা একযোগে কার্য্য করে দেখিয়া আমাদের মনে হইতে পারে যে দুই পা'য়ের চলনের মধ্যে যোগ রক্ষা করিবার জন্য চলনকর্ত্তার কোনো-প্রকার শক্তি খাটাইবার প্রয়োজন হয় না। আমাদের মনে হয় বটে ঐরূপ; কিন্তু একটু ভাবিয়া দেখিলেই আমরা বুঝিতে পারি যে, বিনা শক্তিতে কোনো কার্য্যই সম্ভবে না। এমন কি, সমস্ত দিন আমরা যে, ঘাড় উঁচা করিয়া বসি দাঁড়াই এবং চলাফেরা করি, এই সহজ কার্য্যটিতেও আমাদের শক্তি খাটে কম না। তার সাক্ষী—একঘেয়ে পুরাতন কথার অজস্র ধারা শুনিতে শুনিতে সভার মাঝখানে যখন কোনো শ্রোতার নিদ্রাকর্ষণ হয়, তখন তাঁহার গ্রীবোন্নামনী শক্তির উদ্যম শিথিল হওয়া গতিকে তৎক্ষণাৎ তাঁহার ঘাড় ঢুলিয়া পড়ে। ইহাতেই অ্যাক-ইঙ্গিতে বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, সাক্ষাৎ উপলব্ধির সঙ্গে স্মরণ জোড়া দিয়া প্রকাশ ঘটাইয়া তোলা বিনা-শক্তিতে সম্ভাবনীয় নহে;—তাহা আত্মশক্তিরই কার্য্য তাহাতে আর ভুল নাই। তবে এটা সত্য যে, প্রথম উদ্যমে আত্মশক্তি দ্রষ্টা পুরুষের চক্ষে আপনাকে ধরা দ্যায় না। প্রথম উদ্যমে, সন্ধিসূত্র যেমন দ্রবীভূত শর্করারাশির মধ্যে ঢাকা থাকিয়া চারিদিক্ হইতে নিঃশব্দে পরমাণু সংগ্রহ করিয়া বিচিত্র স্ফাটিক ব্যূহ (মিছরি) নির্ম্মাণ করে, আত্মশক্তি তেমনি প্রকৃতি-গর্ভে লুকাইয়া থাকিয়া বর্ত্তমানমুখী সাক্ষাৎ উপলব্ধি এবং ভূতমুখী স্মৃতি এই দুই বিভিন্নমুখী মনোবৃত্তিকে এক সূত্রে বাঁধিয়া সেই জোড়া-মনোবৃত্তি'কে আত্মসত্তা'র উদ্দ্যোতন-কার্য্যে সমভাবে নিয়োজিত করে। প্রথম উদ্যমে, এইরূপ, আত্মশক্তি প্রকৃতি-গর্ভে তমসাচ্ছন্ন থাকিয়া ভস্মাচ্ছাদিত অনলের ন্যায় অলক্ষিতভাবে কার্য্য করে। দ্বিতীয় উদ্যমে, আত্মশক্তি আত্মসত্তা'র প্রকাশের সঙ্গে প্রকাশে অভ্যুত্থান করিয়া আত্মসত্তা'র নৈবেদ্যের ডালা হইতে রজস্তমোগুণের আবরণ সরাইয়া ফেলিয়া দ্রষ্টাপুরুষের আনন্দ-বর্দ্ধন করে।

আত্মশক্তির দুই উদ্যমের কথা এ যাহা আমি বলিতেছি—এ কথা আমি কোথা হইতে পাইলাম? বেদ হইতে—না কোরাণ হইতে—না বাইবেল্ হইতে? তাহা যদি জিজ্ঞাসা কর, তবে তাহার উত্তরে আমি বলি এই যে, আদিম শাস্ত্র বেদও নহে, কোরাণও নহে, বাইবেলও নহে।

আদিম শাস্ত্র আবার কোন শাস্ত্র?
তাহা জানো না?—
সে যে মহাশাস্ত্র!
তাহার নাম বিশ্বব্রহ্মাণ্ড।

এ শাস্ত্রের মূল গ্রন্থ দুই অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রথম অধ্যায়ে আত্মশক্তির প্রথম উদ্যমের পুরাণ-কাহিনী যথাবিহিত স্পষ্টাক্ষরে আনুপূর্ব্বিক লেখা রহিয়াছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে আত্মশক্তির দ্বিতীয় উদ্যমের অভিনব কাহিনী সেইরূপই স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হইয়া মানবমণ্ডলীর বংশ পরম্পরার মুদ্রাযন্ত্র হইতে খণ্ডে খণ্ডে বাহির হইয়া মান্ধাতার আমল হইতে নিরবচ্ছেদে চলিয়া আসিয়াছে এবং আরো যে কত যুগযুগান্তর চলিবে তাহা কে বলিতে পারে? এই দুই অধ্যায়ের ব্যাখ্যা কার্য্য আমাদের দেশের পুরাকালের তত্ত্বজ্ঞ আচার্য্যেরা সাধ্যমতে এক দফা করিয়া চুকিয়াছেন এখন আবার—পাশ্চাত্য পণ্ডিতরা সেই পুরাতন, অথচ নিত্য-নূতন, শাস্ত্রের ব্যাখ্যা-কার্য্যের অনুষ্ঠানে কোমর বাঁধিয়া উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন। জীবদিগের অজ্ঞাতসারে ভস্মাচ্ছাদিত অনলের ন্যায় তলে তলে কার্য্য করিয়া—জীবেরা যাহাতে যথাকালে মনুষ্যত্বের ব্রহ্ম ডাঙায় তমো গুণের মৃত্তিকার উপরে দুই পায়ের ভর দিয়া এবং সত্ত্বগুণের মুক্ত আকাশে মাথা উঁচা করিয়া গৌরবের

সহিত দাঁড়াইতে পারে তাহার প্রতি লক্ষ্য স্থির রাখিয়া, আত্মশক্তি কিরূপ সুকৌশলে রজোগুণের শানিত অস্ত্র দিয়া রজস্তমোগুণের বাধা অল্পে অল্পে অপসারণ করে—কাঁটা দিয়া কাঁটা উন্মোচন করে—আত্মশক্তির এই প্রথম উদ্যমের ব্যাপারটি প্রথম অধ্যায় আমাদিগকে শিক্ষা দ্যায়; আর মনুষ্যের জ্ঞানগোচরে আত্মশক্তি কিরূপে রজস্তমোগুণের বাধা অতিক্রম করিয়া তাহার অন্তঃকরণে সাত্ত্বিক প্রকাশ এবং আনন্দের দ্বার উদ্‌ঘাটন করিয়া দ্যায়—আত্মশক্তির এই দ্বিতীয় উদ্যমের ব্যাপারটি দ্বিতীয় অধ্যায় আমাদিগকে শিক্ষা দ্যায়। দুই অধ্যায় এক সঙ্গে মিলিয়া সমস্বরে এই একটি নিগূঢ় রহস্যের সন্ধান আমাদের নিকটে জ্ঞাপন করিতেছে যে, প্রথম উদ্যমে, জীবের আত্মশক্তি পরমাত্মার হস্তে বিধৃত থাকে; দ্বিতীয় উদ্যমে তাহা জীবাত্মার হস্তে বিধিমতে সমর্পিত হয়। এই কথাটির মর্ম্মের ভিতরে একটু মনোনিবেশ পূর্ব্বক তলাইয়া দেখিলে, গোড়ায় আমরা এই যে একটি প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছিলাম—"এক" যদি হয় সমস্তই, তবে "অনেক" আসিবেই বা কোথা হইতে, বসিতে স্থান পাইবেই বা কোথায়—এই দুরূহ প্রশ্নটির মীমাংসার পথ অনেকটা দূর পর্য্যন্ত পরিষ্কার হইয়া যাইবে। তাহাতেই এক্ষণে প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে।

একটুপূর্ব্বে আমরা দেখিয়াছি যে, আত্মসত্তার প্রকাশ-সংঘটনে সাক্ষাৎ উপলব্ধি এবং স্মরণ দুয়েরই কার্য্যকারিত সমান; এটাও দেখিয়াছি যে, স্মরণ সাক্ষাৎ উপলব্ধির সঙ্গে মিশিয়া সাক্ষাৎ উপলব্ধিরই সামিল হইয়া যায়, আর, তাহা যখন হয় তখন সাক্ষাৎ উপলব্ধি এবং স্মরণের মধ্যেই মূলেই কোনো প্রভেদ থাকে না। আমরা যখন সঙ্গীত শ্রবণ করি, তখন শ্রূয়মান গীতের নানা স্বরাঙ্গ এক-এক মুহূর্ত্তে এক-একটি করিয়া আমাদের কর্ণে উপস্থিত হয়, আর যে-সুরটি যে-মুহূর্ত্তে আমাদের কর্ণে উপস্থিত হয় সেই-সুরটিই কেবল আমরা সেই মুহূর্ত্তে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে উপলব্ধি করি। কিন্তু হইলে কি হয়—সাক্ষাৎ উপলব্ধির যে-একটি কনিষ্ঠা ভগ্নী আছে—যাহার নাম স্মৃতি—সাক্ষাৎ উপলব্ধির সেই সহবৃত্তিটি ভূতকাল হইতে নানা সুর যোটপাট করিয়া আনিয়া সমস্ত দলবল সমভিব্যাহারে সাক্ষাৎ উপলব্ধির কণ্ঠ আলিঙ্গন করিয়া তাহার সঙ্গে মিশিয়া একীভূত হইয়া যায়, আর, সেই গতিকে, প্রতি মুহূর্ত্তে আমরা গানই শ্রবণ করি, তা বই কোনো মুহূর্ত্তে আমরা যূথভ্রষ্ট একটি মাত্র সুর শ্রবণ করি না। সঙ্গীত শ্রবণের ব্যাপারটি আদ্যোপান্ত পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে আমরা দেখিতে পাই এই :—

গায়ক চূড়ামণি আত্মশক্তির প্রভাবে শ্রোতার সাক্ষাৎ উপলব্ধি এবং স্মরণের উপরে একযোগে কার্য্য করিয়া শ্রোতার জ্ঞানগোচরে বিশেষ কোনো একটি রাগের বা রাগিনীর রূপ প্রকাশ করেন, আর, সেই প্রকাশের মধ্য দিয়াই শ্রোতা গীয়মান স্বরলহরীর মাধুর্য্য রস আস্বাদন করিয়া আনন্দ লাভ করেন। প্রথম উদ্যমে শ্রোতা অজ্ঞাতসারে আত্মশক্তি খাটাইয়া স্মরণ এবং সাক্ষাৎ উপলব্ধির যোগে গায়কের কণ্ঠনিঃসৃত গানটি মুগ্ধভাবে শ্রবণ করেন; দ্বিতীয় উদ্যমে, সজ্ঞানভাবে অর্থাৎ বুদ্ধিপূর্ব্বক আত্মশক্তি খাটাইয়া সেই গানটি সাধ্যানুসারে পুনরাবৃত্তি করেন। পুনরাবৃত্তি করেন কেন? না যেহেতু সে গানটি তাঁহার বড্ড ভাল লাগিয়াছে—গানের রসাস্বাদন-জনিত আনন্দই পুনরাবৃত্তি কার্য্যটির প্রবর্ত্তক এবং নিয়ামক। আনন্দকে পুনরাবৃত্তি কার্য্যের নিয়ামক বলিতেছি এই জন্য—যেহেতু পুনরাবৃত্তি কার্য্যের কোনোস্থান যদি খাপছাড়া হয়, তবে সাধকের তৎক্ষণাৎ আনন্দের ব্যাঘাত হয়, আর তাহাতেই সাধক বুঝিতে পারেন যে, "এ জায়গাটা ঠিক্ হইতেছে না"। সাধক যখন বুঝিতে পারেন যে, তাঁহার পুনরাবৃত্তি-কার্য্যটি ঠিক্-মাফিক হইতেছে না, তখন তিনি গায়কের নিকটে গমন করিয়া সাধের গানটি পুনঃ পুনঃ শ্রবণ মনন এবং নিদিধ্যাসন করেন; এইরূপ করিতে করিতে ক্রমে যখন তাঁহার অন্তরের আনন্দের সহিত পুনরাবৃত্তি-কার্য্যটির সুর মিলিয়া যায়, তখন তিনি আপনাকে কৃতকৃতার্থ মনে করেন। বলিলাম "শ্রবণ মনন এবং নিদিধ্যাসন";—এরূপ বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, প্রকাশ-সংঘটনের পক্ষে সাক্ষাৎ উপলব্ধি এবং স্মরণ দুইই যেহেতু সমান আবশ্যক, এই জন্য সঙ্গীত-শিক্ষার পক্ষে শ্রবণ এবং মনন দুইই সমান আবশ্যক; আবার, আত্মশক্তি খাটাইয়া সাক্ষাৎ উপলব্ধি'র সহিত স্মরণের যোগ-বন্ধন করা যেহেতু প্রকাশ-সংঘটনের পক্ষে আবশ্যক—এই জন্য নিদিধ্যাসন দ্বারা শ্রবণ এবং মননকে একসূত্রে বাঁধিয়া একীভূত করা সঙ্গীত শিক্ষার পক্ষে আবশ্যক। গানের সম্বন্ধে এতগুলা কথা এ যাহা বলিলাম—এ সমস্তই কেবল একটা উপলক্ষ মাত্র তাহা বুঝিতেই পারা যাইতেছে। প্রকৃত কথা যাহা বক্তব্য তাহা এই :—

এটা আমরা এখন বেস্ বুঝিতে পারিয়াছি যে, আত্মশক্তির কার্য্যকারিতায় সাক্ষাৎ উপলব্ধি এবং স্মরণ একসঙ্গে মিশিয়া একীভূত হইলে তবেই দ্রষ্টা পুরুষের অন্তঃকরণের বর্ত্তমান ক্ষেত্রে চিৎপ্রকাশের অভ্যুদয় হয়। এই সঙ্গে এটাও কিন্তু বোঝা উচিত যে, সাক্ষাৎ উপলব্ধিই মূল—স্মরণ তাহার একপ্রকার লেজুড়। রূপকচ্ছলে বলা যাইতে পারে যে, সাক্ষাৎ উপলব্ধি ধ্বনি—স্মরণ প্রতিধ্বনি। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, দ্রষ্টা পুরুষের

অন্তঃকরণে আদিম সাক্ষাৎ উপলব্ধি কোথা হইতে আইসে? এটা যখন স্থির যে, তাহা দ্রষ্টাপুরুষের নিজের শক্তি হইতে আসে না, তখন তাহাতেই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, পরমাত্মার ঐশী :শক্তিই তাহার একমাত্র প্রেরয়িতা। যদি সূর্য্য হইতে আলোক না আসিত তবে জীব-চক্ষু চক্ষুই হইত না ইহা বলা বাহুল্য। কালিদাস যদি বলেন যে, "আমি শুদ্ধ কেবল আত্মশক্তির বলে ঋতুসংহার রচনা করিয়াছি" তবে মোটামুটি-ভাবে তাঁহার মুখে সে কথা শোভা পাইতে পারে—ইহা খুবই সত্য; কিন্তু তাঁহার ঐ কথাটির ভিতরে একটু মনোনিবেশ পূর্ব্বক তলাইয়া দেখিলে দর্শকের চক্ষে উহার অপ্রামাণিকতা ঢাকা থাকিতে পারে না। এ তো দেখিতেই পাওয়া যাইতেছে যে, নানা ঋতুর নানা সৌন্দর্য্য যাহা তিনি পূর্ব্বে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে উপলব্ধি করিয়াছিলেন তাহা তাঁহার স্মরণে মুদ্রিত হইয়া গিয়াছিল; তাহার পরে তিনি আত্মশক্তির বলে সেই স্মরণায়ত্ত ব্যাপারগুলির মধ্যে যথাভিরুচি যোগাযোগ ঘটাইয়া ঋতুসংহার গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। কালিদাসের কবিতার গোড়ার সেই সাক্ষাৎ উপলব্ধির ব্যাপারটি যদি গণনার মধ্য হইতে সরাইয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে তাঁহার এ কথা খুবই ঠিক্ যে, তিনি আত্মশক্তির বলে ঋতুসংহার রচনা করিয়াছেন। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাঁহার ও-কথাটি সত্য হইতে পারে না এই জন্য—যেহেতু, গোড়া'র সেই সাক্ষাৎ উপলব্ধির উপরে তাঁহার নিজের হস্ত যৎকিঞ্চিৎ যাহা ছিল তাহা না থাকারই মধ্যে। "তাঁহার নিজের হস্ত মূলেই ছিল না" না বলিয়া—বলিলাম "তাঁহার নিজের হস্ত যৎকিঞ্চিৎ যাহা ছিল তাহা না থাকারই মধ্যে" এরূপ বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, বর্ত্তমান দৃষ্টান্তস্থলে যাহাকে বলা হইতেছে গোড়া'র সাক্ষাৎ উপলব্ধি তাহা অপেক্ষাকৃত গোড়া'র সাক্ষাৎ উপলব্ধি হইলেও তাহা আদিম সাক্ষাৎ উপলব্ধি নহে—অর্থাৎ সর্ব্বপ্রথমের সাক্ষাৎ উপলব্ধি নহে। আদিম সাক্ষাৎ উপলব্ধির সংঘটনকর্ত্তা স্বয়ং পরমাত্মা ভিন্ন আর কেহই হইতে পারে না এইজন্য—যেহেতু সাক্ষাৎ উপলব্ধি স্মরণের গোড়া'র প্রতিষ্ঠাভূমি, সুতরাং তাহার সংঘটনে স্মরণের কোনো প্রকার কার্য্যকারিতা থাকিতে পারে না। একটি সদ্যোজাত শিশুর সাক্ষাৎ উপলব্ধি-ক্ষেত্রে দিবালোক কিছুকাল ধরিয়া কার্য্য করিলে, তবে তাহা তাহার স্মরণে মুদ্রিত হয়; স্মরণে মুদ্রিত হইলে, আত্মশক্তি তলে তলে কার্য্য করিয়া স্মরণ এবং সাক্ষাৎ উপলব্ধির যোগে শিশুর জ্ঞানগোচরে দৃশ্যবস্তুসকলের নৈবেদ্যের ডালা অনাবৃত করে। সদ্যোজাত শিশুর স্মরণে দিবালোক রীতিমত মুদ্রিত হওয়া যেহেতু সময়-সাপেক্ষ, এইজন্য সদ্যোজাত শিশু প্রথমে যখন আলোক সাক্ষাৎ সম্বন্ধে উপলব্ধি করে, তখন তাহার সহিত স্মরণ মিশ্রিত থাকেনা বলিয়া তাহা তাহার জ্ঞানের আয়ত্তের মধ্যে আসে না; আর, তাহা যখন তাহার জ্ঞানের আয়ত্তাধীন নহে, তখন তাহাতেই প্রতিপন্ন হইতেছে যে গোড়া'র সেই সাক্ষাৎ উপলব্ধির সংঘটনে তাহার নিজের কোনো হস্ত ছিল না। অতএব এটা স্থির যে আদিম সাক্ষাৎ উপলব্ধি পরমাত্মার ঐশীশক্তির বলেই মনুষ্যের অন্তঃকরণে জাগিয়া ওঠে। মনে কর একজন সঙ্গীতের ওস্তাদ সঙ্গীতরসে এমনি মাতোয়ারা যে, লোকে তাহার নাম দিয়াছে গীতানন্দ সরস্বতী; এখন দ্রষ্টব্য এই যে, গীতানন্দ স্বামী যেমন আপনার গীতানন্দ শ্রোতৃবর্গের অন্তঃকরণে জাগাইয়া তুলিবার জন্য তাঁহাদের কর্ণে গীতসুধা বর্ষণ করেন—আনন্দস্বরূপ পরমাত্মা তেমনি আপনার আনন্দ জীবাত্মার অন্তঃকরণে জাগাইয়া তুলিবার জন্য সাত্ত্বিক প্রকাশ প্রেরণ করেন। উপনিষদে তাই উক্ত হইয়াছে "রসো বৈ সঃ" রস তিনি নিশ্চয়ই "রসং হ্যেবায়ং লব্ধানন্দী ভবতি" রস'কেই লাভ করিয়া জীব আনন্দিত হয়। "এষহ্যেবানন্দয়াতি" : পরমাত্মাই আনন্দ জাগাইয়া তোলেন। এ কথা গুলি কবির কল্পনামাত্র নহে—উহা ধ্রুব সত্য। সত্ত্বগুণপ্রধান জীবের অন্তঃকরণে (অর্থাৎ মনুষ্যের অন্তঃকরণে) ঐশীশক্তির বলে সাত্ত্বিক প্রকাশ যাহা উদ্বোধিত হয়, তাহা বাস্তবিকই আনন্দের মূল উৎস। তার সাক্ষী—কি মনুষ্য কি পশ্বাদি জন্তু সকল জীবেরই ক্ষুধা-তৃষ্ণার সময় অন্নপানে আনন্দ হয়, কিন্তু জীব-রাজ্যে অ্যাকা কেবল মনুষ্যেরই সাত্ত্বিক প্রকাশে বা জ্ঞানে আনন্দ হয়। কচি বালক কেমন অবলীলাক্রমে মাতৃভাষা শিখিয়া ফ্যালে ইহা সকলেরই দ্যাখা কথা। দুই এক বৎসরের বালক মাতৃমুখোচ্চারিত কথা শুধু কেবল কানে শুনিয়াই ক্ষান্ত থাকে না—পরন্তু তাহার ভাবের ভিতরে প্রবেশ করিতে চেষ্টা করে। ক্ষুধাকালে মাতার স্তন্য দুগ্ধ পান করিয়া সে যেমন আনন্দ লাভ করে—মাতৃবাক্যের ভাবসুধা পান করিয়া সে সেইরূপই বা ততোধিক আনন্দ লাভ করে। পরমাত্মার ঐশীশক্তি হইতে যেমন সূর্য্যালোক আসিয়া নির্জীব জগৎকে সজীব করিয়া তোলে—অন্ধ জগৎকে চক্ষুষ্মান্ করিয়া তোলে—অচেতন জগৎকে সচেতন করিয়া তোলে, তেমনি, সেই সঙ্গে সাত্ত্বিক প্রকাশ (অর্থাৎ গোড়া'র সাক্ষাৎ উপলব্ধি) অবতীর্ণ হইয়া আবালবৃদ্ধ মনুষ্যের অন্তঃকরণে বিমল আনন্দের দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া দ্যায়। ঈশ্বর-প্রেরিত সত্ত্বগুণ শুধু যে কেবল জ্ঞান এবং আনন্দের গোড়া'র সূত্র তাহা নহে—তাহা ধর্ম্মেরও গোড়ার সূত্র। কচি বালকেরা তাহাদের মাতাপিতা ভ্রাতাভগ্নী এবং পার্শ্ববর্ত্তী আর আর লোকের মনের মধ্যে প্রবেশ করিয়া

আপনার সত্তার নবোদিত প্রকাশের সঙ্গে সুর মিলাইয়া তাঁহাদের সবাইকার সত্তার রসাস্বাদন করে, আর তাহাতেই তাহাদের আনন্দ হয়; তার সাক্ষী তাহারা ধাত্রীর বা মাতাপিতার বা ভ্রাতাভগ্নীর আদর-বাণী শুনিলে কেমন সুমধুর হাস্য করে তাহা কাহারো অবিদিত নাই। তাঁহাদের অকৃত্রিম সরল হৃদয়ের নিকটে সকলেই আত্ম-তুল্য—অথচ তাহারা গীতাশাস্ত্রের বা বাইবেলের এক ছত্রও পাঠ করে নাই। এইরূপ সমদর্শিতা এবং সমব্যথিতাই ধর্ম্মের গোড়া'র কথা। এখন দেখিতে হইবে এই যে, গীতানন্দ সরস্বতীর কণ্ঠ-নিঃসৃত গান যেমন নিখুঁত, শিক্ষার্থী সাধকের কণ্ঠ-নিঃসৃত গান সেরূপ নিখুঁত হওয়া দূরে থাকুক্, তাহা নানা প্রকার বাধায় জড়িত। শিক্ষার্থী সাধককে কিছুদিন ধরিয়া গান সাধিতে হইবে—তাল মান সুর ঠিক মতে হৃদয়ঙ্গম করিয় তাহা কণ্ঠ দিয়া বাহির করিতে হইবে—এইরূপ আর আর নানাবিধ কার্য্য হাতে-কলমে করিতে হইবে যাহা সহজে হইবার নহে। শিক্ষার্থী ব্যক্তি সঙ্গীতবিদ্যার তীর্থ-যাত্রী;—কাজেই, গন্তব্য পথের বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া তাঁহাকে গম্যস্থানে উপনীত হইতে হইবে।

পূর্ব্বে আমরা দেখিয়াছি যে, পরমাত্মা সমষ্টি সৎ সুতরাং তাঁহার সত্তা সত্ত্বগুণের নিদান, আর তাঁহার শক্তিরূপী সেই আদিম এবং সনাতন সত্ত্বগুণ রজ-স্তমোগুণের বাধায় জড়িত নহে বলিয়া আমাদের দেশের প্রাচীন তত্ত্বজ্ঞানশাস্ত্রে তাহা শুদ্ধ সত্ত্ব বলিয়া উক্ত হইয়াছে। পক্ষান্তরে ব্যষ্টিসত্তা মাত্রই ত্রিগুণাত্মক; অথবা যাহা একই কথা—ব্যষ্টিসত্তার অন্তর্নিগূঢ় সত্ত্বগুণ রজস্তমোগুণের বাধায় জড়িত। এই জন্য প্রথম উদ্যমে সাধক সহজভাবে আত্মশক্তি খাটাইয়া পরমাত্মার হস্ত হইতে যাহা প্রাপ্ত হইয়া আনন্দিত হন, দ্বিতীয় উদ্যমে পরমাত্মার প্রসাদ-লব্ধ সেই সত্ত্বগুণের আশপাশের বাধা আত্মপ্রভাবের বলে অতিক্রম করিয়া তাহার আগমনের পথ পরিষ্কার করা তাঁহার পক্ষে আবশ্যক হয়। এখন দ্রষ্টব্য এই যে, আত্মশক্তির প্রথম উদ্যমের ফল সেই যে অযাচিত সাত্ত্বিক আনন্দ যাহা পরমাত্মার প্রসাদে শিশুর অন্তঃকরণেও যেমন আর সরল হৃদয় সাধু-যুবার অন্তঃকরণেও তেমনি, টাট্‌কা-টাট্‌কি আকাশ হইতে নিপতিত হয়, তাহাই সাধকের আত্মশক্তির দ্বিতীয় উদ্যমের নিয়ামক। পরমাত্মার প্রসাদ-লব্ধ গোড়া'র সেই সাত্ত্বিক আনন্দই সাধককে মঙ্গলের পথ প্রদর্শন করে। সে আনন্দ বিষয়সুখের ন্যায় মোহাচ্ছন্ন আনন্দ নহে—পরন্তু তাহা জ্ঞানগর্ভ সুবিমল আনন্দ; আর, সেইজন্য উপনিষদে তাহা প্রজ্ঞানঘন বলিয়া উক্ত হইয়াছে;—উক্ত হইয়াছে

"প্রজ্ঞানঘন এবানন্দময়ো আনন্দভুক্ চেতোমুখঃ"

আনন্দময় কোশস্থ জীব প্রজ্ঞানঘন আনন্দভুক্ চেতোমুখ।

এই সাত্ত্বিক আনন্দের সঙ্গে যাহার সুর মেলে তাহাই মঙ্গল কার্য্য, আর, তাহার সঙ্গে যাহার সুর মেলে না তাহাই অমঙ্গল কার্য্য! দেবপ্রসাদলব্ধ সাত্ত্বিক আনন্দই সাধকের আত্মপ্রসাদের মূল উৎস, আর, তাহারই আর এক নাম অন্তরাত্মা। পাশ্চাত্য শাস্ত্রেও বলে conscience is the voice of god অন্তরাত্মার বাণী ঈশ্বরেরই বাণী। এ বিষয়টি আর একটু বিশদরূপে বিবৃত করিয়া বলা আবশ্যক। আগামী বারে তাহার চেষ্টা দেখা যাইবে।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

কবীর।*

(সমালোচনা)

প্রাচ্যদেশীয়দিগের সম্বন্ধে ইউরোপের ধারণা এই যে, প্রাচ্যদেশীয়গণ বাস্তব পৃথিবীটাকে মায়া বলিয়া উড়াইয়া দিবার জন্য কল্পনাকে আর সত্যাশ্রয়ী করিতে পারে নাই, তাহাকে একেবারে পক্ষিরাজ ঘোড়ার মত অনির্দ্দেশ্যতার স্বপ্নরাজ্যে ছুটাইয়া দিয়াছে। প্রাচ্যদেশীয় সকল সাহিত্যই আলাদীনের প্রদীপের মত অসম্ভব পুরীর সন্ধান-নিরত, তাহাতে কেবল রূপ আর রূপকের ছড়াছড়ি। রূপগুলা অবাস্তব বলিয়াই তাহারা সহজেই আধ্যাত্মিক রূপক হইয়া উঠিতে পারে।

তা সত্য। আমরা মিস্‌টিক্যাল্‌ইষ্ট। আমাদের দেশে কারখানার কলের ধোঁয়ায় আকাশ কালো হইয়া উঠে না, অষ্টপ্রহর কাজ অন্তহীন প্রবাহে শকটশ্বসিত ধূলি-পটলে আকাশব্যাপী দৃষ্টিকে মোহাকুল করিয়া দেয় না। আমরা বাস্তবপরায়ণ নহি। আমরা নিরাবরণ চোখে জগৎটাকে এক রকম করিয়া দেখিয়া থাকি। কিন্তু এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে যে তোমরা যেটাকে দেখ সেটা আবরণের মধ্য দিয়াই দেখ। সৌন্দর্য্যই বল, প্রেমই বল, মঙ্গলই বল, সমস্তই তোমাদের ঐ কর্ম্মপাকের জটিল-তার ভিতরে জড়াইয়া আছে। সেই জটগুলাকে তোমরা মনের চারিদিকে ঘন করিয়া লইয়া তার পর পৃথিবীটাকে দেখ। সমস্ত জিনিসের উপরেই তাই তোমাদিগকে ভাবের রং ফেলিতে হয়, এমন একটু বিশেষত্ব ও মহিমা অর্পণ করিতে হয় যাহা সে জিনিসে স্বভাবতই নাই। তোমরা আইডিয়ালাইজ্ করিয়া থাক, বাস্তবের উপরে কেবলি ভাবের রং চড়াও; আমরা জানি সমস্তই মায়া

* শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন কর্ত্তৃক অনুবাদিত কবীরের গ্রন্থাবলী

ছায়া, সুতরাং আমরা যাহা দেখি তাহা একেবারে অনাবৃতভাবে এবং অব্যবহিতভাবে। তাহা একই কালে রূপ এবং অপরূপ উভয়ই!

ইউরোপে কবিতার মধ্যে বাস্তবকে কল্পনার দ্বারা রঞ্জিত করিয়া সুন্দর করিয়া দেখিবার একটা প্রয়াস আছে। আকাশের নীলিমাকে সুন্দর বলিয়া উপভোগ করিতে গেলে ইউরোপীয় কবিকে তাহার সঙ্গে হৃদয়ের রংকে প্রচুর পরিমাণে মিশাইয়া দিতে হয়, বলিতে হয়—

"Come then complete in completion, o comer
Pant through this blueness, perfect the summer!"

এস, এস ওগো চির-অপূর্ণতা চির পূর্ণতায় এস হে পথিক
এই নীলিমার মাঝে তোমার নিশ্বাস বসন্তেরে পূর্ণ ক'রে দিক্!

প্রাচ্য কবির এ রকমই নয়। তার সাক্ষী হাফিজের এই ছত্রটি:—"হে সাকি, দাও আমার করতলে মদের পেয়ালা দাও, আমি যেন উপরকার এই নীলবাস ছিঁড়িয়া ফেলিতে পারি!" কি প্রভেদ! একজনের দৃষ্টি আবরণের ভিতর হইতে, অন্যের দৃষ্টি আবরণকে ঠেলিয়া ফেলিয়া! আমরা আধুনিক কালে পশ্চিম দেশে মেটারলিঙ্ক, ওয়াল্ট হুইট্ম্যান্ প্রভৃতি এমন কবির কাব্য পাঠ করিয়াছি যাঁহারা কোন আবরণকে মানেন না, সমস্ত জিনিসের উপর হইতে বহু-যুগসঞ্চিত সংস্কারের আবর্জ্জনারাশি ঝেঁটাইয়া যাঁহারা তাহার বিশুদ্ধ নগ্নমূর্ত্তি দেখিবার জন্য ব্যাকুল। তাঁহারা বলেন, সকলের অন্তরস্থিত আত্মার পক্ষে কোন বাহিরের সংস্কারের প্রয়োজনমাত্র নাই, কারণ সংস্কার তাহার পূর্ণ প্রকাশকেই অবরুদ্ধ ও আচ্ছন্ন করিয়া রাখে। একবার সব সরাইয়া পর্দ্দা তুলিয়া যদি ভিতরের খবর লওয়া যায়, তবে সে কি অভূতপূর্ব্ব কি অনির্ব্বচনীয় রূপ সর্ব্বত্র উদ্ঘাটিত হইয়া যাইবে! কিন্তু পাশ্চাত্য কোন কবি হাফিজের মত এমনতর সাহসের কথা বলেন নাই "অবগুণ্ঠনের নীচের রহস্যের কথা মাতাল বদমায়েসদের কাছে জিজ্ঞাসা কর—এ রহস্য সম্ভ্রান্ত সভ্যলোকেরা জানে না। * * " তা তো বটেই। সম্ভ্রান্ত সভ্য মানেই সংস্কারাশ্রয়ী ভদ্রলোক। "অন্ধকার রাত্রি, তরঙ্গের ভয়, ভয়ঙ্কর ঘূর্ণা—যাহারা তীরে আছে, সেই ভারহীন যাত্রীরা আমাদের অবস্থা কিরূপে জানিবে?" যে অনেক উত্থান-পতনের ভিতর দিয়া অনেক চুবানি খাইয়া অনেকবা-ভাঙিয়া অনেকবার নূতন করিয়া গড়িয়া কিছু না পাইয়াছে, সে ছাড়া সত্যকে আর কে জানিবে? এমনতর নিরাবরণ মুক্তি, ইহা হাফিজের কাব্যে যেমন দেখিয়াছি এমন অন্যত্র দেখি নাই। ইউরোপীয় কবির নিরাবরণতা অনেক সময় বীভৎস নির্লজ্জতা, সে সংস্কারবন্ধহীন মুক্তদৃষ্টি নন। মেটারলিঙ্ক, হুইট্ম্যানে সে নির্লজ্জতার পরিচয় যে নাই তাহা বলিতে পারি না। মায়াকে মায়া জানে বলিয়াই আবরণকে ছিঁড়িয়া ফেলা প্রাচ্যজাতীয়ের পক্ষে এত সহজ, নহিলে যতই ইচ্ছা করুক, সত্যকে আর জানা যাইত না, মায়াই নূতন নূতন রূপ পরিগ্রহ করিয়া দেখা দিত ও মন ভুলাইত।

কিন্তু হাফিজ প্রভৃতির কবিতায় যাহা আমরা দেখিয়াছিলাম, তাহা আমরা পারস্য দেশেরই একটা বিশেষ সম্পদ বলিয়া গণ্য করিয়াছিলাম। তাহার কারণ, আমাদের দেশে ঠিক এই ধরনের কবিতা আমরা পাই না। বিগ্রহের সাহায্যে ধ্যান ধারণা করিবার নিমিত্ত আমাদের দেশে বিগ্রহ দেখি সত্যের স্থান জুড়িয়া বসে। তাহার ভিতরে এমন কোন আভাস বা ইঙ্গিত থাকে না, যাহাতে বুঝাইয়া দেয় যে সে উপলক্ষ্য মাত্র, লক্ষ্য নয়। আমি কোন পূজা-পদ্ধতির কথা বলিতেছি না, কিন্তু সাহিত্যেই দেখি ভাবের চেয়ে ভাবের নির্দ্দেশ বাংলা দেশে বড় হইয়াছে। ভাবের স্বাধীনতা নাই, ভাবের শুভ্র কিরণকে আবৃত করিয়া বিগ্রহের কুহেলি দিঙমণ্ডল আচ্ছন্ন করিয়া আছে। যেমন ধর বৈষ্ণব কবিতা। ইহা অনায়াসেই হাফিজ্ প্রভৃতির কবিতার সঙ্গে তুলনীয় হইতে পারিত, কিন্তু ইহা বিগ্রহের রূপেই আপাদমস্তক এমনি বাঁধা, যে রূপের মধ্যে অপরূপকে আর দেখাই যায় না। সেই বৃন্দাবন, অভিসার, ইত্যাদি ব্যাপার—যাহা একটা কাহিনী মাত্র—তাহা চিত্তের উপর ভারের মত চাপিয়া থাকে। রূপক যদি একান্তই রূপ হয়, তবে রস তাহাতে বাধা পায়। রূপটা কিছুই নয়, সে অপরূপকেই প্রকাশ করিবার একটা ছলমাত্র, উপকরণ মাত্র—রূপকজাতীয় কবিতার মধ্যে এই ভাবটা থাকা চাই। কিন্তু বাংলা বৈষ্ণব কবিতায় সেই ভাবটারই অত্যন্ত অভাব।

পশ্চিমদেশীয় সাধক কবীর, দাদূ প্রভৃতির কবিতাবলীর সহিত আমরা পরিচিত ছিলাম না। আমরা নিরাশ হইয়া ভাবিতেছিলাম, যে পারস্য সাহিত্য এক হিসাবে আমাদের চেয়ে জিতিয়া আছে, এমন কি আধুনিক ইউরোপীয় সাহিত্যও বা। ভারতবর্ষ যে এতবড় অদ্বৈতকে চাহিল, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে তাহার বিগ্রহ বলিয়া ধ্যান করিল, যুগে যুগে মানব ইতিহাসের ঘটনালীলার মধ্যে শ্রীভগবানের অবতীর্ণ হইবার লীলা দেখিল, হায়, হায়, ভারতবর্ষের সাহিত্যে সে বার্ত্তার কোথাও কোন চেহারা ফুটিল না! কোথায় সেই একের বাণী, অনন্তের বাণী, মুক্তির বাণী! সকল রূপ, সকল রস, সকল অনুভূতি, সকল বোধের খণ্ডতার মধ্যে অনন্তের নিবিড় আনন্দের জোয়ারের প্লাবনের জয়ধ্বনি কোথাও কি বাজিল না! ইউরোপীয় চেতনায় এ জিনিস নাই। সেখানকার সাহিত্যেও তাই ইহা খোঁজা বিড়ম্বনা মাত্র।

কিন্তু ভারতবর্ষের সাধনাই যে এই দিকে! সে তো অনন্তকে ভাবমাত্র বলিয়া অগম্য বলিয়া দূরে রাখে না, সে তাহাকে সকল সত্যের সত্য জানিয়া ব্যবহার করে। সকল মানব-সম্বন্ধের মধ্যে ক্ষণে ক্ষণে তাহার আবির্ভাব, পথে আবির্ভাব, ঘাটে আবির্ভাব,—বাঁশী যে কোথায় বাজে না তাহাতো জানি না। অনন্তের মধ্যে সমস্তকে পরিপূর্ণ রূপান্তরিত ও আনন্দঘন করিবার সাধনাই ভারতের চিরদিনের সাধনা!

শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন বাবুর কৃপায় আমরা এমন সাহিত্যের সঙ্গে পরিচয় লাভ করিলাম যাহা এই ভারতবর্ষের নিত্যসাধনারই ভিতর হইতে জন্মলাভ করিয়াছে। যাহা তত্ত্বে জানিতাম, তাহাকে রসের মধ্য দিয়া পাইলাম। তত্ত্বে জানিয়া কি তৃপ্তি আছে! সে কি রকম জানা। সে ফলের শাঁস বাদ দিয়া তাহার বীজকে জানা। আমরা চাই বীজকে ফলের ভিতর দিয়া পাইব। তত্ত্বকে বেদান্তে জানিব, যোগশাস্ত্রে জানিব কিন্তু জীবনের রসে আপন বলিয়া মধুর বলিয়া সত্য বলিয়া পাইব না, এ যে অসহ্য! তেমন করিয়া তত্ত্ব কোথাও ধরা দেন্ নাই বলিয়াই সমস্ত বিশ্ব ভারতবর্ষকে মায়াবাদী ও বিশ্ববিমুখ সন্ন্যাসী বলিয়া দূর হইতে গড় করিয়াছে! তাহারা ভারতবর্ষকে শ্মশানচারী ভস্মবিভূতিমাথা তালবেতালপরিবৃত শিবের মতই দেখিয়াছে, মনে করিয়াছে যে বৈরাগ্যই দুঃখ তাহার প্রাণ, ঐশ্বর্য্য কোথাও নাই, সৌন্দর্য্য নাই, বেদনা নাই, যৌবন নাই,—কিন্তু বিশ্বসুন্দরী লোকহৃদয়মোহিনী অনন্তযৌবনা গৌরীকে তাহারা দেখে নাই,—ভারতবর্ষের সাধনায় বৈরাগ্যের সঙ্গে সঙ্গে কি ঐশ্বর্য্য যে অভেদাঙ্গ হইয়া আছে তাহার পরিচয় এম্‌নি করিয়াই চাপা রহিল! কবি কালিদাস তাহার আভাস দিয়াছেন, কিন্তু গীতে উৎসারিত হইয়া নানা কণ্ঠ হইতে এ বার্ত্তা না বাহির হইলে ইহার সত্যতা কে বুঝিবে?

> ছক্যা অবধূত মস্তান মাতা রহৈ
> জ্ঞান বৈরাগ্য হুধি লিয়া পুরা।
> শ্বাস উশ্বাসকা প্রেম প্যালা পিয়া
> গগন গরজৈ তহা বজৈ তুরা।

বৈরাগী তৃপ্ত হইয়া মত্ত হইয়া রহিয়াছে, (এতদিনে) তাহার জ্ঞান বৈরাগ্যকে সে পরিপূর্ণ শুদ্ধ করিয়া লইল, শ্বাস প্রশ্বাসের প্রেমপাত্র সে পান করিয়া লইল। গগন যেখানে নিনাদিত, বাজিতেছে সেখানে তুরী—কবীরের কাব্যে ভারতবর্ষের জ্ঞানবৈরাগ্য পরিপূর্ণ প্রেমের আনন্দে জীবনের আনন্দে পূর্ণ হইয়া দেখা দিল!

কিন্তু মুক্তার মনোহারিত্বের সঙ্গে সঙ্গে ডুবারীর পরিশ্রম ও কৃতিত্বের কথাটাও ভুলিবার নয়। কবীরের রত্নরাজি যিনি এমন নৈপুণ্যের সঙ্গে বিচিত্র বাজে আবর্জ্জনাস্তূপের ভিতর হইতে উদ্ধার করিয়াছেন, তাঁহার নিকটে আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। যিনি এমন পাকা জহরী, কোন্‌টা সাচ্চা কোন্‌টা ঝুটা যিনি এমন সুন্দররূপে তাহা জানেন, তিনি শুধুই যে কেবল অনুবাদ দিয়া,—তাঁহার অন্তরের প্রজ্ঞার দীপশিখায় কবিকেই দেখাইয়া নিজে অন্ধকারের আড়ালে থাকিবেন—তাহা হইলে চলিবে না। শুধু প্রদীপার্চ্চনা নয়, ভক্তের কাছে কিছু মাঙ্গলিক শ্রবণ করিতেও আমরা অভিলাষী রহিলাম।

কবীরকে পাইয়া আমরা বুঝিয়াছি যে পারস্যে হাফিজ প্রভৃতির ভিতরে মুক্তি ও ভক্তির যেমন এক আশ্চর্য্য সমন্বয় প্রকাশ পাইয়াছিল, মুসলমানের আগমনে চতুর্দ্দশ পঞ্চদশ শতাব্দীতে সেই জিনিসই ভারতবর্ষে আসিয়া নূতনতর এবং পূর্ণতর রূপ ধারণ করিয়াছে। মুসলমানের সঙ্গে হিন্দু সেই যুগে ভাবের খুব একটা বড় জায়গায় মিলিয়াছে।

বঙ্গীয় পাঠকের কাছে এখন এ কথাটা অদ্ভুত ঠেকিতে পারে। কারণ, এখন আমরা মুসলমানের সঙ্গে হিন্দুর ভাবের মিল খুঁজিয়াই পাই না। আমরা যদি কলার-পাতার খাই সোজাদিকে, মুসলমান খায় উল্টাদিকে। ইদ্ উপলক্ষ্যে গোহত্যা লইয়া দুই পক্ষে খুনাখুনিই চলে।

তা ছাড়া আমাদের হিন্দুধর্ম্ম বিগ্রহকে সর্ব্বত্র স্বীকার করে, মুসলমান বিগ্রহ সহ্য করিতে পারে না। কোন মূর্ত্তি, কোন চিহ্ন, কোন রূপক তাহার মস্তিষ্কের কোন গোপন কোণেও স্থান পায় না। গ্রীক্ ধী-শক্তির অধিষ্ঠাত্রী দেবী মিনার্ভার মত তাহার মাথাটা যেন লোহার, সে কেবলি কঠিন, নিরলঙ্কার নিটোল একেশ্বরবাদ ভিন্ন আর কোন জিনিস তাহার মধ্যে নাই। সুতরাং এক সময়ে হিন্দু মুসলমানে ভাবের ক্ষেত্রে বড় একটা মিল হইয়াছিল বলিলে আমাদের কথাটাকে নিতান্তই একটা কাল্পনিক উচ্ছ্বাসমাত্র মনে হওয়া পাঠকের পক্ষে স্বাভাবিক।

অথচ মহম্মদ যিনি মুসলমানধর্ম্মের প্রবর্ত্তক, তিনি যদিচ প্রতিমার বিরোধী ছিলেন, তথাপি একদিকে তাঁহার চিত্ত যথেষ্ট ভাবুক ছিল। এক আছেন মাত্র, এই কথাই তাঁহার একমাত্র কথা নহে, কিন্তু সেই এককে তিনি বিচিত্র ভাবসৌন্দর্য্যের স্বপ্নের মধ্যে দেখিতেন, যেজন্য ক্ষণে ক্ষণে তিনি মূর্চ্ছাহত হইতেন, আনন্দে আপনাকে আর ধারণ করিতে পারিতেন না। মহম্মদের সময়েই আরবে 'হনিফ্' নামক এক ভাবুক সম্প্রদায় ছিল, তাহাদের দ্বারাই তিনি প্রথমে প্রবুদ্ধ হন, কোন কোন ঐতিহাসিক এরূপ অনুমান করিয়া থাকেন।

তার পর যখন ইস্‌লামধর্ম্ম দিগ্বিজয়ে বাহির হইল এবং বোগ্দাদে খলিফদিগের রাজধানী স্থাপিত হইল, তখন

হইতে বৌদ্ধ, খৃষ্টান ও নিওপ্লেটনিক ধর্ম্মমতের সংঘর্ষে মুসলমানধর্ম্মের মধ্যে পরিবর্ত্তন দেখা দিল। খলিফ মমুনের সময়ে খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীতে পুরাতন ধর্ম্মবিশ্বাসে অনেক লোকেরই আস্থার অভাব দেখা গেল। কোরাণের ধর্ম্ম কি না Revelation অর্থাৎ প্রেরিত পুরুষের কাছে স্বয়ং ঈশ্বর কর্ত্তৃক প্রকাশিত ধর্ম্ম, তাই একদল লোকে তাহা অগ্রাহ্য করিয়া কহিল, ধর্ম্মের ভিত্তি Reason-এর উপর অর্থাৎ আত্মপ্রত্যয়ের উপর। কেবল লড়াই, বিলাসিতা, ধর্ম্মের কৃত্রিমতা এবং এই অবিশ্বাস—এই সমস্ত ব্যাপার মানুষকে ভিতরে ভিতরে এমনি শুষ্ক করিয়া আনিল যে ইহার প্রতিক্রিয়া না হইলেই নয়। তাই এই শতাব্দীর কাছাকাছি আমরা সুফীধর্ম্মের ভক্তিবাদের প্রথম সূচনার পরিচয় পাই। সেই ভক্তিস্রোত আত্মজ্ঞানকে এবং ঈশ্বর-প্রেরণাকে এমন করিয়া মিলাইল, বিশ্বভুবনের মধ্যে বিশ্বপতিকে এমন একান্ত আপনার এমন পরম প্রিয়রূপে স্বামীরূপে দেখিল, যে আশ্চর্য্য হইতে হয়। কবীরের প্রায় এক শতাব্দী পূর্ব্বে হাফিজ প্রভৃতি কবি এই সুফীভক্তির উচ্ছ্বাসকে কাব্যের অপরূপ প্রকাশে মুক্ত করিয়া দিলেন। সমস্ত বিশ্বপ্রকৃতি হইল একটি বাগান, বহিল সেখানে প্রেমের দক্ষিণ বায়ু, তাহার অব্যক্ত মর্ম্মকথা বুলবুলের কাকলীতে গীত হইয়া ফিরিল, আনন্দমদিরায় রঞ্জিত আত্মা আপনার প্রেমের মধ্যে আপনার অনিন্দ্যসুন্দর মূর্ত্তি দেখিয়া বিমোহিত হইল।

কবীরের প্রসঙ্গে মুসলমান ইতিহাসের এই অংশটুকুর আলোচনার এইজন্য প্রয়োজন যে, আমাদের জানা উচিত যে, মুসলমান আগমনে কেবল যে হিন্দুমন্দিরের দেবদেবী ধ্বংস হইয়াছিল তাহা নহে, এই ভক্তিবাদ এবং তাহার সাহিত্যের সঙ্গেও ভারতবর্ষের প্রথম পরিচয় ঘটে। সেই সঙ্গে সাধারণ মুসলমান-ধর্ম্মের গোঁড়ামি, প্রবল জেদ্, প্রতিমার প্রতি অভক্তি ও অবজ্ঞা, এ সমস্তই ছিল। তখন পৌরাণিক যুগ। ভারতবর্ষে তখন দেব দেবীর ছড়াছড়ি। বৌদ্ধধর্ম্মের অবসানে অনার্য্য দেবতাগুলি আর্য্য সভায় স্থান পাইয়াছে। তাহাদের প্রত্যেককেই বড় ভাবের দ্বারা শোধিত সংস্কৃত করিয়া প্রত্যেককেই প্রত্যেকের চেয়ে বড় করিয়া তুলিবার জন্য লড়াই চলিতেছে। মন্ত্র তন্ত্র আচার অনুষ্ঠানের বাহুল্য ধর্ম্মকে আকীর্ণ করিয়া ফেলিয়াছে। সেই সময়ে হঠাৎ একেশ্বরবাদের ধ্বজা উড়াইয়া আসিল মুসলমান। সে এক দানব বিশেষ, না মানে গঙ্গাস্নান, না মানে পূজা অর্চ্চনা, না মানে ছাপ-তিলক! সে তিরিশ কোটি উড়াইয়া দিয়া বলিল একমাত্র ঈশ্বর আছেন, আর দ্বিতীয় নাই।

এই একেশ্বরবাদের কথাতো ভারতবর্ষে নূতন নহে, সুতরাং এই সময়ে মুসলমানের আঘাতে ভারতবর্ষের চিত্ত জাগ্রত হইয়া কহিল, মুসলমান যে ধর্ম্ম লইয়া আসিয়াছে তাহা আমাদেরি জিনিষ, তাহার সঙ্গে আমাদের ধর্ম্মের বিরোধ নাই। কিন্তু মুসলমান যে এক ঈশ্বরের কথা বলিতেছে, তাহা যে নিরাকার ও রূপরসবর্জ্জিত, তাহা নহে,—সকল আকারকে সকল রসকে পূর্ণ করিয়া তাঁহার প্রকাশ। কিছুই তাঁহাকে ছাড়িয়া নাই; তিনি সকল ঘট পূর্ণ করিয়াও সকলকে অতিক্রম করিয়া বিরাজমান। মধ্যযুগে ভারতবর্ষে নানাস্থানে যে ধর্ম্মের আন্দোলন জাগিল তাহার মর্ম্মগত কথা ইহাই। বাংলায়, পঞ্জাবে, উত্তর-ভারতে ও দক্ষিণে, চৈতন্য, নানক, কবীর, দাদু, রামানন্দ প্রভৃতি মহাপুরুষগণ এই ভাবের প্রবল বন্যায় সমস্ত দেশকে ভাসাইয়া দিলেন, হিন্দু মুসলমান উভয়েই তাহাদের দলের মধ্যে সমান স্থান লাভ করিল।

তবে বাংলায় যে ধর্ম্মান্দোলন হইয়াছিল তাহার সঙ্গে অন্যান্য স্থানের আন্দোলনের একটুখানি পার্থক্য আছে। আমার মনে হয় মুসলমান প্রভাব বাংলা দেশে তেমন কাজ করে নাই, যেমন উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে করিয়াছে। কবীর তো নিজেই মুসলমান ছিলেন, বাবানানক মুসলমান শাস্ত্র সাহিত্যের সহিত সুপরিচিত ছিলেন। মুসলমানের যে নিরাবরণতার কথা প্রবন্ধের আরম্ভে উল্লেখ করিয়াছি, সুফী ভক্তিবাদেও যাহা বিকৃত হয় নাই, কিন্তু সংস্কারকে ছিন্ন করিয়া রূপের মধ্যে অপরূপের আবির্ভাবকে দেখিবার জন্য সাধনা করিয়াছে, সেই নিরাবরণ মুক্তি, সেই একের সুস্পষ্ট বাণী বাংলা দেশের ভক্তিধর্ম্মকে স্পর্শ করে নাই।

বাংলা দেশের বৈষ্ণব ধর্ম্মের পিছনে সেই নিরাবরণতার কাঠিন্য না থাকাতে তাহা ভক্তিকে বিশ্বপ্রকৃতিতে, মানবের জ্ঞান ও কর্ম্মের সাধনায় বিস্তারিত না করিয়া আপনাতেই আপনি পর্য্যাপ্ত হইবার চেষ্টা পাইয়াছে। ভক্তিই বল, জ্ঞানই বল,—কিছুই আপনাকে আপনি খাইয়া বাঁচিতে পারে না। বিশ্বের মধ্যে তাহাদের প্রসারিত করিয়া না দিলে তাহারা মাদকতা হইয়া বসে। কেবলি রাধিকা সাজিয়া, কখনো বিরহ, কখনো মিলন, কখনো মান, কখনো অভিমানের কাল্পনিক লীলায় হৃদয়-বৃত্তিকে উত্তেজিত করিয়া যে সাধনা, তাহার সঙ্গে বিশ্বের জ্ঞান, বিশ্বমানবের বিপুল ইতিহাসের বিচিত্র সৃজনলীলার কোন যোগ থাকে না। বৈষ্ণব-কাব্যে তাই মাধুর্য্যের উচ্ছ্বাস আছে প্রচুর, কিন্তু সে মাধুর্য্যের মধ্যে কোন বড় সত্যের প্রতিষ্ঠা নাই। সে অশান্ত, চির-অপরিতৃপ্ত—তাহার শেষ কথা এই:—

রাতি কৈনু দিবস দিবস কৈনু রাতি
বুঝিতে নারিনু বন্ধু তোমার পিরীতি।

পারস্য সাহিত্যের কথা আরম্ভেই বলিয়াছি। তাহাও আবেগে উদ্বেল, কিন্তু তাহার ভিতরের চেষ্টাই একটি

নিরাবরণতা, সত্যের মধ্যে একটি অনায়াস মুক্তি। হাফিজের কথা বলিয়াছি, তাঁহার সমস্ত কবিতাই এই-ভাবে পরিপূর্ণ। এ কথা কোন্ ইউরোপীয় কবি প্রণয়-সঙ্গীতে লিখিয়াছে যে দরবেশের মধ্যে যথার্থ বৈরাগ্য নাই, যথার্থ বৈরাগ্য প্রেমিকের; প্রিয়ার চোখের চাহনি হইতে কবি এমন সম্পদ লাভ করিতেছেন যাহা তাঁহাকে আত্মত্যাগের জন্য প্রস্তুত করিতেছে? হাফিজের কবিতার কেবল মদ আর সাকীর ছড়াছড়ি, কিন্তু সে আনন্দের রূপক মাত্র—শুধু তাই নয়, তাহার মধ্যে একটা প্রথার প্রতি বিদ্রোহও আছে এই, যে বাজে মৌখিক আচারগত ধর্ম্মের প্রতি কবির একটা আন্তরিক সুতীব্র বিদ্বেষ রহিয়াছে। সেই জন্য যাহা রীতি-বিরুদ্ধ, যাহা নীতির সংস্কারানুযায়ী নহে তাহাকেই অবলম্বন করিয়া কবি আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন!

যাক্ সে কথা। কবীরের মধ্যে আমরা এই জায়গায় পারস্য সাহিত্যের এই ভাবটির সঙ্গেই একটা মিল পাই। তাহা বাংলা বৈষ্ণব সাহিত্যের মত কেবলি মাধুর্য্যের ব্যক্তি নহে, তাহার মধ্যে মুক্তি ও ভক্তি এই দুই আসিয়া মিলিয়াছে। প্রেম আর বৈরাগ্য এক হইয়াছে। খুব সম্ভব কবীর যেমন হিন্দু বেদান্ত প্রভৃতির বার্ত্তা অবগত ছিলেন, রামানন্দকে গুরু করিবার জন্য দ্রাবিড়ের ভক্তিধর্ম্মের সঙ্গে যেমন পরিচিত ছিলেন, তেমনি মুসলমান হইবার জন্য বোধ হয় মুসলমান সাধনার এই সকল গভীর তত্ত্বও তাঁহার অগোচর ছিল না। তিনি হিন্দু মুসলমান উভয় সভ্যতারই প্রাণরসে চিত্তকে রসাইয়া লইয়া জ্ঞান ও ভক্তির এক অপূর্ব্ব সামঞ্জস্যের ভাবে মাতিয়া উঠিয়াছিলেন।

কবীরের দোঁহাবলীকে ক্ষিতিমোহন বাবু যে সকল ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন তাহা শ্রেণীবিভাগ নয়, তাহা কবীরের এক একটা দিক্‌কে উদ্ভাসিত করিয়া দেখাইবার উপায় মাত্র। তাঁহার ভাগ মোটামুট পাঁচটি, কবীর পরখ, কবীর উপদেশ, কবীর সাধনা, কবীর তত্ত্ব ও কবীর প্রেম। কবীর পরখ, উপদেশ ও সাধনাকে আমরা স্বতন্ত্র করিয়া দেখিব না, কারণ এই তিনের মধ্যেই সাধনারই সংবাদ রহিয়াছে। কবীর তত্ত্ব ও কবীর প্রেমের স্বতন্ত্র ভাগের সার্থকতা আছে।

কবি হাফিজের ন্যায় কবীর ধর্ম্মের সমস্ত সংস্কারকে একেবারে উড়াইয়া দিয়া, আচার হইতে স্বাধীনতা লাভের আকাঙ্ক্ষা বারম্বার প্রকাশ করিতেছেন।

কোই রহীম্ কোই রাম বখানৈ
কোই কহে আদেস।
নানা ভেব বনায়ে সবৈ মিল
ঢূঁঢ় ফিরে চহুঁ দেস॥

কেহ বলেন রাম আমার উপাস্য, কেহ বলেন রহীম্, কেহ বলেন প্রত্যাদেশ, এইরূপে সকলেই নানা ভেক ধারণ করিয়া ঘুরিয়া মরিতেছেন।

অরে ইন্ দুহু, রাহ ন পাঈ।
হিঁ নদুকী হিং দরাঈ দেখী
তু র্ক ন কী তুরকাঈ।

হায় রে এই উভয়ই পথ পায় নাই। হিন্দুর হিঁদুয়ানী দেখিয়াছি, মুসলমানের মুসলমানী।

আমাদের সমাজ এখন এই আচারের বন্ধনে এমনি আপাদমস্তক জড়িত যে হঠাৎ এ সকল ক্রিয়াকর্ম্মে বাহ্য আচার অনুষ্ঠানে কোন ফল নাই শুনিলেই আমরা আঁতকাইয়া উঠি এবং জিজ্ঞাসা করি, তবে কিসের উপর আমরা ভর করিব? স্বাধীনতা বলিয়া যে একটা পদার্থ আছে, যে আপনিই আপনার নিয়ম, আপনিই আপনার জগৎ, অথচ যাহা উচ্ছৃঙ্খল নহে, যাহা আপনাকে লাভের দ্বারাই বিশ্বকে লাভ করে এবং সকলকে লাভ করে, সে কথাটা আমাদের চেতনার মধ্যেই নাই: প্রকৃত সাধনা যে সেই আপনার ভিতরকার আপনকে লাভ করা কবীর সে কথা বলিয়াছেন:—

সাধো, সো জন উতরে পারা
জিন মনতে আপা ডারা॥

যে জন মন হইতে আপনাকে দূর করিয়াছে, সেই উত্তীর্ণ হইয়াছে। অর্থাৎ মনের দাসত্ব যে করে না, সংস্কারকে যে কাটাইয়া উঠিয়াছে, যে একেবারেই সব জিনিসের সত্যকে দেখিতে পায়, কোন আবরণের ভিতর হইতে দেখে না, তাহার কাছে যোগ, বৈরাগ্য, কোনটাই শেষ কথা নহে, যে সমস্ত পন্থার ভিতর দিয়া গিয়া মনের সমস্ত অভ্যাসের বন্ধন ছিন্ন করিয়া, আপনার আপনিকে লাভ করিয়াছে—সেইই যথার্থ ভাবে মুক্ত। কবীর একেবারে স্বাধীনতার মূলে গিয়া ঘা দিয়াছেন।

"হে ভাই, যখন আমি ভুলিয়াছিলাম, তখন সেই আমার সদ্গুরুই আমাকে পথ দেখাইয়াছেন। আমি তখন ক্রিয়াকর্ম্ম আচার ছাড়িলাম, তীর্থে তীর্থে স্নান ছাড়িলাম। * * সেই দিন হইতে আমি না জানি দণ্ডবৎ প্রণাম, না বাজাই ঘণ্টা, না আমি সিংহাসনে কোন মূর্ত্তি স্থাপন করি, না আমি পুষ্পের দ্বারা কোন প্রতিমা অর্চ্চনা করি।"

"যে পর্য্যন্ত পরমাত্মার সহিত পরিচয় হয় নাই, সে পর্য্যন্ত কিছুই পাও নাই। তীর্থ, ব্রত, জপ, তপ, সংযম এ সকল কর্ম্মেই ভুলিয়া থাকিও না।"

আমাদের দেশে কোন দল বিশেষে সাকার নিরাকার উপাসনার সমন্বয় সম্বন্ধে একটু বিশেষ গৌরবের দাবী দেখিতে পাওয়া যায়। সে সমন্বয় ব্রহ্মকেও মানে আবার

ঘেঁটু মনসার পূজাতেও উৎসাহ প্রদর্শন করিয়া থাকে। তাহা তর্ক করিয়া বলে যে ব্রহ্ম যখন সর্ব্বব্যাপী তখন তাঁহাকে যাহাতে খুসী তাহাতেই ভজনা করা যায়। কিন্তু আসলে ভজনা হয় না সর্ব্বব্যাপী দেবতাকে, ক্ষুদ্র দেবতাই সমস্ত পূজা আহরণ করিয়া থাকেন। নিজের লোভ, নিজের স্বার্থ, নিজের ক্ষুদ্র ভয়ের দ্বারা সেই দেবতা তৈরি; অথচ তাহাকে বড় নাম দিয়া ফাঁপাইয়া তুলিবার জন্য কতই আয়োজন! এমতাবস্থায় সমন্বয়টা যে কিরূপ হয় তাহাই জিজ্ঞাস্য। যাহা সকলের বড়, যাহা দেশ কালের দ্বারা পরিচ্ছিন্ন নয়, যাহার মধ্যে সমস্তের পরম পরিণতি চরম অবসান, সেই পরিপূর্ণতম সত্যের সঙ্গে নিজের কল্পনারচিত প্রবৃত্তির মোহময় অসত্যের সঙ্গে সমন্বয়টা হইবে কোন্ জায়গায়?

আধুনিক সাকার নিরাকার উপাসনার সমন্বয়ীগণকে একবার কবীরের ভিতরে প্রবেশ করিতে অনুরোধ করি। কবীর যে সকল সীমার মধ্যে অসীমকে দেখিয়াছেন, সে কোন মনঃকল্পিত মূর্ত্তিবিশেষের মধ্যে দেখা নয়। সে অসীমকে শূন্য বলিয়া না জানিয়া তাহাকে সব জায়গায় স্বীকার করা, সর্ব্বঘটে দর্শন করা, সকল জীবনের ভাব ও অনুভূতি রাশির মধ্যে গূঢ়রূপে উপলব্ধি করা। আর এ সাধনার প্রধান অন্তরায়ই বাহ্যিকতা। মনে রাখিতে হইবে যে কেবল বাহ্য অনুষ্ঠানাদির অসারতা প্রতিপাদন করাই কবীরের উদ্দেশ্য নহে। যাহারা বাহ্য পূজারীতি ত্যাগ করিয়া আত্মার মধ্যেই নিখিল সত্যকে ধ্যান ও উপলব্ধি করাই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম এই কথা বলে, তাহারাও যে সব সময়ে যে ব্যক্তি বাহ্য পূজায় ডুবিয়া আছে তাহা অপেক্ষা উন্নততর হয় তাহা নহে। তাহারা হয়ত স্নান ও ছাপা-তিলকের পরিবর্ত্তে কথা ও মতকে সাজাইয়া রাখিয়াছে, এবং দিনের পর দিন সেই শুষ্ক আন্তরিকতাশূন্য মূঢ় সাধনায় কালাতিপাত করিতেছে।

কবীর তাই জিজ্ঞাসা করিতেছেন:—

অবধূ মায়া তজী ন জাঈ

মায়া কেমন করিয়া ত্যাগ করা যায় বলতো ভাই?

মনবৈরাগী মায়াত্যাগী

শব্দমেঁ সুরত সমাঈ

মন বৈরাগ্য বশতঃ মায়াকে ত্যাগ করিল অথচ শাস্ত্রকে আঁকড়াইয়া রহিল।

আধুনিককালে আমাদের অনেকের দেবতা কি সেই শাস্ত্রের দেবতা বাক্যের দেবতা নন্?

কিন্তু সবই যদি সংস্কার, সবই যদি মায়া, তবে সব হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যে স্বাধীন হইলাম মনে করা তাহা কি আত্মঘাতের নামান্তর হয় না? কবীর কি সেই রকমের স্বাধীনতাকামী? আর তাহাই কি শ্রেয়? আমি গোড়াতেই বলিয়াছি যে কবীরের মধ্যে জ্ঞান ও ভক্তির এক আশ্চর্য্য সামঞ্জস্য ঘটিয়াছিল। মায়াবাদ বলিতে আমাদের মনে যে বিভীষিকার উদয় হয়, কবীরের মায়াবাদ সে জাতীয় নহে। তিনি ব্রহ্মকেও এক জায়গায় মায়া বলিয়াছেন। কেমন করিয়া একদিকে সমস্ত অতিক্রম করিয়া তিনি বিশুদ্ধ নির্গুণ সত্তার উপলব্ধি করিয়াছেন জ্ঞানযোগে, এবং অন্যদিকে সমস্তকে পরিপূর্ণ প্রেম দৃষ্টিতে ভরিয়া ভগবানকে স্বামী বলিয়া প্রিয়তম বলিয়া অনুভব করিয়াছেন ভক্তিযোগে,—এই দুই বিভিন্ন সাধনাকে তিনি কি করিয়া মিলাইয়াছেন তাহা এবারে আলোচনা করিতে গেলে পুঁথি বাড়িবে। বারান্তরে সে আলোচনায় হাত দেওয়া যাইবে।*

শ্রীঅজিতকুমার চক্রবর্ত্তী।

কৃষি-উন্নতির দৃষ্টান্ত।

ডবলিন্ সহরের রাস্তা দিয়া কয়েকজন বিদেশী পরিব্রাজককে গাড়ীতে লইয়া যাইতে যাইতে অন্য একটি শকটে দুইটি ভদ্রলোককে দেখিয়া গাড়োয়ান আরোহীদের সম্বোধন করিয়া বলিল "জান, ঐ দুজন লোক কে? স্যার হোরেস্ প্লান্‌কেট ও এন্‌টনি ম্যাক্‌ডোনেল্—ওঁরা আয়র্ল্যাণ্ডের ভাগ্য-দেবতা"। প্ল্যান্‌কেট আইরিশ কৃষক ও শ্রমজীবিদের জন্য যাহা করিয়াছেন, গত প্রবন্ধে তাহা উল্লেখ করিয়াছি। যে স্বদেশ-প্রেমিকতা মানুষের চিত্তকে মঙ্গলকর্ম্মে উদ্বোধিত করে, যাহার বাণী সমস্ত বাধাবিঘ্নকে অতিক্রম করিয়া আমাদিগকে এক উদার কর্ম্মক্ষেত্রে টানিয়া লয়, আইরিশ কৃষকের উন্নতিকল্পে স্যার প্ল্যান্‌কেটের অশ্রান্ত পরিশ্রম ও অদম্য উৎসাহ তাহারই দৃষ্টান্ত। আয়র্ল্যাণ্ডে নামজাদা রাজনৈতিক নেতৃবর্গের নাম সংবাদপত্রের বক্তৃতা-সভার বিবরণীতেই ছাপান থাকে কিন্তু স্যার ম্যাক্‌ডোনেলের নাম দেশের চিত্তপটে চির-মুদ্রিত হইয়া রহিয়াছে।

প্লান্‌কেট আয়র্ল্যাণ্ডকে সম্পূর্ণভাবে বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন; তাই রাজনৈতিক সংস্কারকদের ন্যায় তিনি পার্লিমেণ্টে আবেদন করিয়া, বক্তৃতায় অন্যায় অত্যাচারের তীব্র প্রতিবাদ করিয়া ও সংবাদপত্রে ইংরেজ শাসনের কুফল প্রচার করিয়া আয়র্ল্যাণ্ডকে মুক্তিরপথে স্বাধীনতার সোপানে লইয়া যাইবার চেষ্টা করেন নাই। তিনি একস্থানে লিখিয়াছেন, আয়র্ল্যাণ্ডের ব্যাধি ও তাহার প্রতিকারের মূল কোনো একটি কারণে নিহিত আছে তাহা নহে; আমরা ইংরাজের অধীন বলিয়া আমাদের দেশে রোমীয় ধর্ম্ম সম্প্রদায় নানাপ্রকার জাল

* শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন কর্তৃক অনুমোদিত কবীরের দোহাবলী

জঞ্জালে সাধারণ লোকগুলিকে আবদ্ধ করিয়া ফেলিতেছে বলিয়া কিম্বা অপর কোনো একটি কারণবশতঃ আইরিশ কৃষক ও শ্রমজীবিদের এমন দুর্গতি হইয়াছে একথা বলা যাইতে পারে না। তিনি বলেন বহু শতাব্দীর আবর্জনা ক্রমশঃই পুঞ্জীভূত হইয়া আজ আয়র্ল্যাণ্ডকে এমন দুর্গতিভারগ্রস্ত করিয়া তুলিয়াছে। আশ্চর্য্য এই আইরিশের ন্যায় একটা বলিষ্ঠ জাতি বংশপরম্পরাক্রমে তাহাদের জাতীয় সমস্যাগুলির মীমাংসার চেষ্টা পর্য্যন্ত করিল না। এবং অম্লান বদনে স্বীকার করিল যে আয়র্ল্যাণ্ড বিপথে চলিয়াছে—তাহার আর উদ্ধার নাই।

কিন্তু সমস্যা কঠিন ও জটিল বলিয়া এমন করিয়া হাল ছাড়িয়া দেওয়া অত্যন্ত কাপুরুষের লক্ষণ। স্যার প্ল্যান্‌কেট বুঝিতে পারিলেন, আইরিশ দীর্ঘকাল নিপীড়িত হইয়া জীবনকে অত্যন্ত হাল্কা করিয়া দেখিতেছে—এই জন্য তিনি সমগ্র চেষ্টা দিয়া জাতীয় উদ্দীপনার সূত্রপাত আরম্ভ করিলেন। যাহাতে দেশের জনসাধারণের মেরুদণ্ডে বলসঞ্চার হয়, যাহাতে ইহারা শিক্ষালাভ করিয়া নিজেদের অবস্থা সম্যক্ ধারণা করিতে পারে, প্ল্যান্‌কেট কতিপয় বন্ধুর সাহায্যে এই ধর্ম্মে ব্রতী হইলেন। তাঁহারা দেখিলেন নৈতিক সাহস; আত্মপ্রত্যয়, শক্তি লাভের জন্য ব্যাকুলতা ও কর্ম্মোৎসাহের অভাবেই ত আয়র্ল্যাণ্ডে দারিদ্র্য রাজত্ব করিতে পারিতেছে। ইহার জন্যই য়ুরোপে বাণিজ্য-বিপ্লব উপস্থিত হইলে ইংলণ্ড যেমন করিয়া নিজেকে সামলাইয়া রাখিতে পারিয়াছিল, আইরিশগণ তাহা পারিলেন না। বাণিজ্য-চতুর জনবুল্ সুযোগ পাইয়া আয়র্ল্যাণ্ডের দেশীয় কারখানাগুলির দরজা বন্ধ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল, এবং ক্রমশঃই আয়র্ল্যাণ্ডের বাণিজ্য বিলুপ্ত হইতে আরম্ভ করিল।

কিন্তু যখন জীবিকা-নির্ব্বাহের একটি পথ বন্ধ হয়, জঠর-জ্বালার তাড়নায় তখন অপর একটি পন্থা মানুষ খুঁজিয়া লয়। বাণিজ্যশালার দরজা বন্ধ হইতেই আইরিশগণ জমিদারদের নিকট হইতে ভূমিখণ্ড সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করিল—আয়র্ল্যাণ্ডে কৃষি-কর্ম্মের ধূম পড়িয়া গেল। কৃষিক্ষেত্রে নামিয়াই আইরিশ বুঝিতে পারিল শুধু চাষ করিয়া বীজ ছড়াইয়া দিলেই প্রচুর ফসল হইবে কৃষিকর্ম্ম এত সহজ নহে; এখানেও নানা-প্রকার বাধা-বিঘ্ন বিরোধ আসিয়া কর্ম্মক্ষেত্রকে জটিল করিয়া তুলিল; কার্য্যত যে সকল অসুবিধা ঘটিতে লাগিল তাহা ঠেলিয়া কৃষিউন্নতির চেষ্টা করা সম্ভব হইলেও বাহির হইতে ইংলণ্ড আয়র্ল্যাণ্ডের জমির উপর এমন কর ধার্য্য করিলেন যে, যে-কোনো দেশে এইরূপ করভার কৃষি-উদ্যমকে পিষিয়া ফেলিতে পারিত। আয়র্ল্যাণ্ডে এই কর-ধার্য্য হওয়াতে কৃষি-উন্নতি ও পল্লী-সমাজ-গঠনকার্য্য আরো কঠিন হইয়া উঠিল। একবার ভাবিয়া দেখুন, যে দেশে অন্তত ৮০ বিঘা জমি না হইলে একটা কৃষিপরিবার স্বচ্ছন্দে জীবিকানির্ব্বাহ করিতে পারে না সেই দেশে চল্লিশ হইতে তিন বিঘা পর্য্যন্ত ছোট ছোট খণ্ড জমির সংখ্যা পাঁচ লক্ষ এবং ইহার এক একটি খণ্ডে একটি বা বহু পরিবার জীবিকার জন্য নির্ভর করে। অনেকস্থলেই জমির উর্ব্বরতাশক্তি অত্যন্ত অল্প; সার প্রয়োগ করিয়া জমিকে প্রস্তুত করিবার অর্থও ইহাদের নাই। যাহারা সমুদ্রের কাছে বাস করে তাহারা মৎস্য, কাঁকড়া শামুক ইত্যাদি বিক্রয় করিয়া জীবিকা অর্জ্জন করে; যেখানে এই প্রকার কোনো ব্যবস্থা সম্ভবপর নহে, সে সকল স্থান প্রতিদিনই জনশূন্য হইয়া পড়ে কেন না সহ্য করিতে না পারিয়া, দারিদ্র্যক্লিষ্ট আইরিশগণ দলে দলে কেহ স্ত্রী পুত্র লইয়া কেহ একাকী স্বদেশ ত্যাগ করিয়া আমেরিকাভিমুখে যাত্রা করে। নিউইয়র্কে পৌছিবার পূর্ব্বে ইহাদের কিছু-কাল একটী দ্বীপে বদ্ধ হইয়া থাকিতে হয়। এইরূপ নিঃস্ব আইরিশগণ প্রথম যখন নিউইয়র্কে পৌছে, তখন তাহাদের লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছি, সে যে বিদেশে আসিয়া অত্যন্ত বিপন্ন হইয়াছে তাহার চাহনিতে, কথাবার্ত্তায় ও কাজকর্ম্মে তাহা বুঝা যায়। কোনো-প্রকারে কুলিমজুরের কাজ করিয়া সে জীবিকা অর্জ্জন করে। এক বৎসর অতীত হইতে না হইতেই আর এক দৃশ্য—তাহার সমস্তই পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। সে এখন সোজা হইয়া চলে; বেশভূষা কথাবার্ত্তা ও চাল-চলনে সে এখন কাহারো অপেক্ষা হীন নহে; এরূপ হইবার কারণ কি? আমার মনে হয়, আয়র্ল্যাণ্ডে ইহারা এমন একটা হীনাবস্থায় চাপা থাকে যে কোনো মতেই তাহাদের জীবন সেখানে স্ফূর্ত্তি পাইতে পারেনা; সেখানে চারিদিক হইতেই সে যেন কেবল এই বাণীই শুনিয়াছে যে, দুর্গতি ভিন্ন বিধাতা আর কোনো বর তাহাকে দান করেন নাই। দীর্ঘকাল ধরিয়া এই কথা শুনিতে শুনিতে সে যথার্থই বিশ্বাস করে যে সে অত্যন্ত দীনহীন; তাই ক্রমশই তাহার ভিতরের শক্তি লোপ পাইতে থাকে। কিন্তু সে আমেরিকায় পৌছিতেই সেখানকার প্রকৃতি তাহাকে বলে যে সে মানুষ,—কাহারো চেয়ে সে হীন নয়; ধন, ঐশ্বর্য্য, সহায় সম্পদ সমস্তই মানুষই অর্জ্জন করিয়াছে, সেও করিতে পারে। বিশ্বসংসারে সে যে সামান্য নহে, তার ভিতরে যে সমস্ত শক্তি প্রচ্ছন্ন আছে, এ কথা সে এই প্রথম শুনিয়া থাকে। প্রকৃতির

এই উদ্বোধনে তাহার বুকে সাহস হইলে সে মানুষ হইবার জন্য উঠিয়া দাঁড়ায়।

যাহাতে স্বদেশে থাকিয়া আইরিশ এ বাণী শুনিতে পারে মিঃ প্ল্যানকেট্ সেই উদ্দেশ্য লইয়াই কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। কৃষক ও শ্রমজীবিগণ যাহাতে সুখেস্বচ্ছন্দে বাস করিতে পারে সে জন্য তিনি আইরিশ পল্লীগুলিকে গড়িয়া তুলিয়াছেন; কৃষিকার্য্যকে লাভজনক করিবার উদ্দেশ্যে তিনি অক্লান্ত পরিশ্রমের দ্বারা যে সকল ব্যবস্থা করিয়াছেন, গত প্রবন্ধে তাহা আলোচিত হইয়াছে।

জনসাধারণকে শিক্ষিত করিতে না পারিলে কোনো সংস্কারকার্য্যই বেশি দিন টিঁকিতে পারে না। শিক্ষা-প্রভাবে মানুষের মধ্যে আত্মপ্রত্যয় জাগিয়া উঠে। ইহা না হইলে কোনো চেষ্টাই সার্থক হইতে পারে না। স্যার প্ল্যানকেট্ এই জন্যই প্রধান কৃষি-সমিতির (Central Agricultural Society) সাহায্যে প্রাথমিক শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা করিলেন। সহজ সরল ভাষায় কৃষিতত্ত্ব কৃষকদের নিকট ব্যাখ্যা করিবার নিমিত্ত তিনি আয়র্ল্যাণ্ডে কৃষিবিদগণকে ও বিদেশীয় পণ্ডিতদিগকে আহ্বান করিতেন। ইহাতে শুধু শিক্ষার কাজ হইত তাহা নহে, যাঁহারা পণ্ডিত, যাঁহারা ভদ্র, যাঁহারা সংসারে কৃতিত্ব লাভ করিয়াছেন, অশিক্ষিত সামান্য আইরিশ কৃষক হইয়াও তাঁহাদের সঙ্গ পাইতেছে, ইহাতে আইরিশগণ সমস্ত জগতের সঙ্গে যে তাহাদের একটা যোগ আছে তাহা অনুভব করিয়া উৎসাহিত হইত।

কৃষিশিল্প বিস্তারের জন্য স্যার প্ল্যানকেট ও তাঁহার সহযোগী বন্ধুগণ যাহা করিয়াছেন তাহা অনুকরনীয়। আইরিশ শিক্ষকদল হইতে কতকগুলি শিক্ষককে কৃষিবিদ্যা শিখাইয়া আয়র্ল্যাণ্ডের স্থানে স্থানে ইস্কুল স্থাপন করিবার প্রস্তাব করিলেন এবং শিক্ষকগণ Royal College of Science এ তিন বৎসর কৃষি অধ্যয়ন করিতে পারেন এরূপ ব্যবস্থা করা হইল। অবস্থাপন্ন কৃষকগণের জন্যে স্থানে স্থানে কৃষিবিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে, এবং যাহারা ইস্কুলের বেতনাদি দিতে অসমর্থ তাহাদের জন্য বিভাগীয় কৃষিক্ষেত্রে শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়।

ডেনমার্কে, আমেরিকার যুক্তরাজ্যে কৃষকদিগকে কৃষি-পরীক্ষার ফলাফল জানাইবার জন্য যে ব্যবস্থা করা হয়, আয়র্ল্যাণ্ডেও তাহা প্রচলিত হইয়াছে। একদল শিক্ষক প্রচারকের ন্যায় স্থানে স্থানে ভ্রমণ করিয়া গ্রামস্থ কৃষকদের নিকট বিভাগীয় কৃষিক্ষেত্রে পরিচালিত পরীক্ষাদির ফলাফল বিস্তৃতভাবে প্রাঞ্জল ভাষায় বুঝাইয়া দেন। শুধু বক্তৃতা নহে, এই শিক্ষকদলকে চাষীদের জমিতে গিয়া কে কি ভুল করিতেছে, কাহার কি করা উচিত ইত্যাদি যত্নের সহিত বলিয়া দিতে হয়। ইহা দ্বারা কৃষিকর্ম্মে কি প্রকার উন্নতি হওয়া সম্ভব, তাহা সহজেই অনুমিত হইতে পারে।

সর্ব্বপ্রধান কৃষি-সমিতি আয়র্ল্যাণ্ডের উন্নতির জন্য যাহা করিতেছেন, পূর্ব্বে তাহা স্থানে স্থানে উল্লিখিত হইয়াছে। সমিতির সমস্ত কার্য্যপ্রণালী ও ব্যবস্থা এবং ইহার চেষ্টায় কৃষি ও শিল্পের যে উন্নতি হইয়াছে তাহা বর্ণনা করিতে গেলে প্রবন্ধের কলেবরবৃদ্ধি হইবে, সংক্ষেপে কিছু বলা যাইতে পারে।

প্রথমতঃ, আয়র্ল্যাণ্ডের পতিত জমিগুলিতে শস্যাদি উৎপন্ন করা সম্ভব হইয়াছে; যে দেশের কৃষকেরা জমিকে উর্ব্বরা রাখিবার জন্য সার ব্যবহার করিতে জানিত না, তাহারা ছয় বৎসরে প্রায় বিশ হাজার টন্ অর্থাৎ ৫৪০,০০০ হাজার মন আয়র্ল্যাণ্ডের তৈরী সার ব্যবহার করিয়াছে; এতদ্ব্যতীত বিদেশ হইতেও প্রচুর পরিমাণে সার আমদানী করা হইয়াছে।

দ্বিতীয়তঃ, বিদেশ হইতে উন্নত বংশের গরু ঘোড়া আনিয়া আয়র্ল্যাণ্ডের গরু ও ঘোড়ার যথেষ্ট উন্নতি করা হইয়াছে। কৃষকদিগকে উৎসাহিত করিবার জন্য সমিতির উদ্যমে গ্রামে গ্রামে প্রদর্শনী খুলিয়া উৎকৃষ্ট ঘোড়া বা গরু বা শুকরের জন্য কৃষককে অর্থ পুরস্কার করা হয়; এক বৎসরের মধ্যে সমিতি হইতে ১২ হাজার পাউণ্ড অর্থাৎ ১৮০,০০০ টাকা কেবলমাত্র ষাঁড়ের জন্য দেওয়া হইয়াছে। পুস্তিকা বিতরণ করিয়া, সরল ভাষায় প্রাণী-রক্ষা ও প্রতিপালনের প্রণালী বুঝাইয়া দিয়া, কালেজে ইস্কুলে বিভিন্ন শ্রেণীর জীবজন্তু লইয়া পরীক্ষা করিয়া নানাভাবে সমিতি দেশের গৃহপালিত জন্তুর উন্নতি সাধন করিয়াছেন।

তৃতীয়তঃ, দুধের ব্যবসা অতি অল্পকাল মধ্যে আয়র্ল্যাণ্ডে প্রসারিত হইয়া পড়িয়াছে; এখন বিদেশী মাখম, চিজের (cheese) উপর ইহাদিগকে নির্ভর করিতে হয় না।

চতুর্থতঃ, ছোট খাট নানা ব্যবসার পথ খোলা হইয়াছে। ফল-রক্ষণ, জ্যাম, মারম্যালেড্, চাটনি ইত্যাদি তৈরি করা প্রভৃতি লাভজনক ব্যবসা এই সমিতিই উদ্যোগ করিয়া গ্রামে গ্রামে স্থাপন করিয়াছে; এই সকল কাজ সাধারণ আইরিশ কৃষক ও শ্রমজীবিদের স্ত্রী ও কন্যারা করিয়া থাকে।

পঞ্চমতঃ, তামাক ও তিসি এই দুইটি শস্য আয়র্ল্যাণ্ডে জন্মিতে পারে কিনা কয়েক বৎসর অবধি তাহা সমিতির কৃষিক্ষেত্রে পরীক্ষা করা হইতেছে। অল্পকাল মধ্যেই ইহাই আয়র্ল্যাণ্ডের কৃষিক্ষেত্রে স্থান পাইবে এরূপ আশা করা যাইতে পারে।

নিউইয়র্কে আইরিশ পল্লীতে ভ্রমণ করিয়া এবং আর্য়ল্যাণ্ড সম্বন্ধীয় পুস্তক পাঠ করিয়া অনেক সময় মনে হইয়াছে ভারতবর্ষের অবস্থার সঙ্গে আয়র্ল্যাণ্ডের যথেষ্ট মিল আছে। বহুস্থলে সত্যই ইহা পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু আইরিশদের মধ্যে দুইটি বিশেষত্ব আছে; প্রথম—সম্মিলিত চেষ্টার দ্বারা কর্ত্তব্য সম্পন্ন করিবার; দ্বিতীয়—Commercial patriotism অর্থাৎ আমরা আইরিশ আয়র্ল্যাণ্ডে উৎপন্ন দ্রব্য ব্যতীত আর কোনো দ্রব্য ব্যবহার করিবনা এই সঙ্কল্প।

প্রশ্ন উঠিতে পারে, আয়র্ল্যাণ্ডে স্যার প্ল্যান্‌কেট্ যে এতবড় কাজ সম্পন্ন করিতে পারিলেন, কোথা হইতে ইহার ব্যয়ের সংস্থান হইল? স্যার প্ল্যান্‌কেটের অবস্থা ভাল ছিল; তিনি তাঁহার সমস্তই এ কার্য্যে দান করিয়াছেন। তাঁহার বন্ধুগণও তাঁহাকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। আমাদের দেশেও যদি পল্লীগুলিকে শ্রীসম্পন্ন করিয়া তুলিতে হয়, এবং যাহাদের রুধির-শোষণে আমরা "ভদ্রলোক" হইতে পারিয়াছি, তাহাদের মুখে অন্নগ্রাস তুলিয়া দিতে হয়, তাহা হইলে অবস্থাপন্ন ভদ্রলোকদিগকে মুক্ত হস্তে কৃষি-উন্নতির জন্য দান করিতেই হইবে। আর যদি সহজে আমরা দান না করি, তাহা হইলে আশা করি এমন একদিন আসিবে যে দিন ভারতবর্ষের শ্রমজীবী ও নিম্নশ্রেণীয়গণ ধর্ম্মঘট করিয়া তাহাদের স্বদেশীয়গণের নিকট হইতে নিজের প্রাপ্য দাবী করিয়া অন্যান্য দেশের ন্যায় অন্যায়ের প্রতিকার-চেষ্টা করিতে পারিবে। আমরা আজকাল বিদেশীয়ের বিরুদ্ধে অভিমান করিয়া বয়কট করিতে শিখিয়াছি কিন্তু বস্তুত যদি অভিমান করিবার যথার্থ পাত্র কোথাও থাকে সে আমাদের স্বদেশীয় ভদ্রমণ্ডলী। ইহারা পদে পদেই ধন-মান-খ্যাতি-বিদ্যা হইতে দেশের নিম্নতন শ্রেণীকে বঞ্চিত করিয়া তাহাদিগকে নিরুদ্যম ও অপমানে অভ্যস্ত করিয়া তুলিয়াছে। আজ ইচ্ছা-পূর্ব্বক ভদ্রমণ্ডলী যদি ইহার প্রায়শ্চিত্ত স্বীকার না করেন তবে যেন তাহা তাঁহারা স্বীকার করিতে বাধ্য হন। নিজের দেশের সম্বন্ধে ভূরি পরিমাণে পাপের ভার বহন করিয়া অন্যের বিরুদ্ধে অভিমান পোষণ ও প্রকাশ করিবার নির্লজ্জতা আমাদের যত শীঘ্র ঘোচে ততই মঙ্গল।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

অহং ও স্বয়ং।

আমার অহং তুমিই স্বয়ং
করতে পার লয়,
আর কাহারো যোগে আমার
অহং যাবার নয়।
যেথায় যখন বসি আমি
যেথায় বাঁধি ঘর,
অহং আমার সাথের সাথী
নিত্য অনুচর।
যখন হাসি যখন কাঁদি
যখন যাহা চাই,
সবার মাঝে অহং বাজে
শুনতে আমি পাই।
মনের মধ্যে যদি আমি
ভাবি কিছুক্ষণ
সেথাও দেখি অহং পেতে
রয়েছে আসন।
অহংটিরে এড়াই এমন সাধ্য
আমার নাই
এই কথাটি সবার উপর
সত্য জেন ভাই।
জানুক আমায় সবাই, আমি
নইকো তপস্বী,
বৃথা কথায় যেমন আমি
না হই যশস্বী।
অহং আমার আগাগোড়া
অহং আমার মন,
বৃথা সকল জারিজুরি
বৃথাই আস্ফালন।
অহং যোগে বাঁধা আমার
আছে চারিপাশ
আপন জোরে কাটব এরে
নাইকো এমন আশ্।
নাইকো এমন বীর্য্য যাহে
করব' অহং জয়
তুমি যদি সদয় হয়ে
না হও স্বয়ংময়।
আমি অহং ভেদের বাঁধন
মরণ করি সার,
তুমি স্বয়ং লওহে আমায়
অভেদ-পরপার।

১৬ই কার্ত্তিক। শ্রীহেমলতা দেবী।

বাহাই ধর্ম্ম।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

গত প্রবন্ধে আমরা বলিয়াছি, সকল মানবই যে এক, মানব-সমাজের এই ঐক্যানুভূতিই বাহাই ধর্ম্মের মূল কথা। পারস্যদেশীয় এই নবধর্ম্মান্দোলনের নেতৃগণের প্রধান চেষ্টা মানবসমাজে যে অনৈক্য, যে দ্বন্দ্ব বিরোধ সকল অবিরত চলিতেছে, মানব-চিত্তকে সত্যভাবে সত্য উপলব্ধিতে জাগ্রত করিয়া এই সকল বিশৃঙ্খলা দূর করা। বাহাইগণ আপনাদিগকে "আলোকের প্রেমিক" (Lovers of Light) বলিয়াছেন। মানবের সত্য স্বরূপটি যে কি তাহা জানিয়া সেই সত্যালোক লাভ করিয়া এবং এই সত্যকে ভালোবাসিয়া তাঁহারা "আলোকের প্রেমিক" আখ্যা গ্রহণ করিয়াছেন। বাহাউল্লা একস্থানে যাহা বলিয়াছেন তাহার মর্ম্ম এইরূপ—

হে মানব সন্তানগণ, তোমরা কি জান কেন তোমাদিগকে একই মৃত্তিকা হইতে সৃষ্টি করা হইয়াছে ? তাহা এই জন্য যে একজন আর একজনের উপর কোনো প্রধান্যের দাবী করিবে না। সর্ব্বদা মনে রাখিয়ো, কি ভাবে তোমরা সৃষ্ট হইয়াছ।

যেহেতু আমরা একই পদার্থে সৃষ্ট হইয়াছি, আমাদিগকে এক-আত্মা হইতে হইবে। আমাদিগকে আমাদের জীবনে সকল কর্ম্মে একতার আদর্শকে সত্য করিয়া তুলিতে হইবে।—বাহাউল্লা বলিয়াছেন—তুমিই আমার আলো—ঈশ্বরের সত্যালোক আমাদের মধ্যেই প্রকটিত। এই আলোকই বাহাইগণ অনুসন্ধান করেন এবং ইহাকেই তাঁহারা অনুসরণ করেন।

আব্দুল বাহা একস্থানে বলিয়াছেন—যাঁহারা ঈশ্বরের প্রিয় হইতে চান তাঁহারা সকলে একত্র হৌন, এবং পরস্পরকে ভালোবাসুন। সমস্ত মানবকে তাঁহারা ভালোবাসুন এবং পরস্পরের জন্যে প্রয়োজন হইলে জীবন দান করিতেও প্রস্তুত হৌন। ইহাই বাহা'র পথ, ইহাই বাহা'র ধর্ম্ম, ইহাই তাঁহার নিয়ম এবং যাঁহার মধ্যে এই সকলের কিছুই নাই তাঁহার মধ্যে বাহা'রও কিছুই নাই।"

বাহাই আন্দোলন এইরূপে আপনাকে পৃথিবীতে আধ্যাত্মিক ঐক্য আনয়ন করিবার উপায়স্বরূপ বলিয়া প্রকাশ করিতেছে। ইহার এই দাবী সহজে লোপ করা যায় না। শত শত আত্মত্যাগী ব্যক্তি এই সত্য অন্তরে উপলব্ধি করিয়া নির্য্যাতকের কঠিন হস্তে অবলীলাক্রমে জীবন দান করিয়াছেন। অন্তরে তাঁহারা যে এক বিশ্বতোমুখ প্রেম অনুভব করিয়াছেন সে বিষয়ে কোনো সন্দেহই হয় না। এ প্রেম কি সহজ! ইহা মহান্—সেইজন্য কি পূর্ব্ব কি পশ্চিম সকল দেশেই বাহাইগণ আদরের সহিত গৃহীত হইতেছেন।

বাহাইগণ এক ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন। ঈশ্বরের এই একত্ব হইতে তাঁহাদের সকল ঐক্যানুভূতি জাগ্রত হইয়াছে। এই একটি সত্যকে তাঁহারা এরূপভাবে অন্তরের সহিত একাত্ম করিয়া গ্রহণ করিয়াছেন যে কোথাও আর তাঁহারা বিচ্ছেদ দেখিতে পাইতেছেন না। তাঁহাদের চোখে বিশ্বের যা কিছু সমস্তই এক নিয়মাধীন —এক। বিশ্বরাজ্যের রাজা এক—তাঁহার প্রজাগণও এক—কোথাও আর পার্থক্যের লেশমাত্র নাই।

কিন্তু এই ঐক্যানুভূতিই যে বাহাইদিগের চরম লক্ষ্য তাহা নহে। তাঁহাদের প্রধান লক্ষ্য ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করা—ইঁহাদের সমস্ত শিক্ষার আসল দিক্‌টি ঈশ্বরের দিকে ফিরিয়া আছে। তাঁহারা চান—সত্যধর্ম্ম ; তাঁহারা চান সমগ্র মানবসমাজের সহিত ঐক্য রক্ষা করিয়া সকল মানবকে ভ্রাতার ন্যায় অনুভব করিয়া ধর্ম্ম-জীবন, সত্যজীবন যাপন করিতে। বাহাউল্লা এক স্থানে এইরূপ বলিয়াছেন যে, ঈশ্বরের জ্ঞান এবং ধর্ম্ম মানবের মধ্যে উপস্থিত হইয়াছে পৃথিবীর সকল মানবের মধ্যে ঐক্যসূত্র দৃঢ় হইবে বলিয়াই। কিন্তু এমনি আমাদের দুর্ভাগ্য যে আমরা ধর্ম্মকেই বিচ্ছেদের কারণ করিয়া তুলিয়াছি—ধর্ম্ম লইয়া আমরা কত বিরোধ রচনা করিয়াছি! এটি বাহাউল্লারই কথা—"সত্যধর্ম্ম এবং সত্যধর্ম্মের অনুশাসনগুলি, ঐক্যালোক পরিপূর্ণভাবে উজ্জ্বল করার প্রধান কারণস্বরূপ। ইহাই জগতের উন্নতির কারণ, জাতির উন্নতির কারণ, মানব-সমাজে শান্তির কারণ। কোনো ধর্ম্মকে সরাইয়া রাখিয়ো না বা তাহার প্রতি শত্রুভাবাপন্ন হইয়োনা। প্রত্যেক মানুষ আপন আপন শক্তিঅনুসারে ঈশ্বরের মহত্ত্ব উপলব্ধি করে।"

বাহাউল্লাকে একবার জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল— আপনার আগমনের উদ্দেশ্য কি, আপনার জীবনের উদ্দেশ্য কি ? তিনি উত্তর দিয়াছিলেন—তিনি পৃথিবীতে একটি কোনো নূতন নৈতিক উপদেশ প্রচার করিবার জন্য আসেন নাই, কারণ, সত্যমিথ্যা স্থির করিয়া লইবার শিক্ষা সকলেই পাইয়াছে। তাঁহার জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য জগতের সকল ধর্ম্ম-বিশ্বাসকে এবং সকল লোককে এক করা।

আজকালকার দিনে, যখন জাতিতে জাতিতে বিবাদ বিসম্বাদ লাগিয়াই আছে—এক জাতির সর্ব্বনাশ করিবার জন্য আর এক জাতি না করিতেছে এমন নির্দ্দয় কর্ম্ম নাই—এই বিদ্বেষধর্ম্মীগণের যুগে বাহাউল্লার প্রদত্ত শিক্ষা মরুভূমিতে বারিবর্ষণে ন্যায় তৃপ্তিপ্রদ।

বাহাইগণ সমগ্র জগৎকে এক প্রেমরাজ্যে পরিণত

দেখিতে চান এবং এই সাধনাই তাঁহাদের একমাত্র লক্ষ্য।

আব্দুল বাহা একস্থানে বলিয়াছেন—সেই অদৃশ্য পুরুষের অক্ষয় আলোক জগতে যে প্রকাশ পায় সে কেবল মানবাত্মার শিক্ষার জন্য, যাহা কিছু আছে সমস্তেরই উন্নতির জন্য, যাহাতে পার্থিব বস্তুতে রত মানবসন্তান ঈশ্বরের ধর্ম্মলাভে অগ্রসর হয়, মোহান্ধকারাচ্ছন্ন জীব জ্ঞানালোক প্রাপ্ত হয়, অশিক্ষিত মূঢ় স্বর্গরাজ্যের শিক্ষা লাভ করে তাহারই জন্য—অজ্ঞান জ্ঞাননির্ঝরের অমৃত পান করিতে পাইবে বলিয়া, বর্ব্বর তাহার হিংসাপ্রবণতা ত্যাগ করিবে বলিয়া, নির্দ্দয় সহিষ্ণু হইবে বলিয়া এবং অকরুণ পরমশান্তি লাভের পথে অগ্রসর হইবে বলিয়া।

শিক্ষাদান সম্বন্ধে বাহাউল্লা যে উপদেশ সকল প্রদান করিয়া গিয়াছেন তাহাতেও বিশেষত্ব আছে। তিনি বলিয়াছেন—সকল জ্ঞান ঈশ্বরের, অতএব তোমাদিগকে জ্ঞান শিক্ষা করিতেই হইবে। তিনি স্ত্রীপুরুষনির্ব্বিশেষে প্রত্যেক সন্তানকেই যতদূর সম্ভব সুশিক্ষা প্রদান করিয়া গড়িয়া তুলিবার জন্য বিশেষভাবে উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। বাব স্ত্রীপুরুষের সাম্য প্রচার করিতেন, বাহাউল্লাও তাহাই করিয়া গিয়াছেন। জীবিকা সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন—কেহই যেন ভিক্ষাবৃত্তি না করে; যে অবস্থার মধ্যেই জন্মগ্রহণ করুক না সকলেই যেন কোনো না কোনো ব্যবসায়, শিল্প কিম্বা অর্থকর কর্ম্মে নিযুক্ত থাকে এবং এরূপ কর্ম্মে ব্যাপৃত থাকে যাহা তাহার পক্ষে এবং সমাজের পক্ষে কল্যাণকর। এরূপে কার্য্য করিলে বর্ত্তমান কালের কত অসুবিধা যে দূরীভূত হয় তাহা একটুকু চিন্তা করিলেই বুঝা যায়। যে সকল প্রয়োজনসিদ্ধির জন্য আমরা ঈশ্বরের করুণায় শক্তিলাভ করিয়াছি আমরা আপনাদের সেই সকল প্রয়োজন আপনারাই মোচন করিয়া লইব এবং জনহিতার্থে শক্তি নিয়োগ করিয়া পরমপিতার দানের সার্থকতা সম্পাদন করিব ইহাই স্বাভাবিক। এইটি হইলেই মানবসমাজের অনেক বিশৃঙ্খলতা দূর হইয়া যায়। বাহাউল্লার এই উপদেশটি বর্ত্তমান যুগের বড়ই উপযোগী।

পুরোহিত এবং ধর্ম্মযাজকদিগের সম্বন্ধে তিনি বলিয়া গিয়াছেন যে এই শ্রেণীর লোকদের দ্বারাই ধর্ম্মবিশ্বাসে মিথ্যা সকল আনীত হইয়াছে। তিনি এই শ্রেণীর লোকদিগকে স্বীকার করেন নাই। স্ত্রী হোক পুরুষ হোক কেহই যেন সমাজ হইতে দূরে গিয়া সন্ন্যাস অবলম্বন করিয়া না থাকে তিনি এইরূপ শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন, কারণ সেরূপ জীবনে মানব অবশিষ্ট মানবগণের প্রতি তাহাদের কর্ত্তব্য করিতে পারেন না। সম্ভব হইলে সকলকেই বিবাহ করিতে উপদেশ দিয়াছেন এবং বলিয়াছেন বিবাহিত জীবনই শ্রেষ্ঠ। সকল প্রকারের দ্বন্দ্ব ও যুদ্ধ তিনি নিষিদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। এই নিষেধটি তিনি বার বার নানা প্রকারে বলিয়াছেন, কারণ তাঁহার শিক্ষা ভ্রাতৃভাবের শিক্ষা।

তিনি একস্থানে বলিয়াছেন—"জগতের একটি অতি কঠিন ব্যাধিই হইতেছে দ্বন্দ্ব-সংঘাত—ইহার অগ্নি সকল জাতির মধ্যেই জ্বলিতেছে, একমাত্র স্বর্গের বারীধারা, ঈশ্বরের বাণী ভিন্ন আর কিছুই ইহাকে নির্ব্বাপিত করিতে পারে না। এইজন্য যাঁহারা ঈশ্বরের পথে গমন করেন তাঁহাদের কর্ত্তব্য ঐক্য এবং যোগবন্ধনের পতাকাস্বরূপ হওয়া।"

বাহাউল্লা যে সত্যকে উপলব্ধি করিয়াছিলেন তাহাকে সারা পৃথিবীতে প্রচারিত করিবার জন্য তিনি আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। তিনি মহাপ্রেমিক ছিলেন, তিনি বলিয়াছেন,—"প্রেমই সেই চুম্বকশক্তি যাহাতে অন্তর এবং আত্মা আকৃষ্ট হয়; ঐশী শক্তির প্রকাশ অন্তরে অন্তরে আত্মায় আত্মায় এই প্রেমের ধারা প্রবাহিত করিবার জন্যই। আমরা তাঁহার ভৃত্য; আমাদিগকে সমস্ত শক্তি নিয়োগ করিয়া, আমাদের জীবন দিয়া এই বিশ্বপ্রেমকে জগতে প্রচারিত করিতে হইবে, জগৎকে এই প্রেমালোকে উদ্ভাসিত করিয়া প্রকৃত যাহা মনুষ্যত্ব তাহারই সুপ্রভাতের শুকতারার উদয়ের জন্য আপনাদিগকে সর্ব্বতোভাবে নিয়োজিত রাখিতে হইবে। প্রেমই মূল পদার্থ। এই-ই সত্য—অসামঞ্জস্য, রূঢ়তা, কঠোরতা এবং ঘৃণাই অসত্য। এই প্রেমকেই সাধন করিতে হইবে;—এ ধর্ম্ম কর্ম্মের ধর্ম্ম, শুধু বাক্যের ধর্ম্ম নহে।

"আমরা জগতের কল্যাণ কামনা করি এবং সকল জাতির সুখ প্রার্থনা করি। আমরা তাহাই চাই যাহাতে সকল জাতির বিশ্বাস এক হয় এবং সকল মানুষ ভ্রাতার ন্যায় বাস করে। আমরা তাহাই চাই যাহাতে মানবসন্তানের মধ্যে ঐক্যের বাঁধন দৃঢ় হয়, ধর্ম্মমতের পার্থক্য দূর হয়, জাতি সকলের মধ্যে ভেদ না থাকে, সকল মানুষ পরস্পরের প্রতি আত্মীয়ভাবাপন্ন হইয়া এক পরিবারস্থের ন্যায় বাস করে। আমি আমার দেশকে ভালোবাসি এইটুকু বলিয়াই যেন মানুষ গৌরব বোধ না করে। এই বলিয়া সকলে গৌরব বোধ করুন যে তাঁহারা মানবজাতিকে ভালোবাসেন।"

এই মহাপ্রেমিক মহাত্মার সকল শিক্ষারই প্রবর্ত্তক প্রেম এবং উদ্দেশ্য জগতের হিতসাধন। এই যে একটি সত্য ইঁহারা উপলব্ধি করিয়াছেন, ইঁহাদের সকল

কর্ম্ম ইহারই পথে চলিতেছে। প্রেম প্রচার করিয়া জগৎকে তাঁহারা একটি প্রেমরাজ্যরূপে দেখিতে চান ইহাই তাঁহাদের অন্তরের মহান্ আকাঙ্ক্ষা।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

মহবুবীধর্ম্ম।

মুসলমান ধর্ম্ম যখন ভারতবর্ষে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল তখন যে কোরাণপ্রতিপাদিত মহম্মদের খাঁটি ধর্ম্মই ভারতবর্ষে উপস্থিত হইল তাহা নহে। মুসলমান দেশে তাহার পূর্ব্বেই নানা সম্প্রদায় ও উপ-ধর্ম্মের সৃষ্টি হইয়াছিল, সেই গুলিও সেই সঙ্গেই ভারতে প্রবেশ লাভ করিল। আরবের মরু-বায়ু হইতে মুসলমান ধর্ম্ম যখন সরস ইরাণের উর্ব্বর ভাবপ্রবণ ভূমিতে পদার্পণ করিল তখন ইরাণবাসীর বিচিত্র চিন্তার সঙ্গে মিশিয়া সেই এক কঠিন ঋজু ধর্ম্মমত নানা ভাবে ও নানা রঙ্গে বিচিত্র হইয়া উঠিল। সাধারণ ধর্ম্মও এইরূপ কত বিচিত্রভাবে রূপান্তরিত হইল, তাহার তলে তলে আবার নানারূপ নিগূঢ় ভাব লইয়া নানা উপসম্প্রদায় গঠিত হইয়া উঠিল। তার সব গুলি যে পবিত্রতার হিসাবে বিশুদ্ধ ও ভাবের হিসাবে গভীর তাহা নহে। অনেক সম্প্রদায় অবশ্য খুব গভীর ধর্ম্মভাবে ও কঠোর সাধনায় আপনাদিগকে ধন্য করিয়া তুলিল কিন্তু ভাবপ্রবণ হৃদয়ের নানা দুর্ব্বলতা কতকগুলি সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মের সঙ্গে নানা ভাবে বেমালুম মিশিয়া যাইতে লাগিল।

ভালমন্দ এই সব সম্প্রদায় যে কেবল মূল ইস্লাম-ধর্ম্মকে মানিয়া লইয়াই গঠিত হইয়াছিল তাহা নহে। কতক কতক মত ও সম্প্রদায় মূল ইস্লামধর্ম্মের প্রতি-বাদের মতই গড়িয়া উঠিল। আরবের সেই অপেক্ষাকৃত রসহীন নৈতিক ও নিরাপদ ধর্ম্মকে লইয়া ইরাণের ভাবপ্রবণ চিত্ত পরিপূর্ণ হইল না তাই নানাবিধ ভাবের সম্প্রদায় গঠিত হইল। ইস্লামধর্ম্মের সম্মুখে দাঁড়াইয়া তাহারা ঘোষণা করিল—"প্রকৃত প্রেম অগ্নি-উপাসকেরা জানে, তাহাদের মন্দিরে আমি দীক্ষা লইব।" "মূর্ত্তি-পূজকেরা সেই নিগূঢ় প্রিয়তমের সন্ধান পাইয়াছেন, শুষ্ক তত্ত্ববিদ্গণ সেই প্রচ্ছন্ন দেবতার কোন্ তত্ত্ব জানেন?" "যথার্থ সংযম তো সুরাসেবীদের পায়ের তলার প্রাঙ্গণ, পেয়ালা আমার সংযমের গুরু, এ সব গুরুর কাছে মিথ্যা বাগ্‌জাল শুনিয়া ফল কি?" "তরুণীর গণ্ডস্থলকে নিন্দা করিব কোন্ সাহসে? আমার প্রেয়সীর দীপ্ত কপোলে যে চুম্বন করিয়াছে তাহার ওষ্ঠে অগ্নিমুদ্রা চিরকাল লাগিয়া থাকিবে, সে জ্বালা এ জন্মে মুছিবার নহে; এই তো ধর্ম্মের যথার্থ দীক্ষা।" "বৈরাগ্যের জন্য আমি বৈরাগী হই নাই, যে অবধি সেই নয়নের দিকে আমার নজর পড়ি-য়াছে, সেই অবধি আমার সব সুখ ও আরাম দগ্ধ হইয়া গিয়াছে। সাধ করিয়া বৈরাগ্য করা, সে কি আমি পারি?" "কাবার মন্দিরে যাঁহার দেখা পাইলাম না বাজারে তাঁহার দেখা মিলিল। আমি কহিলাম হে বন্ধু এখানে লুকাইয়া আছ কেন?' তিনি কহিলেন 'ওরে মূঢ় ধর্ম্মব্যবসায়ী; পাথরের মন্দির ফুটা করিয়া দরজা গড়িতে জান, আর মানুষের মন্দিরের মধ্যে যাইবার দ্বার তোমার নাই?' আমি হার মানিলাম।"

এই প্রকার এক মূল ইসলামধর্ম্মের নানা রূপান্তর ও প্রতিবাদী উপধর্ম্মসমূহ দেখিয়া একজন সাধক বলিয়াছেন, "এক দরিয়ার জল নানা ঘরের নানা রসে নানা সরবৎ ও সরাপ হইয়া গেল।"

এইরূপে এক ইরানেই অসংখ্য সম্প্রদায় ও উপসম্প্র-দায়ের আবির্ভাব হইল। ভারতে অনেক পরিমাণে সেই সব মতামত এবং শাখা ও সম্প্রদায় আসিয়া পড়িল। তা ছাড়া এই ভারতের উর্ব্বর রসপ্রধান ভূমিতে আসিয়াও যে কত নব নব ভাব ও মতের উৎপত্তি হইল তাহা বলা সুকঠিন। ভারতের গভীর বৈষ্ণবধর্ম্মের সহিত মিশিয়া মুসলমান সুফিধর্ম্মের যেমন অনেক ভাল ফল হইল তেমনি মাঝে মাঝে কুফলও ঘটিল। বেদান্তবাদের সঙ্গে মিশিয়া 'মতাজঙ্গী' প্রভৃতি নানা জ্ঞানপন্থী সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইল। এবং রস-পন্থী বৈষ্ণবদের সঙ্গে মিশিয়া আউলিয়া মরুমিয়া প্রভৃতি সরস ও গভীর সাধকসম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইল।

মহবুবী সম্প্রদায়টি যে কোথাকার তাহা বলা সুকঠিন। তবে কবীরের সময় ইহা ভারতে বিদ্যমান ছিল। ইহাদের আচার ব্যবহার ছিল, কতকটা দূষিত কর্ত্তাভজাদের মত। ঈশ্বরকে ইহারা প্রিয়তম বা 'মহবুব' বলিত। ইহাদের মধ্যে গুরু ঈশ্বরের স্থান লইয়াছিলেন, কাজেই গুরুও মহবুব। এবং এই সূত্রে মনুষ্যের যত নীচ প্রবৃত্তি সবগুলি আপনাদিগকে চরিতার্থ করিয়া লইল। ইহারা গুরুকে স্বামী বলিয়া যে সব কুৎসিতাচারে প্রবৃত্ত হইল তাহা ধর্ম্মার্থির পক্ষে বিষবৎ কিন্তু ধর্ম্মের নামেই তাহা চলিতে লাগিল। আজও আমাদের দেশে এইরূপ কত উপধর্ম্ম যে আছে তাহা গণনা করিয়া বলা অসম্ভব। আবার এই এক আশ্চর্য্য যে বহুতর শিক্ষিত ও কৃতবিদ্য লোক এই সব আচারের ও এতাদৃশ গুরুর প্রশংসা করিবার যথেষ্ট ভাষা খুঁজিয়া পান না।

এই মহবুবীধর্ম্ম প্রসঙ্গে মহাত্মা কবীরের একটি আলোচনা নীচে দিলাম।

ধর্ম্মদাস আসিয়া কবীরকে জিজ্ঞাসা করিলেন "হে সাধু, আপনি কি জানেন যে মহবুবী সম্প্রদায় কতদূর জঘন্য আচারে প্রবৃত্ত হইয়াছে। নানাবিধ বীভৎস আচার ধর্ম্মের নামে তাহারা চালাইতেছে।" কবীর বলিলেন

"জানি।" "আপনি তাহাতে বিস্মিত হন নাই?" "না।" "এ কিরূপ কথা?"

কবীর বলিলেন যে কোন বিষয় হইতে তাহার দেয়-টুকু আদায় করিবার পরেও তাহাকে যদি আবদ্ধ করিয়া রাখ, তবে সেই বিষয়েই বিকার সমস্ত সংসারকে বিষাক্ত করিয়া তুলিবে। এই যে অন্ন, ইহারও যেটুকু কৃত্য, তাহা সম্পন্ন করিয়া সে আর ভদ্র নহে। ধর্ম্ম জীবন্ত সত্য। প্রতিদিন যাহা বিকাশিত হইয়া উঠে তাহাতেই যথার্থ ধর্ম্মকে লাভ করিবে। যদি তুমি প্রতি দিনের উৎপদ্যমান ধর্ম্মকে গ্রহণ না করিয়া প্রাচীন সঞ্চয়ের দ্বারা দূরে ঠেকাইয়া রাখ তবে প্রাচীন সঞ্চয়ের বিকারকে গ্রহণ করিতে তুমি বাধ্য।

"এই রূপেই ধর্ম্ম বিকৃত হয় অথচ সেই বিকৃত ধর্ম্মকে আমরা গ্রহণ করি। করি কেন? না ধর্ম্মের জন্য আমাদের যে ক্ষুধা তাহা সত্য ক্ষুধা। এই বিকারকে গ্রহণ করিয়া আমরা মৃত্যুদণ্ডকে গ্রহণ করিতে হইলেও এই বিকারকে গ্রাস না করিয়া পারিব না। কারণ ক্ষুধা অন্ন চায়।

ক্ষুধার্ত্ত দুর্ভিক্ষগ্রস্ত লোক ক্ষুধার তাড়নায় মৃৎপিণ্ড আহার করিতে বাধ্য হয়, যদিও তাহাতে তাহার কোন পুষ্টি নাই, অভক্ষ্য ভোজন করিতে বাধ্য হয়, যদিও তাহাতে তাহার ধ্রুব মৃত্যু। মৃত্যুর দ্বারা জীবন ক্ষুধার যথার্থ ঘোষণা করিয়া যায়। মরণের দ্বারা সে বলে "হে ক্ষুধা, তুমি আছ। তুমি সত্য, তুমি জাজ্বল্যমান তুমি নিশ্চয় আছ। মৃত্যু দ্বারা আমি ইহা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সম্মুখে চিৎকার করিয়া ঘোষণা করিয়া গেলাম।" মৃত্যু এইরূপেই ক্ষুধার সত্য সত্তাকে ঘোষণা করিয়া যায়। মৃত্যুও যে ঘোষণা করিতে পারে তাহাতে বিস্মিত হইও না; একবার আমি মরুভূমির পথে এক সাধুর সাধন-ধাম দেখিতে গিয়াছিলাম। রাত্রিতে আমরা পথ হারাইলাম। অনেক দূর ব্যর্থ পর্য্যটনের পর 'হাদী' (পথ-প্রদর্শক) বলিল "মহাশয় এখন রাত্রি, বৃথা ঘুরিয়া এখন কোন ফল নাই, যথার্থ পথ হইতে ক্রমশই দূরে যাইতেছি, অতএব এখানেই অপেক্ষা করি; প্রভাতে পথ দেখা যাইবে। প্রভাত হইল, পথ কোথায়? চলিতেছি আর চলিতেছি, হঠাৎ 'হাদী' চিৎকার করিয়া বলিল মিলিয়াছে, মিলিয়াছে। "কি মিলিয়াছে?" "পথ মিলিয়াছে।" "কেমন করিয়া বুঝিয়াছ যে পথ মিলিয়াছে?" হাদী বলিল যে, মহাশয় উষ্ট্রের কঙ্কালরাজি দেখা গিয়াছে।" আমি ভাবিলাম, "এ কি আশ্চর্য্য! জীবন্ত হাদী যেখানে পথ দেখাইতে অসমর্থ সেখানে মৃত 'হাদী' দেখাইল পথ! ভূতকালের মৃত্যু বর্ত্তমান জীবন্তের কাছে ভবিষ্যতের গতি নির্দ্দেশ করিয়া দিল! হে সত্য তুমি আশ্চর্য্য! আশ্চর্য্য তোমার নির্দ্দেশবিধি!"

উষ্ট্রদল যে চলিয়াছিল তাহাদের সম্বল যখন ফুরাইল তখন তাহারা সেই সত্য পথের পার্শ্বে প্রাণত্যাগ করিল। উহারা মৃত্যুদ্বারা ঘোষণা করিল "হে 'রাহ' (পথ) তুমি সত্য, আমার সম্বল অল্প আমি তাই শেষ পর্য্যন্ত পৌঁছিতে পারিলাম না। কিন্তু আমার মৃত্যু দ্বারা অনন্ত ভবিষ্যতের জীবনের কাছে ঘোষণা রাখিয়া গেলাম— "পথ এই, এই পথ, অন্য পথ নাই। দুঃখের দ্বারা আচ্ছন্ন হইলেও এই পথ, ক্ষতি দ্বারা আচ্ছন্ন হইলেও এই পথ, মৃত্যু দ্বারা আচ্ছন্ন হইলেও এই পথ, অন্যপথ নাই, অন্য পথ নাই; জীবন দান করিয়া অনন্তের চিহ্নহীন বুকের উপর এই চিৎকার রাখিয়া গেলাম।"

শ্রীক্ষিতিমোহন সেন।

ভারত সন্তান।

অন্তর মাঝে যত বাঁকা আছে
করেছে যে তারে সোজা,
চিন্তার মাঝে যত আঁকা আছে
ফেলেছে যে তার বোঝা,
শূন্য হইতে পূর্ণ আসিয়া
করেছে যাহাতে বাস,
আগু পাছু আর বাধা নাহি যার
মুক্ত চিন্তাকাশ,
শ্রেয়ের সাধনা, শ্রেয় আরাধনা
জাগিছে যাহার প্রাণে,
উন্মুখ হয়ে ভারত তাকায়ে
রয়েছে তাহার পানে।
সুখ দুখ যারে পরশিতে নারে
ভয়ের নাহিক লেশ,
সারা ধরণীর রাজা হয়ে যীর
ধরে যে ফকির বেশ,
হেলায় তুচ্ছ করে যে রাজ্য,
বীর্য্য যাহার দানে,
উন্মুখ হয়ে ভারত তাকায়ে
রয়েছে তাহার পানে।
কিবা জাতি নাম কোথা তার ধাম
নাহিক তাহাতে কাজ,
হেন সন্তানে আপনার জেনে
বরিবে ভারত আজ।
দেখাবে ভারত, চরম লক্ষ্য
রেখেছে মোক্ষ পানে,
জগৎপূজ্য তাহার কার্য্য
জগৎবাসী তা জানে।

২২শে আশ্বিন। শ্রীহেমলতা দেবী।

ব্রহ্মবিদ্যালয়।

এই মাস হইতে শান্তিনিকেতন ব্রহ্মবিদ্যালয়ের সংবাদ ও সেখানকার ছাত্রগণের রচনা-প্রকাশের জন্য আমরা "ব্রহ্মবিদ্যালয়" নাম দিয়া তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার একটি স্বতন্ত্র বিভাগ রক্ষা করিব।—সম্পাদক।

আশ্রম কথা।

পূজাবকাশের পর গত ১৫ই কার্ত্তিক আশ্রম খুলিয়াছে। ছাত্রসংখ্যা ক্রমেই বাড়িতেছে। এবার প্রায় ১৭৫টি ছাত্র হইয়াছে।

শান্তিনিকেতনের দক্ষিণ সীমান্তে শালতরুশ্রেণীর দুই ধারে আশ্রমের কুটীরগুলি পশ্চিম হইতে পূর্ব্বদিকে বরাবর চলিয়া গিয়াছে। কুটীরগুলি প্রশস্ত লম্বা ঘর, মেজে বাঁধান, উপরে খড়ের কিম্বা টালির ছাদ। প্রায় প্রত্যেকটিতেই ২০।২৫টি করিয়া বিদ্যার্থী বাস করে। দুই সারি খাট এবং প্রতি খাটের নিকটে দেয়ালের সঙ্গে সংলগ্ন পুস্তক রাখিবার একটি তাক, ইহা ভিন্ন অন্য কোন আসবাববাহুল্য কোন কুটীরেই নাই। প্রায় প্রত্যেক শয়নস্থানেরই উভয় দিকে লম্বা জানালা ও দরজা আছে। উত্তর দক্ষিণ খোলা, কোন কোন কুটীরে পূবপশ্চিমও খোলা। আলো, বাতাস অপর্য্যাপ্ত।

দ্বিপ্রহরে ক্ষণকালের জন্য বিশ্রাম ও রাত্রে শয়নের সময় ভিন্ন অন্য সময়ে বিদ্যার্থীগণ কুটীরে বড় একটা থাকেন না। আশ্রমে চারিদিকে বড় বড় ছায়াময় গাছ— আম, জাম, বকুল, মহুল, নিম, পেয়ারা, শেফালি ও দেবদারুবীথিকা—ছেলেরা নিজের হাতে সেই সকল বৃক্ষনিম্নে বেদিকা রচনা করিয়াছে। বর্ষাকাল এবং উত্তপ্ত গ্রীষ্ম-মধ্যাহ্ন ব্যতীত অন্য সকল সময়েই সেই তরুচ্ছায়া-তলে ক্লাস বসে। প্রভাতে প্রাতঃকৃত্য, স্নান, উপাসনা, প্রাতরাশ ও মন্ত্রোচ্চারণের পরেই ক্লাস বসে, প্রায় ৭॥০টার সময়; দ্বিপ্রহরে আহারের পর কিছুকাল বিশ্রামান্তে পুনরায় ক্লাস বসে এবং বৈকালের জলযোগের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ক্লাস চলিতে থাকে। সুতরাং কুটীরে বাস অপেক্ষা প্রকৃতির সহবাস ছাত্রদিগের অধিক পরিমাণে ঘটিয়া থাকে।

প্রভাতে অপরাহ্নে বালকগণ এই কুটীরগুলি নিজের হাতে ঝাঁট দেয়, ও নিজ নিজ স্থান পরিপাটীরূপে পরিচ্ছন্ন করিয়া রাখে। জিনিসপত্রের কোন বাহুল্য না থাকায়, ঘরগুলি সুন্দর ঝরঝরে দেখায়। প্রত্যেক কুটীরেই বালকদিগের ভার গ্রহণ করিয়া একজন অধ্যাপক থাকেন।

ছাত্র বাড়িয়া যাওয়াতে কর্ম্মের সুবিধার জন্য ছাত্রগণকে তিন ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে,—আদ্য,মধ্য এবং শিশু। ইহাদের স্বতন্ত্র আবাসস্থান। যাহারা উচ্চশ্রেণীতে পড়ে এবং বয়সও যাহাদের তের চৌদ্দের বেশী, তাহারা আদ্যবিভাগের অন্তর্গত। তার নীচের বয়সের ছেলেরা মধ্যবিভাগে এবং শিশুরা শিশুবিভাগে থাকে। বিভাগের পরিচালনার জন্য অধ্যাপকগণ প্রতি বিভাগেই এক বৎসরের মত এক একজন অধ্যক্ষ নির্ব্বাচন করিয়া থাকেন। কুটীরে কুটীরে যে অধ্যাপকগণ থাকেন, তাঁহারা ইঁহাদিগের নির্দ্দেশানুসারে কার্য্য করিয়া ইঁহাদিগকে সাহায্য করিয়া থাকেন।

সমস্ত আশ্রমের একজন অধ্যক্ষ প্রতি বৎসরে নির্ব্বাচিত হইয়া থাকেন। আশ্রমসম্বন্ধীয় সকল বিষয়েই তাঁহার কর্তৃত্ব থাকে। তাঁহার সঙ্গে পঞ্চজন সভ্যবিশিষ্ট একটি কার্য্যনির্ব্বাহক সভা আছে। এই সভার সভ্যগণও প্রতি বৎসরে নির্ব্বাচিত হইবেন।

প্রতি কুটীরের ছাত্রগণ নিজেদের চালনার ভার নিজেরাই গ্রহণ করিয়া থাকে। তাহারা নিজেদের মধ্য হইতে একজন নায়ক নির্ব্বাচন করে এবং সর্ব্ববিষয়েই তাহার আদেশ পালন করিয়া থাকে। এই নায়কের সঙ্গে দুই তিনটি করিয়া সহকারী থাকে—তাহারাও নির্ব্বাচিত হয়। বিচারের ভার নায়কের হাতে। তবে গুরুতর কোন অপরাধ কোন ছাত্রের ঘটিলে ইহারা ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপককে তাহা জানায় এবং তিনিই তখন তাহার বিধান করিয়া দেন্। কথায় কথায় নালিশ এবং ছোটখাট কলহ এ বিদ্যালয়ের বালকদিগের মধ্যে বিরল। তাহারা সংগচ্ছধ্বং সংবদধ্বং—একসঙ্গে চলে, একসঙ্গে বলে— কেহ কাহাকেও কোন বিষয়ে অতিক্রম করিয়া চলে না। পব্লিক-ওপিনিয়নের দ্বারা ছাত্রদের ত্রুটি অন্যায় ক্রমে ক্রমে সংশোধিত হইয়া আসে, তাহার জন্য বিশেষ কোন ব্যবস্থা বা বিধানের আবশ্যক করে না। বাস্তবিক ছাত্রদের সাহচর্য্য, সৌহার্দ্দ ও ভ্রাতৃভাব খুবই দেখিবার বিষয়।

এখানে যে সকল অধ্যাপক আছেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই কোন না কোন অধ্যয়নে বা জ্ঞানানুশীলনে নিযুক্ত আছেন। কেহ সাহিত্য, কেহ দর্শন, কেহ বিজ্ঞান, ইত্যাদি নানা বিষয়ে অনুশীলন করিতেছেন। নিয়ত তাঁহাদের সহবাসলাভ করিবার জন্য তাঁহারা সর্ব্বদাই ছাত্রদের চিত্তকে নানা প্রকারে উদ্বোধিত করিবার চেষ্টা করেন বলিয়া ছাত্রগণের মধ্যেও সকল বিষয়েই উৎসাহ আপনা আপনি জাগিয়া উঠে। ছাত্রেরা হাতে লিখিয়া

মাসে মাসে কাগজ বাহির করে, কবিতা লেখে, ছবি আঁকে সভা সমিতি করে এবং বড় বড় বিষয়েও অনেক সময় আলোচনা করিয়া থাকে ;—অবশ্য বিষয়ের গাম্ভীর্য্যের অনুরূপ তাহাদের আলোচনা হওয়া সম্ভবপর নহে ;—তথাপি এরূপ চেষ্টা এ বিদ্যালয়ে পরিহাসের দ্বারা অঙ্কুরেই বিনাশ প্রাপ্ত হয় না। বিদ্যালয়ের অধ্যাপকগণ বড় জিনিষ সম্বন্ধে অধিকারী অনধিকারী ভেদ করেন না, কারণ তাঁহারা জানেন যে আলো-জল-অন্ন-বাতাসের ন্যায় বড় সত্যকেও শিশু আপনারি ক্ষুদ্র শক্তিঅনুসারে আপনার করিয়া লয়,—এক রকম স্বপ্নাভাবে অস্পষ্টভাবে সে তাহাকে বোঝে, যাহা উত্তরকালে তাহার মনের পরিণতির পক্ষে যথেষ্ট সহায়তা করে।

সন্ধ্যাবেলায় বিশ্রামকালে বয়স্ক পরীক্ষার্থী বালক ব্যতীত আর সকলকেই অধ্যাপকগণ পালাক্রমে একত্র করিয়া নানারকম গল্প বলিয়া থাকেন। ইতিহাস, পুরাণ, সাহিত্য, ভ্রমণবৃত্তান্ত, জ্যোতির্বিজ্ঞান, কিছুই বাদ যায় না। স্কট, ভিক্টরহ্যুগো ডিকেন্‌সা প্রভৃতির উপন্যাস ও বলা হয়। সঙ্গীত হয়, আবৃত্তি ও অভিনয় হয়। ছাত্রেরা নিজেরা হেঁয়ালীনাট্য বানাইয়া কথনও কখনও স্বরচিত নাট্য অভিনয় করিয়া থাকে।

বুধবার এবং বৃহস্পতিবার শান্তিনিকেতন মন্দিরে বালকদিগকে লইয়া উপাসনা হয়। পূজনীয় আশ্রমগুরু শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় উপদেশ দিয়া থাকেন। তিনি অনুপস্থিত থাকিলে অধ্যাপকগণের মধ্যে কেহ কেহ ঐ কার্য্যের ভার গ্রহণ করেন। বৎসরে প্রায় অধিকাংশ সময়ই তিনি আশ্রমে বাস করিয়া থাকেন।

এইবার পড়াশুনা সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক। ইংরাজী বাংলা, অঙ্ক, সংস্কৃত, ইতিহাস, ভূগোল, অন্যান্য বিদ্যালয়ের ন্যায়শিক্ষা দেওয়া হয়; অতিরিক্ত কেবল বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া হয়। যে ছাত্র যে বিষয়ে যতদুর অগ্রসর হইয়াছে তাহাকে ঐ বিষয়ে তদনুরূপ বর্গে ভর্ত্তি করিয়া শিক্ষা দেওয়া হয়। প্রত্যেক বিষয়েই ১০।১২ টি করিয়া বর্গ আছে। ইংরাজী ভাষা প্রথমে মুখে মুখে কথাবার্ত্তা কহিয়া, পরে অল্পে অল্পে ছোট ছোট বাক্য রচনা করাইয়া ক্রমে জটিল বাক্য রচনা করাইতে শিখানো হয়, এবং সুখপাঠ্য গদ্য-পদ্য-সম্বলিত পুস্তক পড়ানো হয়। বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে ছাত্রদিগকে অল্প বয়স হইতেই পরিচয় সাধন করাইয়া দেওয়া হয়। তাহাদের কল্পনাশক্তি, বিচারশক্তি যাহাতে বাড়ে এরূপ পুস্তক পড়ানো হয় এবং যাহা তাহারা বুঝে তাহা কতটা স্বাধীন ভাবে নিজে লিখিতে পারে তাহাও দেখা হয়। উপরের শ্রেণীতে বাংলা ভাষা ছাত্রগণ ব্যাকরণের নিয়মে শিক্ষা করে। ইতিহাস নীচের ক্লাস হইতেই মুখে গল্পের মত বলা হয় এবং ছেলেদের দ্বারা বলানো হয়। ভারতবর্ষের সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীনকালের ও ইউরোপীয় দেশ সমূহের ঐতিহাসিক গল্প বলা হইয়া থাকে। ভূগোল, বৃত্তান্ত এবং বিজ্ঞান এই উভয়দিক্ হইতেই পড়ানো হয়। বিজ্ঞানও প্রথমে পর্য্যবেক্ষণ হইতে সুরু করিয়া ক্রমে ল্যাবরেটরিতে পদার্থবিজ্ঞান ও রসায়ণ পড়ানো হইয়া থাকে। বিদ্যালয়ের ল্যাবরেটরিটি মন্দ নয়। পুস্তকালয়ও সুবৃহৎ। প্রতি বিষয়েই মাসিক পরীক্ষা গৃহীত হইয়া থাকে। ড্রয়িংও এ বিদ্যালয়ে শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে।

শান্তিনিকেতনে জীবহিংসা নিষিদ্ধ। বালকগণ নিরামিষ খাইয়া থাকে বলিয়া এখানে একটি গো-মহিষশালা আছে। অনেকগুলি গো-মহিষ আছে, দুইটি বৃষ আছে। গো-মহিষ বৎসগুলি ক্রমে বাড়িয়া উঠিতেছে। আশ্রমে তাহারা সমস্ত দিন চরিয়া বেড়ায়। কিয়ৎ পরিমান দুধ হইতে প্রত্যহ মাখম তুলিয়া ঘি করা হয় এবং তাহা পাতে খাইতে দেওয়া হইয়া থাকে। প্রত্যহ দুই মনের উপর দুধ হয়। আমেরিকা-প্রত্যাগত কৃতবিদ্য শ্রীযুক্ত সন্তোষচন্দ্র মজুমদার এই গো-শালার অধ্যক্ষ। এই গোপালনবিদ্যাই তিনি বিশেষভাবে শিক্ষা করিয়া আসিয়াছেন।

মোটের উপর ছেলেরা এখানে আনন্দে থাকে। ঋতুতে ঋতুতে তাহাদের উৎসব হয়, তাহারা সঙ্গীত, অভিনয় প্রভৃতির দ্বারা ঋতুর সম্বর্দ্ধনা করিয়া থাকে। তাহারা বাহিরে পড়ে,—তরু-সোদর ও লতা-ভগিনীদের সঙ্গে গায়ে গায়ে মিশিয়া থাকে। গানে, গল্পে, পড়ায় খেলায়ধূলায় আমোদেপ্রমোদে, তাহাদের আনন্দে দিন কাটে। তাহাদের এই আনন্দই আশ্রমের সকলের চেয়ে বড় লাভ।

বিফলতা।

ওগো বিশ্বভূপ,
আমি কেমনে নেহারি এ নয়নে তব
নয়ন-মোহন রূপ ?
রুদ্ধ আমার সব গৃহ দ্বার
অন্ধ বদ্ধ এযে কারাগার !
যেদিকে নেহারি সকলি আঁধার ;
হৃদয় অন্ধকূপ !

আমি কেমনে করিব পান
যে অমৃত তুমি আকাশে বাতাসে
নিত্য করিছ দান ?

অসার রসনা হারায়েছে স্বাদ,
যাহা করে পান সবি বিস্বাদ,
অন্তরে বাহিরে চলিছে বিবাদ
জীবন ক্লান্ত ম্লান!

আমি কেমনে গাহিব গান?
বাক্‌হারা আজি কণ্ঠ আমার
ক্লিষ্ট এ দেহ প্রাণ!
জয়গান তব গগন ভরিয়া,
উঠেছে ভক্ত-কণ্ঠ চিরিয়া,
আমি হেথা আজি জীবনে মরিয়া
রয়েছি নীরব ম্লান!

আমি কেমনে শুনিব কথা?
বধির! বধির! কর্ণকুহর,
চারিদিকে নীরবতা।
উধার বাতাস করে যায় কত,
'জাগো জাগো জাগো যারা আছ মৃত,'
(তবু) অলস শয়নে আছি হে নিয়ত,
শুধু লয়ে বিফলতা!

শ্রীসোমেন্দ্রচন্দ্র দেববর্ম্মা।

জৈন সম্প্রদায় ও তাহাদের মন্দির।

ভারতবর্ষে অনেক রকম ধর্ম্ম আছে। তাহাদের মধ্যে জৈন ধর্ম্ম একটি। জৈন শব্দ 'জিন' হইতে উদ্ভূত। ইহার অর্থ 'জেতা'। এই শব্দ কেবল ২৪ জন জৈন মহাপুরুষের সম্বন্ধেই ব্যবহৃত হয়—তাঁহাদিগকে 'তীর্থঙ্কর' বলে। কারণ, নির্ব্বাণ যাইবার জন্য জন্মজন্মান্তরের সাগর তাঁহারা পার করান। এই মতটা অনেক পরিমাণে বৌদ্ধধর্ম্মের সদৃশ। হিন্দুধর্ম্ম হইতেই বৌদ্ধ এবং জৈন এই উভয় ধর্ম্মের উৎপত্তি। জৈনধর্ম্ম সম্ভবতঃ কিছু আগেকার।

পৃথিবীর যে একজন মহান্ স্রষ্টা আছেন তাঁহার অস্তিত্ব জৈনগণ একেবারেই অস্বীকার করে। এবং কয়েকজন উপদেষ্টাকেই তাহারা বিশেষ শ্রদ্ধার চোখে দেখে। বর্ণ, দৈর্ঘ্য ও পরমায়ু দেখিয়াই তাহারা ২৪ জন জিনকে পৃথক করিয়া লয়। প্রথম জিন ঋষভ, ৫০০ পোল লম্বা এবং তিনি ৮৪,০০,০০০ বৎসর জীবিত ছিলেন। তাঁহার পরবর্ত্তী জিনের বয়স ৭২,০০,০০০ বৎসর এবং তিনি ৪৫০ পোল লম্বা ছিলেন। এইরূপে পরবর্ত্তী জিনগণের বয়স ক্রমেই হ্রাস হইতে লাগিল। অবশিষ্ট দুইটি জিন পার্শ্বনাথ এবং মহাবীর মানুষের মতই পরমায়ু এবং আকার লাভ করিয়াছিলেন। মহাবীর বুদ্ধের সমসাময়িক বলিয়া অনেকেরি ধারণা।

মহাবীরের জীবন এবং জন্মবৃত্তান্ত বুদ্ধদেবেরই জীবন ও জন্মবৃত্তান্তের মত। মহাবীরের পিতা সিদ্ধার্থ কাণ্ড-গ্রামের প্রধান ছিলেন; তাঁহার মাতা ত্রিশালা, বৈশালীর রাজা কেতকের ভগিনী ছিলেন। মহাবীরের জন্মদিনের রাত্রে নাকি স্বর্গীয় দেবগণ নীচে নামিতে ও উপরে উঠিতে লাগিলেন এবং এক অপরূপ দিব্যজ্যোতিতে পৃথিবী একেবারে আলোকিত করিয়া ফেলিলেন। এই সকল দেবতাগণের সঙ্গমে বিষম সমারোহ উপস্থিত হইল। মহাবীর ২৯ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত বাড়ীতেই রহিলেন। এবং সোনা রূপা ইত্যাদি সমস্ত দরিদ্রদিগকে বিতরণ করিয়া দিলেন। পরে গৃহত্যাগী হইয়া অরণ্যে ভ্রমণ করিতে বাহির হইলেন। তিনি পাঁচ মুঠায় তাঁহার মাথার সব চুল উঠাইয়া ফেলিলেন। এক বৎসর তিনি কাপড়ের ব্যবহার ছাড়িয়া জঙ্গলে উলঙ্গাবস্থায় ঘুরিতে লাগিলেন। বারো বৎসর পরে মহাবীর রীতিমত একজন জিন হইয়া উঠিলেন। তিনি ৭২ বৎসর বয়সে নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হন। বুদ্ধদেব গভীর চিন্তার ভিতর দিয়া 'বুদ্ধ' এবং মহাবীর শারীরিক কৃচ্ছ্র-সাধনার ভিতর দিয়া 'জিন' হইতে পারিয়াছিলেন।

জৈনগণ দুই প্রধান সম্প্রদায়ে বিভক্ত। তাহাদের একটা বদ্ধমূল ধারণা যে, যেখানে লজ্জা সেইখানেই পাপ প্রবেশ করিয়াছে। পৃথিবীতে পাপ না থাকিলে লজ্জাও থাকিত না। সুতরাং তাহারা অদ্ভুত যুক্তিদ্বারা প্রচার করিল যে কাপড় ইত্যাদি হইতে মুক্ত হইতে পারিলেই পাপ হইতেও মুক্ত হইতে পারা যায় এবং যে সন্ন্যাসী পাপ হইতে মুক্ত হইতে ইচ্ছা করেন তাঁহাকে উলঙ্গ হইয়া থাকিতে হইবে। ইহাদের নাম 'দিগম্বর সম্প্রদায়'।

কালক্রমে উক্ত মতটিকে খণ্ডন করিবার জন্য পরে একটি সম্প্রদায় দাঁড়াইল—এই সম্প্রদায়ের নাম 'শ্বেতাম্বর সম্প্রদায়'। খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর পূর্ব্বে এই বিচ্ছেদ ঘটে—ইহা অনেকেরই ধারণা। উলঙ্গ জিনগণের প্রতি-মূর্ত্তি সংরক্ষণে তাহাদের ঘোরতর আপত্তি—সুতরাং শ্বেতাম্বর-সম্প্রদায় মূর্ত্তিগুলির কিয়দংশে একখণ্ড বস্ত্র জড়াইয়া দিত। শ্বেতাম্বর-সম্প্রদায় তাহাদের স্ত্রীগণকে সন্ন্যাসিনী হইতে অনুমতি দেয়—পক্ষান্তরে, দিগম্বর-সম্প্রদায় স্পষ্ট করিয়া এইরূপ অনুমতি দেয় না। আজকাল দিগম্বরগণ বিচিত্র রঙের বস্ত্র পরিধান করে, কেবল আহারের সময় বস্ত্র ব্যবহার করে না।

জৈনগণ যতী (সন্ন্যাসী) ও শ্রাবক (গৃহস্থ) এই দুই ভাগে বিভক্ত। যতীকে সংযমের জীবন যাপন করিতে হইবে; এবং যাহাতে কোন কীট পতঙ্গ তাহার মুখে আসিয়া উড়িয়া না পড়িতে পারে সেইজন্য একটি পাতলা

আচ্ছাদন দ্বারা তাহার মুখটিকে আচ্ছাদিত করিয়া রাখিতে হইবে। যে স্থানে সে বসিবে সে স্থানটিকে উত্তমরূপে ঝাঁট দিবার জন্য তাহাকে একটি সম্মার্জনী বহন করিয়া লইতে হইবে এবং প্রত্যেক সজীব প্রাণীকে বিপদ হইতে উদ্ধার করিতে হইবে। কিন্তু সে ইচ্ছা করিলেই সমস্ত পূজা অর্চনা ত্যাগ করিতে পারিবে।

শ্রাবককে ধর্ম্ম ও নৈতিক কর্ম্ম তো পালন করিতে হইবেই—তা'ছাড়াও তাহাকে মহাপুরুষদের পূজা করিতে হইবে এবং তাহাদের ধার্ম্মিক ভ্রাতাগণের প্রতি গভীর সম্মান প্রদর্শন করিতে হইবে। উদারতা, ভদ্রতা, দয়া-দাক্ষিণ্য এবং অনুশোচনা (প্রায়শ্চিত্ত) এই চারিটি পুণ্য-কর্ম্মও তাহাকে পালন করিতে হইবে। বৎসরের কোন কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ে পুষ্প আঘ্রাণ, লবণ, কাঁচা ফল, গাছের শিকড়, মধু ও দ্রাক্ষা ভক্ষণ এবং তামাক সেবন হইতে তাহাকে বিরত থাকিতে হইবে। যে জল তিনবার পরিস্রুত করা হইয়াছে তাহাই পান করিতে হইবে এবং তরল পদার্থ অনাচ্ছাদিত রাখিবে না, কারণ কীট পতঙ্গ জলে পড়িয়া যদি প্রাণ হারায় তবে উহা মহাপাপ বলিয়া গণ্য হইবে। যেখানে জৈন মহাপুরুষগণের প্রতিমূর্ত্তি স্থাপিত হইয়াছে সেই মন্দির পর্য্যন্ত তাহাকে তিনবার করিয়া প্রতিদিন হাঁটিতে হইবে। ভক্তি ও শ্রদ্ধার সঙ্গে প্রণাম করিয়া ফলফুল মূর্ত্তিকে উপহার দিতে হইবে—ইহাও তাহার দৈনিক কর্ত্তব্য কর্ম্মের অন্তর্গত। জৈনমন্দিরের পাঠক একজন যতী। ব্রাহ্মণ পুরোহিত কদাচিৎ-ই আছে—কারণ জৈনদের নিজের কোন পুরোহিত নাই। জৈন মহাপুরুষদের চিহ্ন রক্ষা করিবার জন্য কোনও স্তূপ নাই। প্রত্যেকের যে পৃথক পৃথক আত্মা তাহা তাহারা বিশ্বাস করে—পক্ষান্তরে, বৌদ্ধগণ আত্মার অস্তিত্ব একেবারেই অস্বীকার করে। জৈনদের মতে কাষ্ঠে, মৃত্তিকায়, পাথরে, জলবিন্দুতে, অগ্নিকণায় সকল স্থানেই আত্মা আছে।

ন্যায়-বিশ্বাস, প্রকৃত জ্ঞান ও যথার্থ আচরণ—ইহাই জৈনদের 'ত্রি-রত্ন'—কিন্তু বৌদ্ধদিগের—বুদ্ধ, সঙ্ঘ এবং ধর্ম্ম এই তিনটি 'ত্রি-রত্ন।' পঞ্চম জৈনের উপদেশ এই যে—"পার্থিব বিষয়ে কোন প্রকার আসক্তি রাখিবে না।"

জৈনদের উপাসনার মন্ত্র বৌদ্ধদিগের মন্ত্র হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। "অর্হত, সিদ্ধ, আচার্য্য, উপাধ্যায় এবং সমস্ত সাধুগণকে পূজা কর"—ইহা জৈনদের উপাসনার মন্ত্র।

সার মনিয়র উইলিয়মস্ সাহেব ভাবেন যে জৈনধর্ম্ম ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের স্রোতের মুখে পড়িয়া ক্রমেই ভাসিয়া যাইতেছে কারণ ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম জৈনধর্ম্মকে চারিদিকেই বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে এবং ইহাকে সর্ব্বদাই আকর্ষণ করিয়া টানিয়া আসিতেছে। রাজপুতানা এবং পশ্চিম ভারতে গত ১৯০১ খৃষ্টাব্দে জৈনদের লোকসংখ্যা ১৩,৩৪,১৪৮ জন ছিল কিন্তু কয়েক বৎসরেই ৮২,৪৯০ লোকসংখ্যা হ্রাস হইয়াছে দেখা যায়।

এতক্ষণ কেবল জৈনধর্ম্ম সম্বন্ধেই আলোচনা করিয়া আসিয়াছি—এখন কয়েকটি মাত্র প্রধান প্রধান জৈন-মন্দিরের উল্লেখ করিয়াই এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

কলিকাতা হইতে প্রায় ২০০ মাইল উত্তর পশ্চিমে পার্শ্বনাথ পর্ব্বত অবস্থিত। ইহাই বাংলা-দেশে পবিত্র জৈন পর্ব্বত বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছে। জৈনগণ বলে যে তাহাদের ২৪ জনের তীর্থঙ্কর মধ্যে ১০ জন এই পবিত্র পর্ব্বতে নির্ব্বান প্রাপ্ত হন্। এই জন্যই ত্রয়োবিংশ তীর্থঙ্কর পার্শ্বের নামানুসারে এই পর্ব্বতের নাম পার্শ্বনাথ রাখা হইয়াছে। কথিত আছে যে ১৯ জন তীর্থঙ্করকে এখানে সমাধি দেওয়া হইয়াছে। এই সকল মন্দির হয় খুব আধুনিক নতুবা জীর্ণ মন্দিরগুলি পুনরায় সংস্কার করা হইয়াছে। তাহাদের মধ্যে কতকগুলি ভারি চমৎকার। বিশেষতঃ সাদা মার্ব্বেল প্রস্তরে নির্ম্মিত একটি ছোট মন্দির দেখিতে খুব সুন্দর! ইহার নির্ম্মাণ-কল্পে ৮০,০০০ মুদ্রা ব্যয়িত হইয়াছিল।

গোয়ালিয়রে আরেকটি 'শ্যামবাহু' নামে মন্দির আছে। কথিত আছে যে এই মন্দিরটি ষষ্ঠ তীর্থঙ্কর পদ্মনাভের নামে উৎসর্গ করা হইয়াছিল। ইহা ১০৯৩ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত হয়—এরূপ অনেকেই অনুমান করেন। এখন আর ইহার বিশেষ কিছুই অবশিষ্ট নাই—কেবল একটি ক্রুশাকৃতি খোলা বারান্দাই দণ্ডায়মান রহিয়াছে। এই বারান্দা ১০০ ফুট লম্বা ও উহার পার্শ্ব বাহুসহ ৬৩ ফুট চওড়া। অবশিষ্টটির কেবলমাত্র ভিত্তিটাই রহিয়াছে। ত্রিতল বারান্দাটি মোটের উপর উত্তমরূপেই সংরক্ষিত হইয়াছে কিন্তু ইহার ছাদটি অনেকখানি ভাঙ্গিয়া গেছে। উপরিভাগে মনুষ্যাকৃতি, নানা জন্তুর প্রতিকৃতি, পুষ্প এবং নানাপ্রকার সুন্দর রেখাচিত্র খোদাই করা আছে। মধ্য কক্ষটির আয়তন প্রায় ৩০ বর্গ ফুট। চারিটি প্রকাণ্ড স্তম্ভ ইহার পিরামিড্-আকৃতি ছাদ্‌টাকে বহন করিয়া রহিয়াছে। ইহা বিশেষভাবে সজ্জিত।

'আবু' নামে রাজপুতনাতে একটি প্রসিদ্ধ পর্ব্বত আছে। ভারতবর্ষে যত জৈন মন্দির আছে তন্মধ্যে আবুর মন্দিরগুলিই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। রেলওয়ে ষ্টেশন হইতে প্রায় ১ মাইল দূরে দেউলওয়ারা নামে একটি স্থান—সেখানে সর্ব্বশুদ্ধ ৫ টি মাত্র জৈনদিগের ধর্ম্মমন্দির আছে। তাহাদের মধ্যে একটি সর্ব্বাপেক্ষা বড় ত্রিতল মন্দির—শুনা যায় তাহা নাকি ঋষভকে সমর্পণ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ঐ মন্দিরটির প্রধান প্রধান জায়গায় চারিটি

প্রবেশ-দ্বার (Gate) আছে। মন্দিরটির ভিতরে যে মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত তাহার চারিটি মুখ—সেই জন্য তাহাকে 'চৌমুখ' বলা হইয়া থাকে। এই চৌমুখের পশ্চিমপার্শ্বে আবুর আরো দুইটি সুন্দর মন্দির আছে। আবার ইহার উত্তরদিকেই আর একটি মন্দির আছে। উভয় মন্দিরই শ্বেত প্রস্তরে খচিত। এই প্রকার নানাস্থানে বড় বড় মন্দির দেখিতে পাওয়া যায়।

পালিতামা ষ্টেটের প্রধান সহর পালিতামা কাঠিবাড়ের উপদ্বীপের উপর অবস্থিত। ইহা শত্রুঞ্জয় পর্ব্বতের পূর্ব্বাংশে স্থাপিত—এবং কথিত আছে যে অপর চারিটি পবিত্র জৈন পর্ব্বত অপেক্ষা নাকি ইহাই পবিত্রতম।

শত্রুঞ্জয় পর্ব্বত সমুদ্র-পৃষ্ঠ হইতে ২০০০ ফুট্ উচ্চ। ঐ পর্ব্বতের উপর যে মন্দির প্রতিষ্ঠিত আছে সেখানে কয়েকজন যতী দৈনিক ক্রিয়া-কর্ম্ম সমাধা করিয়া রাত্রিতে ঐ মন্দিরেই শয়ন করেন। ঐ মন্দিরটি সর্ব্বদাই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিবার জন্য জনকতক লোক নিযুক্ত আছে।

তীর্থযাত্রী প্রত্যুষেই সেই মন্দিরে যাইবে এবং দেবতাকে পূজা উপহার দেওয়া হইলেই নীচে চলিয়া আসিবে, সে কখনো সেখানে রন্ধন কিংবা ভোজন করিতে পারিবে না। এবং সেই পবিত্র পর্ব্বতের উপর কেহ শয়নও করিতে পাইবে না, কারণ উহা কেবলমাত্র স্বর্গীয় দেবতাগণেরই জন্য নির্ম্মিত এবং উহা তাঁহাদেরই নগর।

ইহা ভিন্ন বহু আধুনিক মন্দিরও দেখিতে পাওয়া যায়।

শত্রুঞ্জয়ের পরই গির্‌নির কাঠিবাড়ের পশ্চিম অংশে অবস্থিত। জাগুরা সহর হইতে ১০ মাইল পূর্ব্বে। ঐ পর্ব্বতটি সমুদ্র-পৃষ্ঠ হইতে প্রায় ৩,৫০০ ফুট্ উপরে উঠিয়াছে।

পূর্ব্বে দক্ষিণ ভারতে অসংখ্য জৈন বাস করিত। তাহাদের তীর্থঙ্করের অনেক প্রতিমূর্ত্তি মৃত্তিকাগর্ভ হইতে পাওয়া গিয়াছে। কতকগুলি মান্দ্রাজ্ মিউজিয়মে রক্ষা করা হইয়াছে।

মহীশূরের কাছেই 'শ্রাবণ-বেল-গোলা' নামক একটি স্থানে অনেক সুন্দর সুন্দর জৈন মন্দির আছে। এবং পর্ব্বতের উপরে ৬০ ফুট্ উচ্চ এক প্রতিমূর্ত্তি আছে। উহা বহুদূর হইতে দেখিতে পাওয়া যায়। এই মূর্ত্তিটিই নাকি পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ।

চৈত্র ১৩১৪। শ্রীমনোরঞ্জন চৌধুরী।

ওঁ

একমেবাদ্বিতীয়ং

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

"ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্
সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া
পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।"

সম্পাদক

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

অষ্টাদশ কল্প

দ্বিতীয় ভাগ

১৮৩৪ শক

কলিকাতা

আদিব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে

শ্রীরণগোপাল চক্রবর্ত্তী দ্বারা

মুদ্রিত ও প্রকাশিত

৫৫, আপার চিৎপুর রোড্

সাল ১৩১৯। সম্বৎ ১৯৬৯। কলিগতাব্দ ৫০১২।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা

অষ্টাদশ কল্প, দ্বিতীয় ভাগ

বর্ণানুক্রমিক সূচীপত্র

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার অষ্টাদশ কল্পের দ্বিতীয় ভাগের সূচীপত্র

বৈশাখ ৮২৫ সংখ্যা ।

জ্যৈষ্ঠ ৮২৬ সংখ্যা ।

আষাঢ় ৮২৭ সংখ্যা ।

শ্রাবণ ৮২৮ সংখ্যা ।

ভাদ্র ৮২৯ সংখ্যা ।

আশ্বিন ৮৩০ সংখ্যা ।

কার্ত্তিক ৮৩১ সংখ্যা।

অগ্রহায়ণ ৮৩২ সংখ্যা।

পৌষ ৮৩৩ সংখ্যা।

মাঘ ৮৩৪ সংখ্যা।

ফাল্গুন ৮৩৫ সংখ্যা।

চৈত্র ৮৩৬ সংখ্যা।

একমেবাদ্বিতীয়ং

অষ্টাদশ কল্প

দ্বিতীয় ভাগ।

জ্যৈষ্ঠ, ব্রাহ্মসম্বৎ ৮৩

৮২৩ সংখ্যা — ১৮৩৪ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

"ব্রহ্মবা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্
সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া
পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যং সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।"

ছুটি।

কোলাহল ত বারণ হল,
এবার কথা কানে কানে।
এখন হবে প্রাণের আলাপ
কেবলমাত্র গানে গানে।
রাজার পথে লোক ছুটেছে,
বেচাকেনার হাঁক উঠেছে,
আমার ছুটি অবেলাতেই
দিনদুপুরের মধ্যখানে।
কাজের মাঝে ডাক পড়েছে
কেন যে তা কেই বা জানে!

মোর কাননে অকালে ফুল
উঠুক তবে মুঞ্জরিয়া।
মধ্যদিনের মৌমাছিরা
বেড়াক্ মৃদু গুঞ্জরিয়া।
মন্দ ভালোর দ্বন্দ্বে খেটে
গেছে ত দিন অনেক কেটে,
অলস বেলার খেলার সাথী
এবার আমার হৃদয় টানে।
বিনা কাজের ডাক পড়েছে
কেন যে তা কেই বা জানে!

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

রোগীর নববর্ষ।

আমার রোগশয্যার উপর নববৎসর আসিল। নব-বৎসরের এমন নবীন মূর্ত্তি অনেক দিন দেখি নাই।

একটু দূরে আসিয়া না দাঁড়াইতে পারিলে কোনো বড় জিনিষকে ঠিক বড় করিয়া দেখা যায় না। যখন বিষয়ের সঙ্গে জড়িত হইয়া থাকি তখন নিজের পরিমাণেই সকল জিনিষকে খাটো করিয়া লই। তাহা না করিলে প্রতিদিনের কাজ চলে না। মানুষের ইতিহাসে যত বড় মহৎ ঘটনাই ঘটুক্ না নিজের পেটের ক্ষুধাকে উপস্থিত-মত যদি একান্ত করিয়া না দেখা যায় তবে বাঁচাই শক্ত হয়। যে মজুর কোদাল হাতে মাটি খুঁড়িতেছে সে লোক মনেও ভাবে না যে সেই মুহূর্ত্তেই রাজা-মহারাজার মন্ত্রণা-সভায় রাজ্যসাম্রাজ্যের ব্যবস্থা লইয়া তুমুল আন্দোলন চলিতেছে। অনাদি অতীত ও অনন্ত ভবিষ্যৎ যত বড়ই হোক, তবু মানুষের কাছে এক মুহূর্ত্তের বর্ত্তমান তাহার চেয়ে ছোট নয়। এই জন্য এই সমস্ত ছোট ছোট নিমেষগুলির বোঝা মানুষের কাছে যত ভারি এমন যুগ-যুগান্তরের ভার নহে;—এই জন্য তাহার চোখের সামনে এই নিমেষের পর্দ্দাটাই সকলের চেয়ে মোটা;—যুগ যুগান্তরের প্রসারের মধ্যে এই পর্দ্দার স্থূলতা ক্ষয় হইয়া যাইতে থাকে। বিজ্ঞানে পড়া যায় পৃথিবীর গায়ের কাছের বাতাসের আচ্ছাদনটা যত ঘন, এমন তাহার দূরের আচ্ছাদন নহে,—পৃথিবীর নীচের টানে ও উপরের চাপে তাহার আবরণ এমন নিবিড় হইয়া উঠে। আমাদেরও তাই। যত আমাদের কাছের দিকে, ততই আমাদের নিজের টানে ও পরের চাপে আমাদের মনের উপরকার পর্দ্দা অত্যন্ত বেশি নিরেট হইয়া দাঁড়ায়।

শাস্ত্রে তাই বলে আমাদের সমস্ত আবরণ আসক্তিরই অর্থাৎ আকর্ষণেরই রচনা। নিজের দিকে যতই টান দিব নিজের উপরকার ঢাকাটাকে ততই ঘন করিয়া তুলিব। এই টান হাল্কা হইলে তবেই পর্দ্দা ফাঁক হইয়া যায়।

দেখিতেছি রুগ্ন শরীরের দুর্ব্বলতায় এই টানের গ্রন্থিটাকে খানিকটা আল্‌গা করিয়া দিয়াছে। নিজের চারিদিকে যেন অনেকখানি ফাঁকা ঠেকিতেছে। কিছু একটা করিতেই হইবে, ফল একটা পাইতেই হইবে, আমার হাতে কাজ আছে আমি না হইলে তাহা সম্পন্নই হইবেনা এই চিন্তায় নিজেকে একটুও অবসর দেওয়া ঘটেনা, অবসরটাকে যেন অপরাধ বলিয়া মনে হয়। কর্ত্তব্যের যে অন্ত নাই, জগৎসংসারের দাবীর যে বিরাম নাই; এই জন্য যতক্ষণ শক্তি থাকে ততক্ষণ সমস্তমন কাজের দিকে ছটফট করিতে থাকে। এই টানাটানি যতই প্রবল হইয়া উঠে ততই নিজের অন্তরের ও বাহিরের মাঝখানে সেই স্বচ্ছ অবকাশটি ঘুচিয়া যায় যাহা না থাকিলে সকল জিনিষকে যথাপরিমাণে সত্য আকারে দেখা যায় না। বিশ্বজগৎ অনন্ত আকাশের উপরে আছে বলিয়াই, অর্থাৎ তাহা খানিকটা করিয়া আছে ও অনেকটা করিয়া নাই বলিয়াই তাহার ছোট বড় নানা আকৃতি আয়তন লইয়া তাহাকে এমন বিচিত্র করিয়া দেখিতেছি। কিন্তু জগৎ যদি আকাশে না থাকিয়া একেবারে আমাদের চোখের উপরে চাপিয়া থাকিত—তাহা হইলে ছোটও যা বড়ও তা, বাঁকাও যেমন সোজাও তেমন!

তেমনি যখন শরীর সবল ছিল তখন অবকাশটাকে একেবারে নিঃশেষে বাদ দিবার আয়োজন করিয়াছিলাম। কেবল কাজ এবং কাজের চিন্তা; কেবল অন্তবিহীন দায়িত্বের নিবিড় ঠেষাঠেষির মাঝখানে চাপা পড়িয়া নিজেকে এবং জগৎকে স্পষ্ট করিয়া ও সত্য করিয়া দেখিবার সুযোগ যেন একেবারে হারাইয়াছিলাম। কর্ত্তব্যপরতা যত মহৎ জিনিষই হৌক্, সে যখন অত্যাচারী হইয়া উঠে তখন সে আপনি বড় হইয়া উঠিয়া মানুষকে খাটো করিয়া দেয়। সেটা একটা বিপরীত ব্যাপার। মানুষের আত্মা মানুষের কাজের চেয়ে বড়।

এমন সময় শরীর যখন বাঁকিয়া বসিল, বলিল, আমি কোনোমতেই কাজ করিব না তখন দায়িত্বের বাঁধন কাটিয়া গেল। তখন টানাটানিতে ঢিল্ পড়িতেই কাজের নিবিড়তা আলগা হইয়া আসিল—মনের চারিদিকের আকাশে আলো এবং হাওয়া বহিতে লাগিল। তখন দেখা গেল আমি কাজের মানুষ একথাটা যত সত্য তাহার চেয়ে ঢের বড় সত্য আমি মানুষ। সেই বড় সত্যটির কাছেই জগৎ সম্পূর্ণ হইয়া দেখা দেয়—বিশ্ববীণা সুন্দর হইয়া বাজে—সমস্ত রূপরসগন্ধ আমার কাছে স্বীকার করে যে "তোমারি মন পাইবার জন্য আমরা বিশ্বের প্রাঙ্গণে মুখ তুলিয়া দাঁড়াইয়া আছি।"

আমার কর্ম্মক্ষেত্রকে আমি ক্ষুদ্র বলিয়া নিন্দা করিতে চাইনা কিন্তু আমার রোগশয্যা আজ দিগন্তপ্রসারিত আকাশের নীলিমাকে অধিকার করিয়া বিস্তীর্ণ হইয়াছে। আজ আমি আপিসের চৌকিতে আসীন নই, আমি বিরাটের ক্রোড়ে শয়ান। সেইখানে সেই অপরিসীম অবকাশের মাঝখানে আজ আমার নববর্ষের অভ্যুদয় হইল—মৃত্যুর পরিপূর্ণতা যে কি সুগভীর আমি যেন আজ তাহার আস্বাদন পাইলাম। আজ নববর্ষ অতলস্পর্শ মৃত্যুর সুনীল শীতল সুবিপুল অবকাশপূর্ণ স্তব্ধতার মাঝখানে জীবনের পদ্মটিকে যেন বিকশিত করিয়া ধরিয়া দেখাইল।

তাই ত আজ বসন্তশেষের সমস্ত ফুলগন্ধ একেবারে আমার মনের উপরে আসিয়া এমন করিয়া ছড়াইয়া পড়িতেছে। তাই ত আমার খোলা জানলা পার হইয়া বিশ্বআকাশের অতিথিরা এমন অসঙ্কোচে আমার ঘরের মধ্যে আসিয়া প্রবেশ করিতেছে। আলো যে ঐ অন্তরীক্ষে কি সুন্দর করিয়া দাঁড়াইয়াছে, আর পৃথিবী ঐ তার পায়ের নীচে আঁচল বিছাইয়া কি নিবিড় হর্ষে পুলকিত হইয়া পড়িয়া আছে তাহা যেন এতকাল দেখি নাই। এই আজ আমি যাহা দেখিতেছি এ যে মৃত্যুর পটে আঁকা জীবনের ছবি; যেখানে বৃহৎ, যেখানে বিরাম, যেখানে নিস্তব্ধ পূর্ণতা, তাহারি উপরে দেখিতেছি এই সুন্দরী চঞ্চলতার অবিরাম নূপুরনিক্কন, তাহার নানা রঙের আঁচলখানির এই উচ্ছ্বসিত ঘূর্ণ্যগতি।

আমি দেখিতেছি বাহিরের দরজায় লক্ষ লক্ষ চন্দ্রসূর্য্য গ্রহতারা আলো হাতে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে; আমি দেখিতেছি মানুষের ইতিহাসে জন্মমৃত্যু উত্থানপতন ঘাতপ্রতিঘাত উচ্চকলরবে উতলা হইয়া ফিরিতেছে—কিন্তু সেও ত ঐ বাহিরের প্রাঙ্গণে। আমি দেখিতেছি ঐ যে রাজার বাড়ি তাহাতে মহলের পর মহল উঠিয়াছে, তাহার চূড়ার উপরে নিশান মেঘভেদ করিয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে সে আর চোখে দেখা যায় না। কিন্তু চাবি যখন লাগিল, দ্বার যখন খুলিল—ভিতর বাড়িতে একি দেখা-যায়! সেখানে আলোয় ত চোখ ঠিকরিয়া পড়ে না, সেখানে সৈন্যসামন্তে ঘর জুড়িয়া ত দাঁড়াইয়া নাই! সেখানে মণি নাই মাণিক নাই, সেখানে চন্দ্রাতপে ত মুক্তার ঝালর ঝুলিতেছে না। সেখানে ছেলেরা ধূলাবালি ছড়াইয়া নির্ভয়ে খেলা করিতেছে, তাহাতে দাগ পড়িবে এমন রাজআস্তরণত কোথাও বিছানো নাই। সেখানে যুবকযুবতীরা মালা বদল করিবে বলিয়া আঁচল ভরিয়া ফুল তুলিয়াছে কিন্তু রাজোদ্যানের মালী আসিয়া ত কিছুমাত্র হাঁকডাক করিতেছে না। বৃদ্ধ সেখানে কর্ম্মশালার বহুকালিমাচিহ্নিত অনেক দিনের জীর্ণ কাপড়খানা ছাড়িয়া ফেলিয়া পট্টবসন পরিতেছে কোথাও ত কোনো নিষেধ দেখিনা। ইহাই আশ্চর্য্য যে এত ঐশ্বর্য্য এত প্রতাপের মাঝ-

খানটিতে সমস্ত এমন সহজ, এমন আপন। ইহাই আশ্চর্য্য, পা তুলিতে ভয় হয় না, হাত তুলিতে হাত কাঁপে না। ইহাই আশ্চর্য্য যে এমন অভেদ্য রহস্যময় জ্যোতির্ম্ময় লোক-লোকান্তরের মাঝখানে এই অতি ক্ষুদ্র মানুষের জন্মমৃত্যু সুখদুঃখ খেলাধূলা কিছুমাত্র ছোট নয়, সামান্য নয়, অসঙ্গত নয়—সে জন্য কেহ তাহাকে একটুও লজ্জা দিতেছেনা। সবাই বলিতেছে তোমার ঐটুকু খেলা, ঐটুকু হাসিকান্নার জন্যই এত আয়োজন—ইহার যতটুকুই তুমি গ্রহণ করিতে পার ততটুকুই সে তোমারি;—যতদূর পর্য্যন্ত তুমি দেখিতেছ সে তোমারই দুই চক্ষুরধন,—যতদূর পর্য্যন্ত তোমার মনদিয়া বেড়িয়া লইতে পার সে তোমারি মনের সম্পত্তি। তাই এত বড় জগৎব্রহ্মাণ্ডের মাঝখানে আমার গৌরব ঘুচিল না—ইহার অন্তবিহীনভারে আমার মাথা এতটুকুও নত হইল না।

কিন্তু ইহাও বাহিরে। আরো ভিতরে যাও—সেখানেই সকলের চেয়ে আশ্চর্য্য। সেইখানেই ধরা পড়ে, কৌটার মধ্যে কৌটা, তাহার মাঝখানে যে রত্নটি সেই ত প্রেম। কৌটার বোঝা বহিতে পারিনা কিন্তু সেই প্রেমটুকু এমনি যে, তাহাকে গলার হার গাঁথিয়া বুকের কাছে অনায়াসে ঝুলাইয়া রাখিতে পারি। প্রকাণ্ড এই জগৎ-ব্রহ্মাণ্ডের মাঝখানে বড় নিভৃতে ঐ একটি প্রেম আছে—চারিদিকে সূর্য্যতারা ছুটাছুটি করিতেছে তাহার মাঝখানকার স্তব্ধতার মধ্যে ঐ প্রেম, চারিদিকে সপ্তলোকের ভাঙাগড়া চলিতেছে, তাহারি মাঝখানকার পূর্ণতার মধ্যে ঐ প্রেম। ঐ প্রেমের মূল্যে ছোটও যে সে বড়, ঐ প্রেমের টানে বড়ও যে সে ছোট। ঐ প্রেমই ত ছোটর সমস্ত লজ্জাকে আপনার মধ্যে টানিয়া লইয়াছে, বড়র সমস্ত প্রতাপকে আপনার মধ্যে আচ্ছন্ন করিয়াছে। ঐ প্রেমের নিকেতনের মধ্যে প্রবেশ করিলে দেখিতে পাই বিশ্বজগতের সমস্ত সুর আমারই ভাষাতে গান করিতেছে—সেখানে একি কাণ্ড! সেখানে নির্জ্জন রাত্রির অন্ধকারে রজনীগন্ধার উন্মুখগুচ্ছ হইতে যে গন্ধ আসিতেছে সে কি সত্যই আমারই কাছে নিঃশব্দচরণে দূত আসিল! এও কি বিশ্বাস করিতে পারি! হাঁ সত্যই। একেবারেই বিশ্বাস করিতে পারিতাম না মাঝখানে যদি প্রেম না থাকিত। সেইত অসম্ভবকে সম্ভব করিল! সেই ত এতবড় জগতের মাঝখানেও এত ছোটকে এত বড় করিয়া তুলিল! বাহিরের কোনো উপকরণ তাহার যে আবশ্যক হয় না, সে যে আপনারই আনন্দে ছোটকে গৌরব দান করিতে পারে।

এই জন্যই ত ছোটকে তাহার এতই দরকার। নহিলে সে আপনার আনন্দের পরিমাণ পাইবে কি করিয়া? ছোটর কাছে সে আপনার অসীম বৃহত্বকে বিকাইয়া দিয়াছে; ইহাতেই তাহার আপনার পরিচয়, ইহাতেই তাহার আনন্দের পরিমাণ। সেই জন্যই এমন স্পর্দ্ধা করিয়া বলিতেছি, এই তারাখচিত আকাশের নীচে এই পুষ্পবিকশিত বসন্তের বনে, এই তরঙ্গমুখরিত সমুদ্র-বেলায় ছোটর কাছে বড় আসিতেছেন। জগতে সমস্ত শক্তির আন্দোলন, সমস্ত নিয়মের বন্ধন, সমস্ত অসংখ্য কাজের মাঝখানে এই আনন্দের লীলাটিই সকলের চেয়ে গভীর, সকলের চেয়ে সত্য। ইহা অতি ছোট হইয়াও ছোট নহে, ইহাকে কিছুতেই আচ্ছন্ন করিতে পারিল না। দেশকালের মধ্যে তাহার বিহার; প্রত্যেক তিল পরিমাণ দেশকে ও পল পরিমাণ কালকে অসীমত্বে উদ্ভাসিত করা তাহার স্বভাব;—আর, আমার এই ক্ষুদ্র আমিটুকুকে নানা আড়ালের ভিতর দিয়া নিবিড় সুখেদুঃখে আপন করিয়া লওয়া তাহার পরিপূর্ণতা।

জগতের গভীর মাঝখানটিতে এই যেখানে সমস্ত একেবারেই সহজ, যেখানে বিশ্বের বিপুল বোঝা আপনার সমস্ত ভার নামাইয়া দিয়াছে, সত্য যেখানে সুন্দর, শক্তি যেখানে প্রেম, সেইখানে একেবারে সহজ হইয়া বসিবার জন্য আজ নববর্ষের দিনে ডাক আসিল। যেদিকে প্রয়াস, যেদিকে যুদ্ধ, সেই সংসার ত আছেই—কিন্তু সেইখানেই কি দিন খাটিয়া দিনমজুরী লইতে হইবে? সেইখানেই কি চরম দেনাপাওনা? এই বিপুল হাটের বাহিরে নিখিলভুবনের নিভৃত ঘরটির মধ্যে একটি জায়গা আছে যেখানে হিসাবকিতাব নাই, যেখানে আপনাকে অনায়াসে সম্পূর্ণ সমর্পণ করিতে পারাই মহত্তম লাভ, যেখানে ফলাফলের তর্ক নাই, বেতন নাই, কেবল আনন্দ আছে; কর্ম্মই যেখানে সকলের চেয়ে প্রবল নহে, প্রভু যেখানে প্রিয়—সেখানে একবার যাইতে হইবে, একেবারে ঘরের বেশ পরিয়া, হাসিমুখ করিয়া। নহিলে প্রাণপণ চেষ্টায় কেবলি আপনাকে আপনি জীর্ণ করিয়া আর কতদিন এমন করিয়া চলিবে? নিজের মধ্যে অন্ন নাই গো অন্ন নাই—অমৃত হস্ত হইতে অন্ন গ্রহণ করিতে হইবে। সে অন্ন উপার্জ্জনের অন্ন নয়, সে প্রেমের অন্ন—হাত খালি করিয়া দিয়া অঞ্জলি পাতিয়া চাহিতে পারিলেই হয়। সহজ হইয়া সেইখানে চল্—আজ নববর্ষের পাখী সেই ডাক ডাকিতেছে, বেলফুলের গন্ধ সেই সহজ কথাটিকে বাতাসে অযাচিত ছড়াইয়া দিতেছে। নববর্ষ যে সহজ কথাটি জানাইবার জন্য প্রতিবৎসর দেখা দিয়া যায়, রোগের শয্যায় কাজ ছিলনা বলিয়া সেই কথাটি আজ স্তব্ধ হইয়া শুনিবার সময় পাইলাম—আজ প্রভাতের আলোকের এই নিমন্ত্রণপত্রটিকে প্রণাম করিয়া মাথায় করিয়া গ্রহণ করি।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

মেটারলিঙ্কের "দৃষ্টিহারা"।

মেটারলিঙ্কের Les Aveugles বা The Sightless নামক একটি ক্ষুদ্র নাট্য শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত—১৩১৬ সালের চৈত্রের "প্রবাসী"তে অনুবাদ করিয়াছেন।

মেটারলিঙ্কের ভাগ্যলক্ষ্মী তাঁহার অংশে যশ এবং অপযশ দুইই সমান মাত্রায় ভাগ করিয়া দিয়াছেন। কেহ কেহ তাঁহাকে "hopeless mental cripple", অসম্ভব রকম মানসিক পঙ্গু বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন, কেহ বা তাঁহাকে ইউরোপের সকল কবির উপরে আসন দিয়াছেন। সাহিত্যের মধ্যে কোন জীবিত কবির কি স্থান তাহা নিরূপণ করিতে বসা তাঁহার সমকালীন লোকের পক্ষে মূঢ়তা। কারণ, কবির রচনার মধ্যে অনেক জিনিস আছে যাহা সাময়িক, সুতরাং সেই সময়ে যাহারা বাস করে তাহাদের হাতে এমন চালুনী নাই যাহা দ্বারা তাহারা রচনার সাময়িক অংশ চিরন্তন অংশ হইতে ছাঁকিয়া লইতে পারে। সে কাজের ভার মহাকালকে দিতেই হয়।

Les Aveugles মেটারলিঙ্কের অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সের রচনা। ইহা প্রথম ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। মেটারলিঙ্কের বয়স তখন ২৯ কি ৩০। বাংলা দেশে পদ্মাতীরবাসী প্রায় তাঁহারি সমবয়সী আর একজন কবির 'সোনারতরী' সেই সময় কিম্বা তাহার অনতিকালের মধ্যেই বাহির হইয়াছে।

আট দশ বৎসর পূর্ব্বে যখন প্রথম ইংরাজীতে The Sightless পড়ি, তখন মেটারলিঙ্ককে অত্যন্ত শূন্য স্বপ্নলোকবিহারী বলিয়া মনে হইয়াছিল। ঘটনা নাই, বাস্তব চিত্র নাই—একি এক অদ্ভুত ধরণের নাটক—আমরা ইহার মর্ম্ম গ্রহণ করিতে না পারিয়া ইহাকে অবনতিশীল ইউরোপীয় সাহিত্যের আধুনিক একটি নমুনামাত্র মনে করিয়াছিলাম।

তখন কাগজে পত্রেও মেটারলিঙ্ককে লইয়া কেহ নাড়া চাড়া করিত না। আধুনিক কাল সম্বন্ধে যে তাঁহার কোন বড় বাণী আছে এ কথা কল্পনা করা শক্ত ছিল। Quest পত্রের এক সংখ্যায় মেটারলিঙ্কের বিখ্যাত সমালোচক হেনরি রোজ 'The Sightless' সম্বন্ধে একটা ব্যাখ্যা লিখিয়াছেন। সেই ব্যাখ্যাটি পড়িয়া বেশ বুঝা গেল যে কবিতার রহস্যের চাবি উপযুক্ত সমজ্দারের হাতেই থাকে। তিনি দ্বার খুলিয়া না দিলে ভিতরের তত্ত্ব জানিবার কোন উপায় নাই। সুতরাং "দৃষ্টিহারা" যাঁহারা পাঠ করিয়াছেন এবং পাঠ করিয়া নিরাশ হইয়াছেন, তাঁহাদের নৈরাশ্য অপনোদন করিবার জন্য হেনরি রোজের সেই ব্যাখ্যাটি উপস্থিত করিতেছি।

"দৃষ্টিহারা" নাট্যের পাত্র সকলেই অন্ধ এবং একটি তরুণী ভিন্ন সকলেই বৃদ্ধ। একজন স্ত্রীলোক কেবল উন্মাদগ্রস্ত, তাহার কোলে একটি শিশু। দৃশ্য একটি দ্বীপের মধ্যে, সেখানে চতুর্দ্দিকে অনাদিকালের অরণ্য বিস্তীর্ণ। সময় মধ্যরাত্রি, আকাশ নক্ষত্রপ্রচুর ও গম্ভীর। অন্ধ ব্যক্তিদিগের কথায় জানা যায় যে তাহারা একটা মঠ হইতে আসিয়াছে, একজন পুরোহিত তাহাদের পথপ্রদর্শক ছিলেন, কিন্তু অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত তাঁহার কোন সাড়াশব্দ না পাইয়া তাহাদের মনে হইয়াছে যে তিনি তাহাদিগকে ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন, তাহারা তাই বিষম বিব্রত হইয়া পড়িয়াছে। কোথায় যে তাহারা আছে তাহা ভাবিয়াই পায়না। তাহাদের কানে সমুদ্রগর্জ্জনের মত একটা ধ্বনি আসিতেছে। ঢেউয়ের মধ্যে দূরে যেন একটা বাতিঘর আছে। এখন পুরোহিতকে পাইলে তাহারা বাঁচে। কিন্তু হতভাগ্যরা জানেও না যে পুরোহিত তাহাদের মধ্যেই মরিয়া পড়িয়া আছেন।

শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রবাবু নাট্যটিকে দেশীয় রূপে পরিবর্ত্তিত করিয়া অনুবাদ করিবার জন্য একটু অসুবিধা হইয়াছে। যেমন, পুরোহিতকে তিনি সন্ন্যাসী করিয়াছেন—অথচ এ নাট্যের প্রধান মূল্য তাহার Symbol-এ। আধুনিক ইউরোপের আধ্যাত্মিক সঙ্কট ও ধর্ম্মবিপ্লবের চিত্র কবি যে বিশেষ Symbol অথবা রূপকের সাহায্যে অঙ্কিত করিতে ইচ্ছা করেন, নাট্যটিকে অন্য দেশের আকার দিলে সেই বিশেষ রূপককেই হারাইতে হয়। সন্ন্যাসী নয়, এখানে খৃষ্টান পুরোহিতেরই দরকার, কারণ এ নাট্যের সে-ই প্রধান পাত্র।

আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে কোন্ বিশেষ আইডিয়াকে মেটারলিঙ্ক Symbol-এর সাহায্যে প্রকাশ করিতেছেন তাহা না বুঝিয়া আমরা নাট্যটিকে নিতান্ত অর্থহীন কল্পনার খেলা বলিয়া ধরিয়া লইয়াছিলাম। ভাব যেখানে ইঙ্গিতে ও চিহ্নে আপনাকে ব্যক্ত করে সেখানে তাহাকে বুঝা বড় কঠিন। এই কারণেই আমাদের দেশীয় কবির "দেউল," "পরশপাথর" প্রভৃতি কবিতা ও "রাজা" "অচলায়তন" "ডাকঘর" প্রভৃতি নাট্য অনেকেরই কাছে প্রহেলিকা।

এ নাট্যের আইডিয়াটি এই যে, যে পুরোহিত এতকাল ইউরোপের পথপ্রদর্শক ছিলেন, তিনি এক্ষণে বৃদ্ধ ও জরাজীর্ণ—অর্থাৎ এখন চর্চ্চের ধর্ম্ম আর সমস্ত ইউরোপকে প্রাণ দিতেছেনা। চর্চ্চ যে মত ও বিশ্বাসকে এখনও আঁকড়িয়া আছে, তাহা নূতন মানুষের জ্ঞান বিজ্ঞান, রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক অবস্থা, কিছুরই সঙ্গে মিলিতে চায় না। সে এখন "দেউল,"—"অচলায়তন"—তাহার প্রাচীর ভাঙিয়া বাহিরের আলো তাহার মধ্যে আসিয়া পড়া নিতান্ত আবশ্যক হইয়াছে। সুতরাং পুরোহিত নিজেই জানেন যে তাঁহার কাল ফুরাইয়া আসিয়াছে। তাঁহার

যদি সে পরিমাণ আধ্যাত্মিক দৃষ্টির ব্যাপকতা ও গভীরতা থাকিত, যাহাতে তিনি মৃত পুরাতনের উপরে নূতন ভাবলোকের প্রতিষ্ঠা করিতে পারেন, তবে কথাই ছিলনা; কিন্তু তাঁহার সে শক্তিই নাই।

তাঁহার দৃষ্টিতেই আর সকলের দৃষ্টি ছিল, তিনি ছাড়া সকলেই অন্ধ। এখন আবার চারিদিকে মধ্যরাত্রির নিবিড় অন্ধকার—সে যেন ভিতরের অন্ধকার! অথচ বলা হইয়াছে যে আকাশে অগণ্য নক্ষত্ররাজি জ্বলিতেছে—সেখানে চিরন্তনকালের ধ্রুব আলোক প্রকাশ পাইতেছে। কিন্তু অন্ধরা যে 'হৃদয়-অরণ্যের' মধ্যে পথ হারাইয়া বসিয়া আছে, তাহার গহন জটিলতার লক্ষ পাকে সেই আকাশের চিরআলোককে সংরুদ্ধ করিয়া বিভীষিকাকে শতগুণ বাড়াইয়াছে। দূরে অনন্ত অজ্ঞাত সমুদ্র—অনাবিষ্কৃত রহস্য—তাহার কল্লোলিত তরঙ্গের মধ্যে বাতিঘর জ্বলিতেছে। তাহার অর্থ এই, যে একটি অন্তরতর প্রজ্ঞালোক সমস্ত সংশয়তিমিরের তরঙ্গের মধ্যেও জাগ্রত হইয়া আছেই—সংশয়ের রাত্রে সেই আলোই মানুষের একমাত্র ভরসা!

ব্রাউনিংয়ের একটি কবিতা আছে, যে প্রণয়ী বলিতেছে, তুমি যখন বিনা বাতিতে আমার ঘরে প্রবেশ করিয়াছিলে, তখন ঘরের প্রত্যেক জিনিস তোমাকে প্রতিপদে প্রতিহত করিয়াছিল, তুমি ভাবিয়াছিলে আমার ঘর ভয়ঙ্কর বিশৃঙ্খল, কিন্তু যেমনি প্রদীপটি লইয়া আসিলে, অমনি কি সর্ব্বত্র সামঞ্জস্য ও সুষমার সমস্ত তোমার চক্ষে সুন্দর ঠেকিল? আমরাও, যে ভাবের প্রদীপ লইয়া নাট্যটি পড়িলে তাহার সর্ব্বত্র সুসঙ্গতি দেখিতে পাই, সেই প্রদীপটিকেই পাই নাই। কিন্তু এখন তাহারি আলোকে সমস্তই কি আশ্চর্য্য কবিত্বময় বলিয়া বোধ হইতেছে।

স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, ইউরোপে নূতন অবস্থার সঙ্গে আপনাকে সঙ্গত করিয়া লইতে সেখানকার পুরোহিত বহুকালাবধি আপনাকে অসমর্থ বোধ করিতেছিলেন। প্রথম অন্ধস্থবির পুরোহিতের সম্বন্ধে বলিতেছে "ক্রমেই তিনি অপটু হয়ে পড়ছেন। বোধ হয় কিছুদিন থেকে তিনি নিজেও আর চোখে তেমন দেখতে পান্‌না। সে কথা তিনি নিজে কিন্তু কিছুতেই স্বীকার কর্ব্বেননা...... পাছে আর কেউ এসে তাঁর স্থান অধিকার ক'রে বসে। আমাদের চালিয়ে বেড়াবার জন্য—নূতন কাউকে পেলে ভাল হয়।"

সকলের চেয়ে স্থবিরতম স্ত্রীলোকটির কথাতেও পুরোহিতের মানসিক অবস্থা কিরূপ তাহা বেশ বুঝা যায়। সে বলিতেছে "পুরোহিত বড় ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন। এ ক'দিন বাদলবাণে নদীগুলো নাকি ভারি বেড়ে উঠেছে, বাঁধ মান্‌ছেনা। তিনি বল্‌ছিলেন......সমুদ্রের মূর্ত্তি দেখে তাঁরও ভারি ভয় হয়েছে। সাগর যে হঠাৎ কেন এত চঞ্চল হয়ে উঠ্‌ল তার কোন কারণ খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।"

অন্ধদের কথায় বার্ত্তায় পুরোহিতের অক্ষমতা ও আশঙ্কার কথা যেমন পাওয়া যায়, তেম্‌নি আর একটি জিনিস সেই সঙ্গে দেখা যায় যে মানুষের বুদ্ধির উপর তাঁহার প্রভাব যতই শিথিল হইতেছিল, তিনি হৃদয়-অধিকারের জন্য ততই বেশি ঝোঁক এবং আগ্রহ প্রকাশ করিতেছিলেন। অন্ধ তরুণী তাই বলিতেছে "বিদায়ের আগে তিনি আমার হাত দুখানি হাতের মধ্যে নিয়েছিলেন, তাঁর হাত কাঁপ্‌ছিল, তারপর আমার কপালের উপর একটি চুমা দিয়ে চ'লে গেলেন।" মানুষের মধ্যে যেখানে এই আবেগমূঢ় নারীহৃদয় আছে, সেইখানে নিজের আধিপত্যকে চিরস্থায়ী করিবার জন্য যেন পুরোহিতের শেষ কালটায় একান্ত চেষ্টা হইয়াছিল। আমাদের দেশের আধুনিক গুরুবাদ প্রভৃতি ব্যাপারে ও বৈষ্ণবতন্ত্রের ভক্তি-ধর্ম্মে ইহারই জুড়ি দৃষ্টান্ত মেলে। হৃদয় কোন মতে মুগ্ধ হইলেই হইল—জ্ঞানের বিশেষ কোন প্রয়োজন নাই!

মেটারলিঙ্কের নাট্যের মধ্যে কলানৈপুণ্য আশ্চর্য্য। নাট্যের প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি চিত্রের মধ্যে এই একই ভাবের Symbolএর লীলাবৈচিত্র্য ঘটিয়াছে। সেই অরণ্যের চারিদিকে গাছ পড়িয়া গিয়াছে—পাতা পচিতেছে—পুরাতন ধর্ম্ম এমনি করিয়া জীর্ণ হইতেছে—শীতে অন্ধের দল কম্পমান—তাহারা ধর্ম্মের নব সূর্য্যের উত্তাপ হইতে এবং আলোক হইতে বঞ্চিত—তাহাদের চারিদিকে শুধু সংশয়রাত্রি, তরঙ্গগর্জ্জন, অনন্ত অনাবিষ্কৃত রহস্যময় সমুদ্র!

কিন্তু কেবল যদি একটা সমস্যা ও সংশয়ের অন্ধকারময় আতঙ্কের মধ্যে মেটারলিঙ্ক তাঁহার নাট্য শেষ করিতেন, তবে তাঁহার নাট্যটির ভাবাত্মক দিক্‌ কিছুই থাকিত না। অন্যায়কে অন্ধকারকে সংশয়কে খুব ফলাইয়া চিত্রিত করাই যে কবির বা নাট্যকারের মস্ত কৃতিত্ব, এ কথা স্বীকার করা যায় না। যদি প্রাচীন ধর্ম্মে আর চলিবেনা, ইহা সত্য হয়, যদি ধর্ম্মের যিনি রক্ষক তিনি মারা গিয়াই থাকেন, তবে ধর্ম্মহীন অন্ধের দলের কি গতি হইবে? ইহার কি কোন উত্তর মেটারলিঙ্কের নাট্যের মধ্যে কোথাও আভাসমাত্রেও বলা হয় নাই? খুবই বলা হইয়াছে, তাহা যদি না হইত তবে নাট্যের কোন সার্থকতাই থাকিত না।

মেটারলিঙ্ক বলেন যে মানুষের বুদ্ধি যখন সত্যকে নিঃসংশয়ে ধরিতে পারে না, তাহার মধ্যে বিচিত্র দ্বন্দ্ব ঘটিতে থাকে, এবং সেই দ্বন্দ্বের টানাহেঁচড়ার মধ্যে বুদ্ধি নিখিলরহস্যের কোন পার পায় না, সেই সঙ্কটের সময়,

বুদ্ধির চেয়ে বড় মানুষের Intution বা অনন্তর প্রত্যয় এবং তাহার আদিম সহজ সংস্কার (instincts) তাহাকে নিঃসংশয় সত্যে পহুঁছিয়া দিতে সাহায্য করে।

উপনিষদকার ঋষি বোধ হয় 'হৃদা মনীষা মনসাভিক্৯প্তঃ' অর্থাৎ হৃদগত সংশয়-রহিত বুদ্ধি দ্বারা ঈশ্বর দৃষ্ট হন্ এই কথার দ্বারা মেটারলিঙ্ক যাহাকে Intution বলিতেছেন তাহারি অর্থ জ্ঞাপন করিয়া থাকিবেন। Instinctও সেই সংশয়-রহিত বুদ্ধি, অথণ্ড বুদ্ধি। যুক্তি তর্কের দ্বারা কোন মতেই সেই বুদ্ধিকে পাওয়া যায় না—নমেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন। একেবারেই এক নিমিষেই অন্তরের অন্তরতম প্রদেশ হইতে এই সায়টি বাহির হইয়া আসে এবং দুর্ভেদ্য রহস্যকে বিদীর্ণ করিয়া—"তমসঃ পরস্তাৎ"—তমসার পরপারে চলিয়া যায়।

এই যে সংশয়-রহিত অথণ্ড বুদ্ধি যাহা সংস্কারের মত কাজ করে, মেটারলিঙ্কের বিশ্বাস যে নারীপ্রকৃতির ভিতরেই ইহা অধিকতর পরিমাণে সঞ্চিত আছে। স্ত্রীপ্রকৃতির মধ্যে কোথাও কোন দ্বিধা নাই, তাহার সংস্কারের দ্বারা চালিত হইয়া সে কর্ম্ম করে এবং সেইজন্য তাহার রচনার মধ্যে কোথাও ছেদ পড়ে না, কিছুই অসমাপ্ত থাকিয়া যায় না, সমস্ত সুন্দর এবং সার্থক হইয়া উঠে। সে যেন বিশ্বপ্রকৃতির ভিতরে আছে, আর পুরুষ যেন বিচ্ছিন্ন হইয়া স্বতন্ত্র হইয়া একলা পড়িয়াছে। পুরুষ সবই যাচাই করিয়া লয়, প্রশ্ন করে, পরীক্ষা করে, তত্ত্বান্বেষণ করে, গড়িতে গিয়া বারবার করিয়া ভাঙে। সংশয়বুদ্ধি পুরুষের, হৃদগত সংশয়-রহিত বুদ্ধি স্ত্রীর। এই কারণে, যেখানে অন্ধকারের প্রান্তে পুরুষ হতাশ হইয়া দাঁড়াইয়া থাকে, স্ত্রী সেখানে আলোর আভাস পায়।

অন্ধ পুরুষ যখন বলিতেছে "আমি কেবল পৃথিবীর গন্ধ পাইতেছি।" অন্ধ তরুণী জোরের সঙ্গে ও আবেগের সঙ্গে বলিতেছে "না, আমি আমার চারিদিকে ফুলের গন্ধই পাইতেছি।" এই যে নব সুগন্ধের আভাস—ইহাই তো নবধর্ম্মের আবির্ভাবের আশা।

"এত আঁধার মাঝে তোমার
এত অসংশয়
বিশ্বমাঝে কেহই তোরে
করে না প্রত্যয়!"

অসাড় শীত, শুষ্ক পত্র ঝর্ ঝর্ শব্দ করিয়া আসিয়া পড়িতেছে, বরফে দশদিক্ আচ্ছন্ন, সে সময় কেবল তুমিই বলিতেছ, বসন্তের সুগন্ধ আমারি ঘ্রাণের মধ্যে আসিয়াছে—এবং এখন যাহা দেখিতেছ এ সমস্তই ক্ষণিক, এ দু দণ্ডেই কাটিয়া যাইবে! "এত আঁধার মাঝে তোমার এত অসংশয়!"

মেটারলিঙ্কের সমসাময়িক বাংলার কবি এই Sightless নাট্য রচনার সময়েই ধর্ম্মের এই নব যুগের আগমনবার্ত্তার গান পুরীর সমুদ্র-তীরে গাহিয়া গিয়াছেন:—

মানব-হৃদয়-সিন্ধুতলে
যেন নব মহাদেশ সৃজন হ'তেছে পলে পলে
আপনি সে নাহি জানে। শুধু অর্দ্ধ অনুভব তারি
ব্যাকুল ক'রেছে তারে, মনে তার দিয়েছে সঞ্চারি'
আকারপ্রকারহীন তৃপ্তিহীন এক মহা আশা
প্রমাণের অগোচর প্রত্যক্ষের বাহিরেতে বাসা।
তর্ক তারে পরিহাসে মর্ম্ম তারে সত্য বলি জানে
* * *
জননী যেমন জানে জঠরের গোপন শিশুরে।
* * *

—আমি তো জানি না, ইহা অপেক্ষা আর আশ্চর্য্য সৌসাদৃশ্য কি হইতে পারে!

নাট্যের শেষভাগে যখন অন্ধদের হাহুতাশ খুব বাড়িয়া উঠিয়াছে, শীত তুষারবর্ষণে চারিদিকে হিহিকার লাগাইয়া দিয়াছে, তখন এক কুকুর আসিয়া উপস্থিত হইল। আধ্যাত্মিক সঙ্কটের সময়ে মানুষের যে আদিম সংস্কারের উপর মেটারলিঙ্কের প্রধান নির্ভর, কুকুর তাহারি প্রতিরূপ। সে সর্ব্বাগ্রে মৃতব্যক্তির গন্ধ পাইল এবং প্রথম অন্ধকে টানিয়া পুরোহিতের মৃতদেহের নিকটে লইয়া গেল। তখন সহসা পুরোহিত বিগতপ্রাণ বুঝিয়া অসহায় অন্ধদের মধ্যে ক্রন্দনের রোল উঠিল, তাহারা পথ চিনিবার আশা একেবারেই ত্যাগ করিল। কেবল সেই তরুণী বলিল "পাতার মর্ম্মর শব্দ শুনছ? আমার বোধ হচ্ছে কেউ আমাদের দিকেই আসছে।" সেই উন্মাদগ্রস্তা অন্ধ স্ত্রীলোকের ছেলে কাঁদিয়া উঠিল। তরুণী বলিল "ও দেখতে পায়, ও দেখতে পায়! কাঁদছে—নিশ্চয় কিছু দেখতে পেয়ে কাঁদছে!" এই বলিয়া পাগলির কোল হইতে ছেলেটিকে কাড়িয়া লইয়া যেদিকে পদশব্দের মত শব্দ শুনা যাইতেছিল, সেইদিকে অগ্রসর হইতে লাগিল।

সে পদধ্বনি কিসের পদধ্বনি?

"তোরা শুনিস্ নি কি শুনিস্ নি তার পায়ের ধ্বনি
ঐ যে আসে আসে আসে!"

সে নূতন আশা ও বিশ্বাসের আগমন ধ্বনি। তরুণী কেন যে তাহা চেনে তাহা বলা হইয়াছে, কিন্তু শিশু কেন দেখিতে পায়? সে যে নিষ্কলঙ্ক পবিত্রতার ও নিষ্পাপের মূর্ত্তি—নবধর্ম্মের আগমনকে সে দেখিবে না তো কে দেখিবে?

এইখানেই নাট্যের শেষ। যাঁহাদের কাছে এ দেশীয় হেঁয়ালী বুঝা কষ্টকর বলিয়াই বিরক্তিকর, বিদেশীয় হেঁয়ালী তাঁহাদিগের ভাল লাগিবে কি না জানি না। কি করা যাইবে, আধুনিক কবিকে রহস্যকে রহস্য দিয়াই

প্রকাশ করিতে হয়, নহিলে যে রহস্যের সৌন্দর্য্যই মাটি হইয়া যায়।

শ্রীঅজিতকুমার চক্রবর্ত্তী।

বেদান্তবাদ

পঞ্চম প্রপাঠক

দ্বৈতাদ্বৈত বা ভেদাভেদ

২

শ্রীভাস্করদর্শন

নিম্বার্কের ন্যায় ভাস্করাচার্য্য দ্বৈতাদ্বৈত-বা ভেদাভেদ-বাদী হইলেও উভয়ের মতের অবান্তর কিছু পার্থক্য আছে, ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। নিম্বার্কের মত পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে, আজ আমরা ভাস্করাচার্য্যের মত আলোচনা করিয়া দেখিব।

এক বেদান্তদর্শনের ভাষ্য ভিন্ন ভাস্করদর্শনের অপর কোন গ্রন্থেরই সন্ধান আমার জানা নাই; আবার এই ভাষ্যখানি এ পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ প্রকাশিত না হওয়ায় * ইহারও সমস্ত বিবরণ সংগ্রহ করিবার সুবিধা হয় নাই। ভাষ্যের যে অংশটুকু হস্তগত হইয়াছে, তাহা হইতে প্রতিপাদ্য বিষয় সম্বন্ধে যাহা পারা যায়, সংক্ষেপে সঙ্কলন করিয়া আপনাদের নিকটে উপস্থিত করিব।

ভাস্করাচার্য্য বলেন, এই গো, অশ্ব-প্রভৃতি যাহা কিছু আছে, তৎসমস্তই ভিন্নাভিন্ন—ভিন্ন ও অভিন্ন উভয়-স্বরূপ, অর্থাৎ তাহাতে ভেদ ও অভেদ উভয়ই রহিয়াছে; ইহা প্রমাণ দ্বারা নির্ণীত, অতএব অবিরুদ্ধ।

কেহ কোথাও দেখাইতে পারিবে না যে, কোন বস্তু কেবল অভিন্ন বা কেবল ভিন্ন। ঘট, পট, মঠ-ইত্যাদি সমস্ত পদার্থেরই সত্তা আছে; ঘটও সৎপদার্থ, পটও সৎ-পদার্থ, মঠ-প্রভৃতিও সৎপদার্থ। অতএব সবই যখন সৎপদার্থ, তখন এই হিসাবে ঘট-পট-মঠ সমস্তই অভিন্ন। আবার এই সমস্তই জ্ঞেয়, এবং সমস্তই দ্রব্য, অতএব এইরূপেও এই সমস্তকে পরস্পর অভিন্ন বলিতে হয়; ঘট যেমন জ্ঞেয় বা দ্রব্য, পট ও মঠ ও সেইরূপ জ্ঞেয় এবং দ্রব্য; অতএব এই প্রকারে ইহারা সকলেই অভিন্ন।

অপর পক্ষে ইহারা পরস্পর ভিন্ন। ব্যক্তিরূপে ইহাদের পরস্পর ভেদ। যাহা প্রকাশ পায় তাহাই ব্যক্তি। ঘটব্যক্তি পটব্যক্তি হইতে ভিন্ন, পটব্যক্তি মঠব্যক্তি হইতে ভিন্ন। ঘট ঘটই, ইহা পট নহে; এইরূপ পট পটই, ইহা মঠ নহে। অতএব ইহারা পরস্পর ভিন্ন।

ভাস্করাচার্য্যের এই কথার স্থূল তাৎপর্য্য এই যে, বস্তু-সমূহ সামান্যরূপে অভিন্ন, এবং বিশেষরূপে ভিন্ন।

এই বলিয়া তিনি আবার বলিতেছেন—সমস্ত বস্তুরই (পূর্ব্বোক্তরূপে) ভেদ ও অভেদ উভয়ই প্রতীয়মান হয়। ইহাতে বিরোধ কি? বিরোধ বা অবিরোধ উভয়ই প্রমাণ দ্বারা নিশ্চিত হইয়া থাকে। কোন একটি বস্তুকে একরূপ দেখিতে পাওয়া যায় বলিয়া যেমন তাহাকে একরূপ বলিয়াই স্বীকার করিতে হয়, সেই প্রকার যখন তাহাকে দ্বিরূপ (অর্থাৎ বিভিন্ন) দেখা যায়, তখন দ্বিরূপ বলিয়াই তাহাকে স্বীকার করা উচিত। ঈশ্বর কিছু এরূপ বলিয়া দেন নাই যে, একটি বস্তু এক-রূপই হইবে।

এস্থানে প্রশ্ন হইতে পারে। শীত ও উষ্ণ যেমন পরস্পরবিরুদ্ধ, ভেদ ও অভেদেরও সম্বন্ধ সেইরূপ পরস্পর-বিরুদ্ধ। যেখানে ও যে সময়ে শৈত্য থাকে, সেখানে সেই সময়ে যেমন উষ্ণতা থাকিতে পারে না, সেইরূপ যাহাতে যে সময়ে ভেদ রহিয়াছে, তাহাতেই সেই সময়ে অভেদ থাকিতে পারে না। কিন্তু ভেদাভেদ বলিতে গেলে একই স্থলে যুগপৎ ভেদ ও অভেদ উভয়ই স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু ইহা সঙ্গত নহে।

ভাস্করাচার্য্য ইহার উত্তরে বলেন:—যিনি এরূপ প্রশ্ন উত্থাপন করেন, তাঁহারই ইহাতে বুদ্ধির অপরাধ দেখা যাইতেছে, ইহাতে কোন বস্তুত্বের বিরোধ নাই। শীত ও উষ্ণের পরস্পর বিরোধ বলিলে এই বুঝা যায় যে, (১) তাহারা উভয়ে একসঙ্গে অর্থাৎ একত্র অবস্থান করে না, (২) এবং রৌদ্র ও ছায়া যেমন বিভিন্ন স্থানে থাকে, ইহারাও সেইরূপ বিভিন্ন বিভিন্ন স্থানে থাকে। এই উভয় প্রকার ভিন্ন অন্য কোন প্রকার বিরোধ এখানে দেখা যায় না। প্রকৃতস্থলে এই উভয় প্রকারের মধ্যে কোন প্রকারেরই বিরোধ উপস্থিত হইতে পারে না। ব্রহ্ম কারণ, এবং এই সংসারপ্রপঞ্চ তাঁহার কার্য্য। এই কার্য্য-কারণরূপ ব্রহ্ম ও প্রপঞ্চে ঐ বিরোধের কথা আসিতেই পারে না। কেননা, এই প্রপঞ্চ তাঁহা হইতেই উৎপন্ন, তাঁহাতেই অবস্থিত, এবং তাঁহাতেই প্রলীন হয়। যদি বিরোধ থাকে, তবে এই প্রপঞ্চের পূর্ব্বোক্তরূপ জন্মস্থিতি-প্রলয় হইতেই পারে না। বিরোধ থাকে বলিয়াই অগ্নি হইতে কোন অঙ্কুর উৎপন্ন হয় না, এবং সেই জন্যই অগ্নি ও অঙ্কুরের মধ্যে উৎপাদ্য-উৎপাদকভাব সম্বন্ধ থাকে না। কিন্তু কার্য্য-কারণ-স্থলে এরূপ নহে। মৃত্তিকা কারণ, ঘট কার্য্য; সুবর্ণ কারণ, কুণ্ডল কার্য্য; এতাদৃশ কার্য্য-কারণ-স্থলে

* কাশীর "চৌখাম্বা-সংস্কৃতগ্রন্থাবলীর" মধ্যে দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম পাদের ১৩ সূত্র পর্য্যন্ত বাহির হইয়াছে।

দেখিতে পাওয়া যায় যে, কার্য্যভূত ঘট ও কুণ্ডল তাহাদের কারণভূত মৃত্তিকা ও সুবর্ণের সহিত সর্ব্বদা অনুস্যূত হইয়া রহিয়াছে। এই সকল স্থানে যদি কেহ অসঙ্গতি দেখাইয়া বিরোধ আছে বলিতে চাহেন, তবে তাঁহার ঠিক বলা হয় না। শীত ও উষ্ণ বিভিন্ন বিভিন্ন আধারে থাকে, তাহাদের মধ্যে কেহ কোনটির উৎপাদক নহে,—তাহাদের মধ্যে উৎপাদ্য-উৎপাদক-রূপ কোন সম্বন্ধ নাই; এবং আধার-আধেয়-রূপ সম্বন্ধও নাই,—ইহাদের মধ্যে কোনটি অপরটির আধারও নহে; অতএব শীত ও উষ্ণের মধ্যে যে পরস্পরবিরোধ থাকিবে, তাহা ত যুক্তিসঙ্গতই। কিন্তু তাহা বলিয়াই, ঐ দৃষ্টান্তে ব্রহ্ম ও প্রপঞ্চের মধ্যে সেইরূপ বিরোধ আছে তাহা পূর্ব্ব-প্রদর্শিত কারণে বলিতে পারা যায় না।

এস্থানে কেহ বলিতে পারেন—অন্ধকার-রাত্রিতে যেমন কাহারো কোন স্থাণুতে 'ইহা স্থাণু না লোক?' এইরূপ সংশয়জ্ঞান উপস্থিত হয়,—স্থাণুতে তাহার ভেদাভেদ-জ্ঞান হইয়া থাকে, স্থাণুতে স্থাণুর ভেদ ও অভেদ উভয় বুদ্ধিই উৎপন্ন হয়। সেইরূপ ব্রহ্ম ও প্রপঞ্চ-স্থলেও 'ব্রহ্ম প্রপঞ্চ হইতে ভিন্ন ও অভিন্ন,—ব্রহ্মে প্রপঞ্চের ভেদ ও অভেদ' এইরূপ ভেদাভেদ-জ্ঞান উপস্থিত হয়। যেমন সংশয়-জ্ঞান-স্থলে পূর্ব্বোক্ত ভেদাভেদ-জ্ঞানের প্রামাণ্য নাই, সেইরূপ ব্রহ্মে যে এই ভেদাভেদ-জ্ঞান, তাহারও কোন প্রামাণ্য নাই।

ভাস্করাচার্য্য ইহার উত্তরে বলেন :—(১) ইহা স্থাণু, (২) বা লোক' ইত্যাদি সংশয়জ্ঞান-স্থলে জ্ঞানের দুইটি অংশ থাকে, এবং তাহারা পরস্পর পরস্পরের উচ্ছেদ করে। 'স্থাণু' বলিলে তখন লোক-জ্ঞান উচ্ছিন্ন হয়, এইরূপ 'লোক' বলিলে স্থাণু-জ্ঞানও উচ্ছিন্ন হয়। পরস্পর পরস্পরের উচ্ছেদ সাধন করে বলিয়াই তাহারা একত্র অবস্থান করিতে পারে না, এবং প্রমেয় পদার্থেরও নিশ্চয় হয় না। এই জন্যই সংশয়ের প্রামাণ্য স্বীকার করা হয় না। ১

কিন্তু প্রকৃত স্থলে সেরূপ নহে। মৃত্তিকা- বা সুবর্ণাদি-রূপ কারণ পূর্ব্বেই থাকে। তাহার পর ঘট- বা কুণ্ডলাদি-রূপ যে কার্য্য উৎপন্ন হয়, তাহা কারণকে আশ্রয় করিয়াই উৎপন্ন হইয়া থাকে। 'স্থাণু বা পুরুষ' ইত্যাদি সংশয়জ্ঞানে যেমন স্থাণুবুদ্ধি পুরুষ-বুদ্ধিকে, এবং পুরুষ-বুদ্ধি স্থাণুবুদ্ধিকে উপমর্দ্দিত বা উচ্ছিন্ন করে, কার্য্য-কারণ-বুদ্ধিতে সেরূপ হয় না; কার্য্যবুদ্ধি কখনই কারণবুদ্ধিকে উপমর্দ্দিত করে না; কুণ্ডলবুদ্ধি কখনই সুবর্ণবুদ্ধিকে উপমর্দ্দিত করে না। কার্য্যবুদ্ধি ও কারণবুদ্ধি এই উভয়েরই বিষয় এক, ভিন্ন নহে; কুণ্ডলবুদ্ধি ও সুবর্ণবুদ্ধি এই উভয়েরই বিষয় এক সুবর্ণ, অপর কিছু নহে। অতএব এই দুই বুদ্ধি সংশয়বুদ্ধির স্থলের ন্যায় পরস্পরকে উপমর্দ্দিত করে না। আবার যেমন স্থাণু ও পুরুষ দেশত ও কালত ভিন্ন-ভিন্ন, কার্য্যকারণ ত সেরূপ কখনও নহে; কোনো কালে বা কোনো দেশে কার্য্যকারণ স্বরূপকে উপমর্দ্দিত করিয়া পৃথগ্‌ভাবে দৃষ্টিগোচর হয় না। অতএব সংশয়জ্ঞানের ন্যায় ভেদাভেদজ্ঞানকে অপ্রমাণ বলিতে পারা যায় না। ১

কোন বস্তু কার্য্যরূপে নানা, ভিন্ন-ভিন্ন, পৃথক্ পৃথক্ প্রতীয়মান হয়। কিন্তু কারণরূপে তাহাকে একই দেখায়। কার্য্যরূপে তাহার ভেদ থাকে, কিন্তু কারণরূপে তাহার অভেদ দেখা যায়। সুবর্ণ শিল্প কারণ, আর কুণ্ডল, কঙ্কণ, বলয় প্রভৃতি কার্য্য। সুবর্ণ কঙ্কণ-কুণ্ডল-বলয়-রূপে ভিন্ন-ভিন্ন, নানা, পৃথক্; কিন্তু তাহা স্বরূপত সুবর্ণরূপে সর্ব্বত্রই অভিন্ন, এক। অতএব কার্য্যকারণ-ভাবে সুবর্ণে যেমন ভেদ ও অভেদ উভয়ই রহিয়াছে—এবং সেই জন্যই সুবর্ণকে ভিন্নাভিন্ন-স্বরূপ বলিতে হয়; সেইরূপই ব্রহ্ম কারণ, এবং এই বিচিত্র প্রপঞ্চ তাঁহার কার্য্য, এবং তজ্জন্যই কার্য্যরূপে ব্রহ্ম নানা, ভিন্ন ভিন্ন; কিন্তু কারণরূপে তাহা অভিন্ন, এক; কার্য্যরূপে তাঁহাতে ভেদ রহিয়াছে, কিন্তু কারণরূপে অভেদ। অতএব ব্রহ্ম ভিন্নাভিন্ন রূপ। ২

ভাস্করাচার্য্য এই প্রপঞ্চকে মায়াবাদীর ন্যায় মিথ্যা বলিয়া মনে করেন না, প্রত্যুত পারমার্থিক বা সত্য বলিয়া স্বীকার করেন। ইহাকে মিথ্যা বলিবার কোন কারণ নাই। প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ দ্বারা এই সংসারকে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে; যতদিন সংসারের সহিত সম্বন্ধ থাকে, ততদিনই ইহা সঙ্গে সঙ্গে রহিয়াছে, ইহা ত স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। ইহাকে কিরূপে অসত্য বলিতে পারা যায়? ইন্দ্রিয়ের দোষ থাকিলে, বা পর্য্যাপ্ত আলোকাদির অভাব হইলে কোন মিথ্যা বস্তুর দর্শন হইয়া থাকে, অস্পষ্ট আলোকে স্থাণুকে ভূত বলিয়া জ্ঞান হয়, শুক্তিকে রজত বলিয়া মনে করা যায়। কিন্তু জগৎকে যে মিথ্যা দেখা যাইতেছে, তৎসম্বন্ধে ত সেইরূপ কোন কারণ নাই। মিথ্যা, জ্ঞান হইলে তাহার বাধক জ্ঞান থাকে। শুক্তিতে রজত-জ্ঞান হইলে 'ইহা রজত নয়—ইহা শুক্তি' এইরূপ

১ "পরস্পরোপমর্দ্দন ন কদাচিৎ সহস্থিতিঃ।
প্রমেয়ানিশ্চয়শ্চৈব সংশয়স্যাপ্রমাণতা॥"
বেদান্তদর্শন, ভাস্করভাষ্য ১-১-৪।

১ বেদান্ত দর্শন—ভাস্কর ভাষ্য, ১-১-৪।

২ অতো ভিন্নাভিন্নরূপং ব্রহ্মেতি স্থিতম্। সংগ্রহশ্লোক :—
"কার্য্যরূপেণ নানাত্বমভেদঃ কারণাত্মনা।
হেমাত্মনা যথাভেদঃ কুণ্ডলাদ্যাত্মনা ভিদা॥"
বেদান্তদর্শন, ভাস্করভাষ্য ১-১-৪।

বাধকজ্ঞান পরক্ষণে উৎপন্ন হয়, এবং রজত-জ্ঞান বাধিত হয়। কিন্তু এই জগৎ-জ্ঞানকে ঐরূপ বাধিত করিতে পারে, এরূপ কোন জ্ঞান ত সংসারে পাওয়া যায় না। যাবজ্জীবন সকলেরই এই সংসারজ্ঞান একরূপই চলিয়া থাকে (বে. দ. ২. ১. ১৪)।

আরও আলোচনা করিয়া দেখা যাউক। যাঁহারা এই প্রপঞ্চকে মিথ্যা বলেন, তাঁহারা সকলের সম্বন্ধেই ইহাকে মিথ্যা বলিতে চাহেন না। ইঁহারা বলেন এই প্রপঞ্চ সাধারণ পুরুষের সম্বন্ধে সত্যই, কিন্তু মুমুক্ষুব্যক্তির সম্বন্ধে মিথ্যা। ইহা অত্যন্ত অশ্রদ্ধেয়। রূপ অন্ধের সম্বন্ধে অসত্য এবং অপরের সম্বন্ধে সত্য, ইহা কল্পনা করিতে পারা যায় না। পদার্থসমূহ মানবের স্বরূপকে অনুসরণ করে না; কোন মানব কোন বিশেষরূপের বলিয়া কোন বস্তু যে,সেইরূপ বিভিন্ন-বিভিন্ন মানবের অনুসরণে বিভিন্ন-বিভিন্ন হইবে, তাহা হয় না। যদি কোন বস্তু কৃষ্ণ হয়, তবে তাহা সকলের সম্বন্ধেই কৃষ্ণ, তাহা কোন ব্যক্তি-বিশেষের জন্য শ্বেত হইবে না। এইরূপ পুরুষবিশেষের অনুরোধে এই জগৎ সত্য, আবার অপর কোন পুরুষের অনুরোধে তাহা অসত্য, ইহা হইতে পারে না। স্তাবক হউক, বা নিন্দক হউক, সূর্য্য উভয়কেই তাপ প্রদান করে। এইরূপ প্রপঞ্চ যদি মিথ্যা হয়, তবে সকলেরই পক্ষে মিথ্যা; আর যদি সত্য হয়, তবে সকলেরই পক্ষে সত্য হইবে। অতএব এই জগৎকে মিথ্যা বলিতে পারা যায় না (বে. দ. ১. ১.৪)। পরমাত্মা ব্রহ্ম ইহার কারণ, এবং ইহা তাঁহার কার্য্য; ইহা ঐ পরমাত্মারই অবস্থাবিশেষ, এবং সেই জন্যই ইহা বস্তুভূত, সত্য।*

বেদান্তবাদীরা সকলেই ব্রহ্মকে জগতের উপাদান ও নিমিত্ত উভয় কারণই স্বীকার করেন। ইহার মধ্যে ব্রহ্মের নিমিত্তকারণ হওয়া সম্বন্ধে কোনো বাধাই নাই, উপাদানকারণ কিরূপে সম্ভাবিত হয় তাহাই বিচার্য্য ও প্রতিপাদনীয়, এবং ইহা লইয়াই বিভিন্ন মতবাদের সৃষ্টি হইয়াছে।

এ বিষয়ে নিম্বার্ক-ও ভাস্কর-দর্শনে কোনো ভেদ নাই, নিম্বার্কদর্শনে যেমন পরিণামবাদ অঙ্গীকৃত হইয়াছে, এবং পরিণাম-শব্দের ব্যাখ্যা শক্তিবিক্ষেপ করা হইয়াছে, ভাস্করদর্শনেও তাহাই, এবং তাদৃশই যুক্তি অবলম্বিত হইয়াছে।†

এই প্রপঞ্চ জড়-ও চেতন-ময়। জড় কার্য্য এবং চেতন জীব। এই জন্য পূর্ব্বোক্ত শক্তিবিক্ষেপ অনুসরণ করিয়া ভাস্করাচার্য্য বলেন যে, ব্রহ্ম কারণরূপে কার্য্যরূপে ও জীবরূপে অবস্থান করে।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে নিম্বার্কের দ্বৈতাদ্বৈত বা ভেদাভেদকে স্বাভাবিক বলা হয়, কেননা ব্রহ্মে প্রপঞ্চের ভেদ ও অভেদ উভয়ই স্বভাবিকভাবে থাকে। স্বভাবতই ব্রহ্ম জগৎ হইতে ভিন্ন ও অভিন্ন। সুবর্ণ সুবর্ণই এবং কুণ্ডল কুণ্ডলই এইরূপ দেখিলে সুবর্ণ ও কুণ্ডলের ভেদ স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। আবার যখন দেখা যায় কুণ্ডল সুবর্ণ হইতে পৃথক্ নহে, কুণ্ডল সুবর্ণাত্মকই, তখন উভয়ের অভেদও স্পষ্ট দেখা যায়। এইরূপে কার্য্যকারণের যেমন স্বভাবতই ভেদ ও অভেদ দৃষ্ট হয়, প্রপঞ্চ ও ব্রহ্মেরও সেইরূপ স্বভাবতই ভেদ ও অভেদ রহিয়াছে। ইহাই নিম্বার্কদর্শনের স্থূল কথা।

ভাস্করদর্শন এই কথাটাই আর একরূপে বলিতেছেন— কঙ্কণ, কেয়ূর, কুণ্ডলপ্রভৃতি সুবর্ণময় অলঙ্কারগুলিকে যদি আমরা কঙ্কণ-রূপে, কেয়ূররূপে, বা কুণ্ডলপ্রভৃতিরূপে দেখি, তবে সুবর্ণ হইতে তাহাদিগকে ভিন্ন করিয়া দেখা হয়, সুবর্ণের সহিত তাহাদের ভেদ প্রতীত হয়; আবার যখন দেখা যায় যে, কঙ্কণ প্রভৃতি সুবর্ণাত্মক,সুবর্ণস্বরূপ,— সুবর্ণ ছাড়া তাহারা আর কিছু নহে, তাহা হইলে তাহাদের সহিত সুবর্ণের অভেদ প্রতীয়মান হয়। তাহা হইলেই কথাটা এই দাঁড়াইতেছে যে, কার্য্যরূপে সুবর্ণে ভেদ, এবং কারণরূপে তাহার অভেদ প্রতীত হয়। সুবর্ণের এই যে ভেদ ও অভেদ দেখা যাইতেছে তাহা কেবল তাহাকে কার্য্য-ও কারণ-রূপে দেখিবার জন্য। কার্য্যকারণভাবই ঐ ভেদাভেদের প্রয়োজক। এই কার্য্যকারণভাব উপাধি অর্থাৎ কোন বিশেষ ব্যবহারের কারণ বলিয়া তৎপ্রযুক্ত ভেদাভেদ ঔপাধিক, স্বাভাবিক বা বাস্তব নহে। সুবর্ণ যখন পিণ্ডাবস্থায় থাকে তখন তাহাকে আমরা কারণ বলি, আর যখন তাহা কুণ্ডলাদি কোন বিশেষ আকৃতি ধারণ করে, তখন তাহাকে কার্য্য বলি। ইহা উপাধিমাত্র, ইহা আমরা বিশেষ বিশেষ ব্যবহারের জন্য বলিয়া থাকি; ইহা ব্যবহারমাত্র, বাস্তব নহে, কেননা কার্য্যকারণে বস্তুত কোন ভেদ নাই। জগৎ ও ব্রহ্ম সম্বন্ধেও এইরূপ। জগৎ ও ব্রহ্মের কার্য্যকারণভাব উপাধিমাত্র, এবং সেই জন্যই তৎপ্রযুক্ত ব্রহ্মে জগতের ভেদাভেদ ঔপাধিক, তাহা বাস্তব নহে।

মহাকাশ ও কর্ণচ্ছিদ্ররূপ আকাশ এই দুই আকাশ আকাশরূপে বস্তুত এক, ইহাদের বস্তুত অভেদ, ইহা স্পষ্টই বোধ হয়, এবং ইহাও বোধ হয় যে, কর্ণচ্ছিদ্ররূপ আকাশ মহাকাশেরই অংশ। কর্ণচ্ছিদ্ররূপ আকাশ ও

* "পরমাত্মনোঽবস্থাবিশেষঃ প্রপঞ্চোঽয়মত এব বস্তুত্বম্"— বেদান্তদর্শন, ভাস্করভাষ্য, ২, ২, ১৪

† "সোঽয়ং শক্তিবিক্ষেপোপসংহারবাদঃ সূরিভিরাশ্রিতঃ"—বেদান্তদর্শন, ভাস্করভাষ্য, ২, ১, ১৪; "পরমাত্মা স্বয়মাত্মানং কার্য্যত্বেন পরিণময়ামাসে ত্যর্থঃ, শক্তিবিক্ষেপং কৃতবান্ অনন্তা হি তস্য শক্তয়োঽচিন্ত্যাশ্চ, তাসাং বিক্ষেপং করোতি সৃষ্টিকালে, যথা সূর্য্যো রশ্মীনাম্, তদ্বদেব সংহরতি" —ঐ,১, ৪, ২৫।

মহাকাশ এই উভয়ের বস্তুত ভেদ না থাকিলেও 'ইহা মহাকাশ ও ইহা কর্ণ' এই ভেদব্যবহারের কারণ কর্ণ-শষ্কুলী বা কর্ণপটহ। ইহা এখানে উপাধি। অতএব মহাকাশ ও কর্ণ এই উভয়ের মধ্যে বাস্তব বা স্বাভাবিক অভেদ থাকিলেও ঔ পা ধি ক ভেদ রহিয়াছে।

এইরূপ জীব ও ব্রহ্মেরও স্বাভাবিক অভেদ থাকিলেও ঔপাধিক ভেদ আছে। জীবচৈতনা ব্রহ্মচৈতন্যের অংশ। অতএব জীবচৈতন্য ও ব্রহ্মচৈতন্য বস্তুত এক হইলেও লিঙ্গ বা সূক্ষ্ম শরীর থাকায় জীবচৈতন্যকে ব্রহ্মচৈতন্য হইতে ভিন্ন করা হয়; ঐ লিঙ্গশরীরই উভয়ের ভেদসাধক, উপাধি। লিঙ্গশরীরের অন্তর্গত মন অণু বলিয়া জীবচৈতন্যও অণু। এই অণুত্ব জীবের ঔপাধিক, কিন্তু বস্তুত সে ব্যাপক। অতএব এইরূপে জীব-চৈতনা ও ব্রহ্মচৈতন্যের স্বাভাবিক অভেদ ও ঔ পা ধি ক ভেদ থাকায়, জীব ব্রহ্ম হইতে ভি ন্না ভি ন্ন, বা অপর কথায় ব্রহ্ম জীব হইতে ভি ন্না ভি ন্ন। ইহাই ভাস্করের ঔ পা ধি ক ভে দা ভে দ বা দ। ১

নিম্বার্ক ও ভাস্কর উভয়ের মতের পার্থক্য দেখাইতে গিয়া শুদ্ধাদ্বৈতমার্ত্তণ্ডকার এইরূপই বলিয়াছেন—

"নিম্বার্ক-ভাস্করাচার্য্যৌ ভেদাভেদনিরূপকৌ।

তত্রাদ্যানাং বা স্ত বঃ স, ভাস্করানা মু পা ধি তঃ॥"

ভাস্করদর্শন-প্রসঙ্গ আমরা এই স্থানেই শেষ করিলাম। ইহার পরে শু দ্ধা দ্বৈ ত বা দ আলোচিত হইবে।

শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য্য।

হিন্দু ব্রাহ্ম।

"আত্মপরিচয়" নামক প্রবন্ধে আমরা এই কথাটি বলিবার চেষ্টা করিয়াছিলাম যে হিন্দু ব্রাহ্মরা হিন্দুই; অর্থাৎ যে ব্যক্তি হিন্দু সে ব্রাহ্ম হইলেও হিন্দু, ব্রাহ্ম না হইলেও হিন্দু। ইহাতে তত্ত্বকৌমুদী পত্রিকার সম্পাদক মহাশয় লিখিতেছেন যে, যেহেতু আদিব্রাহ্মসমাজ সামাজিক বিষয়ে "উন্নতিশীল" ব্রাহ্মসমাজের অপেক্ষা অনেক পশ্চাতে পড়িয়াছেন "তখন সমগ্র ব্রাহ্মসমাজ হিন্দু কিনা, এ কথা বিচার করিবার অধিকার আদিব্রাহ্মসমাজের কাহারও নাই। উন্নতিশীল ব্রাহ্মগণ হিন্দুত্বের সঙ্কীর্ণ গণ্ডী অনেককাল অতিক্রম করিয়াছেন।"

পরস্পরের উন্নতির তারতম্যসম্বন্ধে আমরা কোনো কথাই কহিব না, কারণ ইহা আমাদের আলোচ্য বিষয় নহে। কিন্তু সমগ্র হিন্দুসমাজের পক্ষে যাহা অন্যায় তাহা যে ব্রাহ্মসমাজের পক্ষেও অন্যায় অন্তত এ কথাটা আমাদিগকে কর্ত্তব্যের অনুরোধে বলিতে হইবে।

নিশ্চয়ই আমাদের অনেক কুসংস্কার আছে; যেমন যেমন তাহা বুঝিতে পারিব তেমনি তাহার বন্ধন কাটাইয়া উঠিব এইরূপ আশা করি—কিন্তু আমাদের এরূপ সংস্কার আদৌ নাই যে, বিচার করিয়া সত্য নির্ণয় করিবার অধিকার কেবল কোন বিশেষ উপাধির দ্বারা চিহ্নিত সমাজের লোকেরই আছে অন্য সমাজের লোকের নাই। যদিচ আমি আদিব্রাহ্মসমাজের সভ্য তথাপি ঈশ্বর আমার চিন্তা করিবার শক্তি সম্পূর্ণ অপহরণ করেন নাই; এবং কে হিন্দু ও কে হিন্দু নয় ইহা আমার পক্ষে বিচার করিবার অধিকার যদিচ "উন্নতিশীল" সম্পাদক মহাশয় কাড়িয়া লইতে চান তথাপি মনুষ্যত্বের সকল মহৎ অধিকারই আমরা যাঁহার কাছ হইতে পাইয়াছি তিনি এ সম্বন্ধে আমাদের কাহাকেও কোনো বাধা দিয়াছেন বলিয়া আমরা আদিব্রাহ্মসমাজের লোকেরা বিশ্বাস করি না।

উপবীতচিহ্নের দ্বারা সমাজে অধিকারভেদ নির্দ্দিষ্ট হয় বলিয়া যাঁহারা উপবীতধারণকে নিন্দা করেন তাঁহারা কি এ কথা চিন্তা করিবেন না যে অদৃশ্য উপবীত দৃশ্য উপবীতের চেয়ে অনেকগুণে দৃঢ়? "উন্নতিশীল ব্রাহ্ম" নামের পৈতাটা উচ্চ করিয়া তুলিয়া ধরিয়া তত্ত্বকৌমুদীর সম্পাদকমহাশয় যে জাত্যভিমান, যে কৌলীন্যগর্ব্ব প্রকাশ করিয়াছেন, জিজ্ঞাসা করি, তাহা কি সর্ব্বপ্রকার কুসংস্কারবর্জ্জিত?

উন্নতিশীল ব্রাহ্মগণ কেবলমাত্র উন্নতিশীলতার বেগে হিন্দুত্বের সঙ্কীর্ণ গণ্ডী অনেককাল হইল কাটাইয়াছেন বলিয়া সম্পাদক মহাশয় গৌরব প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু যে গণ্ডী আমাদের স্বরচিত ও কৃত্রিম নহে তাহা আমরা কাটাইতে পারি না। যেমন আমার একটা দেহের গণ্ডী আছে। এই গণ্ডীকে আশ্রয় করিয়া আমি একটি বিশেষ স্বাতন্ত্র্য লাভ করিয়াছি;—এই স্বাতন্ত্র্য যদি আমার উন্নতির প্রতিকূল ও আমার অপরাধ বলিয়া গণ্য হয় তবে বিশ্বের সহিত একাকার হইবার চেষ্টায় পঞ্চত্বলাভ ছাড়া আমার অন্য কোনো গতি থাকে না।

গণ্ডীর পরে গণ্ডী, চক্রের পরে চক্র, কাটিয়া বিধাতা এই জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন। পৃথিবীর গণ্ডী পৃথিবীর, সূর্য্যের গণ্ডী সূর্য্যের, তৃণের গণ্ডী তৃণের, মানুষের গণ্ডী মানুষের। স্বাভাবিক গণ্ডীর বিরুদ্ধে লড়াই করাই যে উন্নতিশীলতার লক্ষণ একথা মনে করিনা।

আবার আমাদের স্বরচিত গণ্ডীও আছে। কেননা,

১ দ্রষ্টব্য:—শুদ্ধাদ্বৈতমার্ত্তণ্ড, ৪০, প্রকাশটীকা; বিদ্বন্মণ্ডণ, সুবর্ণ সূত্রটীকা, ৮৪ পৃঃ (চৌখাম্বা সংস্কৃত-গ্রন্থাবলী।)

বিধাতার সৃষ্টিকার্য্যেও যেমন মানুষের সৃষ্টিকার্য্যেও তেমনি—গণ্ডী দিয়া দিয়াই গড়িয়া তুলিতে হয়। মানুষের ঘরবাড়ি একটা গণ্ডী, তাহার পরিবার একটা গণ্ডী, তাহার ব্যবসায় একটা গণ্ডী। প্রত্যেক গণ্ডীর মধ্যে বিশিষ্টতা আছে, সেই বিশিষ্টতার দ্বারা মানুষ আপন ঘরে আপন পরিবারে আপন ব্যবসায়ে স্বতন্ত্র। এমন কি সামান্য ছাতা জুতা ঘটবাটিও সরকারী নহে, এবং কেহ তাহাকে সরকারী করিবার চেষ্টা করিলেই থানায় খবর দিতে হয়।

তাই যদি হইল তবে সর্ব্বজনীনতা বলিয়া একটা পদার্থ কি একেবারেই আকাশকুসুম? যদি সকল প্রকার গণ্ডীকে, সকল প্রকার বিশিষ্টতাকে একেবারে অস্বীকার করাকেই সর্ব্বজনীনতা বলে তবে সর্ব্বজনীনতা বস্তুতই আকাশকুসুম সন্দেহ নাই। ভাইকে মানি না কিন্তু ভ্রাতৃভাবকে মানি, এ কথাটাও যেমন তেমনি সর্ব্বজনকে বিশেষ বলিয়া মানি না একটা নির্ব্বিশেষ সর্ব্বজনীনতাকে মানি ইহাও সেইরূপ মাথা-নেই-তার-মাথা-ব্যথা। প্রত্যেকের বিশিষ্টতা আছে বলিয়াই সেই অগণ্য বিশিষ্টতার মধ্যে ঐক্য উপলব্ধি করার সাধনা সর্ব্বজনীনতা—নতুবা তাহার কোনো প্রয়োজন নাই। বিশিষ্টতাকে স্বীকার করা যে কুসংস্কার এইরূপ সৃষ্টিছাড়া কথাই অন্ধসংস্কার। অতএব হিন্দুত্বের সঙ্কীর্ণ গণ্ডী কাটাইয়া যাওয়াকে উন্নতিশীলতা বা কোনো শীলতাই বলে না, তাহা একটা ব্যর্থবাক্যউচ্চারণ মাত্র।

ভূতের বিশ্বাস পৃথিবীতে সকলজাতির মধ্যেই ন্যূনাধিক পরিমাণে আছে;—যখন বলা যায় আমি এই ভূতের বিশ্বাসের কুসংস্কার কাটাইয়াছি তখন এমন কথা বলা হয় না যে আমি মনুষ্যত্বের সঙ্কীর্ণ গণ্ডী অতিক্রম করিয়াছি।

তেমনি হিন্দুসমাজে যে কুসংস্কার প্রচলিত আছে যদি কোনো হিন্দু সে সংস্কার কাটাইয়া থাকেন তবে তাঁহাকে কুসংস্কারহীন হিন্দু বলিব, অহিন্দু বলিব না। কুসংস্কারই হিন্দুর স্থায়ী পরিচয় এমন অদ্ভুত কথা কোনো মতেই বলা চলে না। একথা আমাদিগকে স্বীকার করিতেই হইবে, অন্ধসংস্কার মানুষের সকল জাতির মধ্যেই আছে কিন্তু বিধাতার রাজ্যে অন্ধসংস্কারের স্বভাবই এই যে তাহা নিত্য নহে; বস্তুত এইজন্যই উন্নতিশীল হওয়া সম্ভব, এবং এই জন্যই আদিব্রাহ্মসমাজের অথবা অন্য যে কোনো সম্প্রদায়ের মানুষ যতই মূঢ় ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন হইনা তৎসত্ত্বেও আমরা উন্নতিশীল, কারণ, আমরাও মানুষ। তাই যদি না হইবে তবে পৃথিবীতে ধর্ম্মসংস্কারকের মত উন্মত্ত পাগল আর ত কেহই নাই। সত্যমেব জয়তে, এই বাণী বিশ্বচরাচরে কেবল হিন্দুসমাজেই অসত্য, বিশ্ববিধাতা কেবল এই হিন্দুসমাজেই পরাস্ত হইয়া হাল ছাড়িয়াছেন—অসাধারণ উন্নতি লাভ করিলেও এমন কথা বলিতে পারিব না। অতএব হিন্দুসমাজের প্রচলিত ভ্রম ও অন্ধসংস্কার বর্জ্জন করার দ্বারাই যদি আমরা অহিন্দু হই তবে শিশু রাম কথা কহিতে শিখিলেই শ্যাম হইয়া যায় একথাটা বলা চলে। তাহাকে বালক রাম বা যুবক রাম বা সুবুদ্ধি রাম বল তাহাতে কোনো বাধা নাই কিন্তু তাহাকে রামই বলিব না এমন পণ করিলে মানুষের নিত্যই নূতন নামকরণ করিয়া চলিতে হয়।

যাঁহারা আমার প্রবন্ধ ভাল করিয়া না পড়িয়াই বিচলিত হইয়া উঠিয়াছেন তাঁহাদের ভাবখানা এই যে, "তুমি আমাকে হিন্দু বলিতেছ তবেই ত বলা হইতেছে আমি পৌত্তলিক, আমি জাতিভেদ মানি—আমি ইত্যাদি ইত্যাদি; তুমি নিজের সম্বন্ধে এমন কথা বলিতে পার, কেন না, তুমি কুসংস্কারাপন্ন, তুমি সাধারণ বা নববিধান ব্রাহ্মসমাজের নও, তোমার পিতা এমন কাজ করিয়াছেন, তিনি এমন কথা বলিয়াছেন ইত্যাদি ইত্যাদি।"

বস্তুত আমার পিতা যদি অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ সংস্কারের অনুদার প্রকৃতির লোক ছিলেন ইহাই প্রকৃত সত্য হয় তবে আমার পিতাকে আমি ত পিতারূপে ত্যাগ করিতে পারিব না। যদিও বা আমার কোনো একটা অপ্রকৃতিস্থ অবস্থায় তাহা আমার ইচ্ছার মধ্যেও উদয় হয় তথাপি তাহা আমার সাধ্যের মধ্যে নাই। আমারই পিতার সন্তান যে আমি এ গণ্ডী বিধাতার গণ্ডী। সুখের বিষয় এই যে এই গণ্ডী স্বীকার করিয়াও আমি সর্ব্বজনীন হইতে পারি, এমন কি, কোনো একদিন হঠাৎ কায়ক্লেশে উন্নতিশীল হইয়া উঠাও আমার পক্ষে একেবারেই অসম্ভব নহে। হিন্দুত্বের গণ্ডীর মধ্যেও বিধাতার সেই বিধান আছে বলিয়াই তাহা নানা পরিণতির মধ্য দিয়া অগ্রসর হইয়াছে এবং এখনো হইবে,—হিন্দুসমাজের মধ্যেও সেই সত্যস্বরূপ বিধাতার বিধান কাজ করে বলিয়াই এই সমাজেই আজ আমরা রামমোহন রায়ের অভ্যুদয় দেখিলাম। ইহাতেও কি বিধাতার উপরে বিশ্বাস জন্মেনা, সত্য বিধানের প্রতি নির্ভর বাড়ে না? হিন্দুসমাজে ভ্রম আছে অন্ধসংস্কার আছে সবই আছে মানি কিন্তু তাহার চেয়ে বেশি করিয়া মানি হিন্দুসমাজেও সত্য আছেন, মঙ্গল :আছেন, ব্রহ্ম আছেন। হিন্দুসমাজের মধ্যে আমি সেই সত্যের দিকে, মঙ্গলের দিকে, ব্রহ্মের দিকে দাঁড়াইব ইহাই যেন আমার সংকল্প হয়। সাধক যাঁহারা তাঁহারা সকল সমাজেই সত্যের দিকেই নিজের জীবনকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাহারই অভিমুখে সকলের দৃষ্টিকে আকর্ষণ করেন। যেখানে অসত্যের অজ্ঞানের প্রভাব বেশি সেইখানেই সত্যকে তাঁহারা দেখেন ও

সত্যকে তাঁহারা দেখান, ইহাই তাঁহাদের ব্রত। দুর্গতির মধ্যে যে সমাজ উপনীত হইয়াছে তাহাকে তাঁহারা ত্যাগ করেন না কারণ তাঁহাদের এই বিশ্বাস অটল যে দুর্গতি কখনই নিত্য হইতে পারে না, এবং যিনি পরমাগাত, তিনি দুর্গতির মধ্যেই আপনাকে একদা পূর্ণতমরূপে প্রকাশ করেন। বস্তুতঃ যথার্থ প্রেমের সাধনা, শক্তির সাধনা, সেইখানেই সেই দুর্যোগে সেই দুর্দ্দিনে। আমাদের আত্মাভিমান সেখান হইতে দূরে যাইতে চায়, আমাদের সাম্প্রদায়িক অসহিষ্ণুতা তাহার প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করিয়া বিমুখ হইয়া থাকে, কিন্তু সেই ঘৃণাই বিশ্বজনীনতার লক্ষণ নহে—কিন্তু যে দুর্গতিগ্রস্ত তাহাকেই আপন বলিয়া স্বীকার করার মধ্যেই যথার্থ সর্ব্বজনীনতা আছে। কারণ, সর্ব্বজনীনতা কেবল একটা বস্তুবিহীন বাক্যমাত্র নহে, তাহা অহঙ্কৃত আত্মপরিচয়ের একটা স্বরচিত উপাধিমাত্র নহে; তাহা প্রেমের জিনিষ এই জন্যই তাহা সত্য। সেই প্রেম সকলের চেয়ে নীচের মধ্যে আপনাকে বদ্ধ করিয়াও সকলের চেয়ে উচ্চে আপনার স্থান লাভ করিয়া থাকে, সীমার মধ্যে বাস করিয়াও প্রতিমুহূর্ত্তে সেই সীমাকে অতিক্রম করিয়া বিরাজ করে।

ব্রাহ্মধর্ম্ম হিন্দুইতিহাসের একটি বিকাশ, এই কথা আমরা বলিয়াছি। অর্থাৎ ব্রাহ্মধর্ম্ম যত বড়ই সর্ব্বজনীন ধর্ম্ম হউক না বিধাতার সৃষ্টির নিয়ম তাহাকেও মানিতে হয়, নতুবা তাহা সত্যই হইতে পারে না। অতএব বিশেষ দেশে ও বিশেষ কালে তাহার উদয় হইয়াছে ব্রাহ্মধর্ম্মের এই ঐতিহাসিক বন্ধনটুকু স্বীকার করিতে লজ্জা বা ক্ষোভের কোনো কারণ থাকিতে পারে না। যদি ইতিহাসকে মানি, যদি হিন্দুইতিহাসের মধ্যে ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রকাশরূপ ঘটনাকেই একেবারে অস্বীকার করিয়া না বসি তবে সেই ঐতিহাসিক ঘটনাটার সুস্পষ্ট অর্থই এই যে হিন্দুর প্রকৃতির মধ্যে ও অবস্থার মধ্যে এমন কতকগুলি সমাবেশ আছে যাহাতে এইধর্ম্ম এই প্রকার রূপ লইয়া এইখানেই ব্যক্ত হইতে পারিয়াছে।

হিন্দু ইতিহাসের মধ্যে এই যে ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রকাশ, ইহার কারণরূপে নানা শক্তির খেলা থাকিতে পারে। হয় ত বিদেশের আঘাত তাহার মধ্যে একটা কারণ। অর্দ্ধরাত্রে ভূমিকম্পে আমাকে জাগাইয়াছিল, তাই বলিয়া জাগরণটা ভূমিকম্পের নহে সেটা আমারই জাগরণ। যদি ইহাই প্রকৃত সত্য হয় যে, কোরাণ পুরাণ বাইবেল বৌদ্ধশাস্ত্র এবং দেশদেশান্তরের যত কিছু ধর্ম্মগ্রন্থ ও ধর্ম্মসমাজ আছে সকলে একত্রে মিলিয়া তিলোত্তমার সৃষ্টির ন্যায় এই ব্রাহ্মধর্ম্মকে সৃষ্টি করিয়া থাকে, তথাপি এইরূপ অদ্ভুত সৃষ্টি যদি হিন্দুর ইতিহাসেই সম্ভবপর হইয়া থাকে তবে তাহা হিন্দুরই। সূর্য্যের আলোক সূর্য্যেই সম্ভবপর হইয়াছে,—কেহ কেহ বলেন সূর্য্য অসংখ্য উল্কাপিণ্ডকে নিরন্তর আত্মসাৎ করিয়া সেই আলোকের সঞ্চয় রক্ষা করিতেছে; তাহা সত্যও হইতে পারে, নাও হইতে পারে, তথাপি এই আলোক সূর্য্যেরই। আমি শাক খাইয়া ফল খাইয়া দুধ মাছ ভাত খাইয়া প্রাণধারণ করিতেছি বটে তাই বলিয়া আমার প্রাণকে আমারই প্রাণ বলিয়া স্বীকার না করিয়া ঐ শাক ভাতকেই স্বীকার করিলে কি অত্যন্ত ঔদার্য্য প্রকাশ করা হয়? প্রত্যেক ধর্ম্মেরই উৎপত্তিসম্বন্ধে তর্ক আছে। কেহ বলেন, খৃষ্টানধর্ম্ম বৌদ্ধধর্ম্ম হইতে চুরি, কেহ বলেন বৈষ্ণবধর্ম্ম খৃষ্টানধর্ম্ম হইতে চুরি, এমনতর আরো অনেক বাদবিবাদ আছে—তেমনি হয়ত কালক্রমে কোনো ঐতিহাসিক প্রমাণ করিয়া দেখাইবেন ব্রাহ্মধর্ম্ম জগতের সকল ধর্ম্মের চোরাই মালের ভাণ্ডার। কিন্তু উৎপত্তিঘটিত সমস্ত বাদবিবাদসত্বেও খৃষ্টানধর্ম্ম খৃষ্টানধর্ম্মই, বৈষ্ণবধর্ম্ম বৈষ্ণবধর্ম্মই। খৃষ্টানধর্ম্ম যদি বৌদ্ধধর্ম্মকে আত্মসাৎ করিয়া থাকে, বৈষ্ণবধর্ম্ম যদি খৃষ্টানধর্ম্মকে আত্মসাৎ করিয়া থাকে তবে তাহাতে তাহার অস্তিত্বলোপ হয় নাই, তাহার গৌরব খর্ব্ব হয় নাই। অনাত্মকে গ্রহণ করিয়া আত্মীয়ে পরিণত করিবার শক্তিই জীবনের শক্তি—অনাত্মের মধ্যে আত্মবিশেষত্ব বিলুপ্ত করিয়া দেওয়াই মৃত্যুর লক্ষণ। অতএব যেমন করিয়াই বিচার করি, হিন্দুর ইতিহাসে ব্রাহ্মধর্ম্মের বিকাশ স্বদেশীয় বিদেশীয় যতকিছু কারণ-পরম্পরা অবলম্বন করিয়াই দেখা দিক্ না তথাপি তাহা হিন্দুরই সামগ্রী। এই ইতিহাস আমার ইচ্ছা অনিচ্ছার উপর নির্ভর করিতেছে না—ইহা আমার প্রিয় হইলেও, সত্য অপ্রিয় হইলেও সত্য।

কিন্তু সকলের চেয়ে আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে তত্ত্বকৌমুদীসম্পাদকমহাশয় আমার উক্তি স্বীকার করিয়াও আমার প্রবন্ধের প্রতি বিরুদ্ধভাব ধারণ করিয়াছেন। তিনি একজায়গায় স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, "ব্রাহ্মধর্ম্ম কেবল যে হিন্দুদের মধ্যেই আবদ্ধ থাকিবে তাহা নহে, ব্রাহ্মগণ কেবল যে হিন্দুবংশোদ্ভব ব্যক্তিগণের মধ্যেই অবস্থিত থাকিবেন তাহা নহে, সর্ব্বদেশের লোক এই উদার ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারিবেন।" আমি ত সর্ব্বদেশের লোককে ঠেকাইয়া রাখিবার জন্য ব্রাহ্মধর্ম্মের দরজায় কুলুপ লাগাইতে চেষ্টা করি নাই। হিন্দুও যে ব্রাহ্ম হইতে পারেন এই কথাই আমি বলিয়াছিলাম, কিন্তু "ব্রাহ্মধর্ম্ম কেবল হিন্দুদের মধ্যে আবদ্ধ থাকিবে" এমন অদ্ভুত কথা আমি কোনোদিন বলি নাই।

তত্ত্বকৌমুদীর সম্পাদকমহাশয় প্রশ্ন করিয়াছেন

ব্রাহ্মসমাজে যে সকল য়িহুদী মুসলমান য়ুরোপীয় আশ্রয় লইতেছেন তাঁহারা কি নিজেদের হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিবেন? পরিচয় নানা প্রকারের আছে—কোনোটা সঙ্কীর্ণ কোনোটা ব্যাপক। আমি ব্রাহ্ম বলিয়া আপনার পরিচয় দিলেই যে আমাকে হিন্দু পরিচয়ও গ্রহণ করিতে হইবে এমন কোনো কথা নাই। একজন ইংরেজ যে অংশে ব্রাহ্ম কেবল সেই অংশেই হিন্দুর সহিত তাঁহার দেনা-পাওনার একটা যোগ থাকিয়া গেল; তাহাতে তাঁহার লজ্জার কারণ কিছুই নাই! আমরা হিন্দু হইয়াও ইংরেজি সাহিত্যে আনন্দ পাই, য়ুরোপীয় চিকিৎসায় প্রাণ বাঁচাই, রেলগাড়িতে অসঙ্কোচে চড়ি, টেলিগ্রাফে খবর পাঠাইয়া দিই—চিন্তামাত্র করি না তাহা আমাদের পিতৃপুরুষের উদ্ভাবিত সামগ্রী কি না। এইরূপে প্রতিদিনই দেখিতেছি বিশেষ মানবজাতির কীর্ত্তিই সর্ব্বসাধারণ মানবজাতির সম্পদ।

বেদান্ত দর্শনকে ভারতবর্ষীয় দর্শন বলিয়া সম্পূর্ণ স্বীকার করিয়াও তাহাকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করাতে জর্ম্মন পণ্ডিত ডয়সনের যদি জর্ম্মনত্বে কোনো বাধা না ঘটাইয়া থাকে তবে ব্রাহ্মধর্ম্মকে হিন্দুইতিহাসের সামগ্রী বলিয়া স্বীকার করিয়াও তাহাকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে মুসলমানের বা ইংরেজের বা য়িহুদির লেশমাত্র বাধা কেন থাকিবে? সত্যকে কি মানুষ এমনি করিয়াই গ্রহণ করিতেছে না? প্লেটোর রচনা কি গ্রীসের সীমার বাহিরে অস্পৃশ্য? আরিষ্টটলের দর্শন কি মুসলমান জ্ঞানী কোনোদিন সত্য বলিয়া গ্রহণ করেন নাই এবং সেই গ্রহণ করিবার শক্তির দ্বারাই কি তাঁহার গৌরব হানি হইয়াছিল? বস্তুত ব্রাহ্মধর্ম্ম বিশেষভাবে হিন্দুর চিত্তের সমস্ত রস লইয়া বিকশিত হইয়াছে বলিয়াই অহিন্দুর পক্ষে তাহার উপাদেয়তা বাড়িয়াছে নতুবা জগৎসংসারে তাহা নিতান্তই বাহুল্য হইয়া থাকিত, তাহা একটা পুনরাবৃত্তিমাত্র হইত, তাহার মধ্যে বিধাতার কোনো বিশেষ বিধান প্রকাশ হইতে পারিত না।

তত্ত্বকৌমুদীর সম্পাদক মহাশয় অনাবশ্যক উত্তেজনার সহিত বারম্বার বলিয়াছেন, খৃষ্ট, মহম্মদ, থিওডোর পার্কার, মার্টিন লুথর মার্টিনো সকলেই আমাদের গুরু। তিনি তালিকা আরো অনেক বাড়াইয়া দিতে পারেন। তিনি যাহা বলিতেছেন তাহার সংক্ষেপ তাৎপর্য্য এই যে, মানবসমাজের মধ্যে যে দেশে যে জাতির মধ্যে যে কেহ যে কোনো সত্য আবিষ্কার ও প্রচার করিয়াছেন তিনি সেই বিষয়েই নিখিলমানবের গুরু। ইহাই সম্ভবপর বলিয়া আমরা সত্যকে অপরের নিকট হইতে গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত হই না। কিন্তু এই কথা কেবল পরের বেলাই খাটিবে নিজের বেলা খাটিবেনা? খৃষ্টানের সত্য মুসলমানের সত্য আমি গ্রহণ করিতে পারি কিন্তু আমার সত্য আমার বলিয়াই পাছে খৃষ্টান ও মুসলমান গ্রহণ না করে এইকারণেই তাহা আমার সত্য নয় এমন কথা বলিতে হইবে? বাম হাতের দিকে সত্যকে মানিব আর ডান হাতেরদিকে তাহাকে মানিব না? লইবার বেলা এক কথা আর দিবার বেলা তাহার বিপরীত?

সম্পাদক মহাশয় বলিয়াছেন, সব ধর্ম্মই যদি হিন্দুর ধর্ম্ম হইতে পারে, যদি হিন্দুর বিশেষ ধর্ম্ম কি তাহা আমরা না জানি তবে ত নিজেকে হিন্দু বলাও যা আর শাদা চেকে স্বাক্ষর করাও তা। সকল জাতির মধ্যেই ত শাদা চেকের ফাঁকা জায়গা আছে। কোনো ইংরেজ যদি এরূপ মত প্রকাশ করে যে জাতিভেদ ভাল অথবা জেনেনা প্রথা স্ত্রীপ্রকৃতির পক্ষে যথার্থ অনুকূল তথাপি সে ইংরেজ। ইংরেজ তাহার সকল বিষয়ে সকল মতই একেবারে অবিচলিতরূপে পাকা করিয়া স্থির হইয়া বসিয়াছে বলিয়াই প্রত্যেক ইংরেজ আপনাকে ইংরেজ বলিবার অধিকার পাইয়াছে ইহাই কি সত্য? প্রত্যেক ইংরেজের হাতেই শাদাচেকের খাতা আছে তাহাতে তাহার আপনাকে ইংরেজ বলিবার কোনো বাধা ঘটে নাই। সেইরূপ আমরা দেখাইয়াছি হিন্দু কোনো বিশেষ নির্দ্দিষ্ট ধর্ম্মের বা মতের পরিচায়ক নহে কিন্তু সেই জনাই যদি হিন্দু বলিয়া কিছুই না থাকে তবে মানুষ বলিয়াও কিছু থাকে না, তবে কেহ বলিয়াও কেহ নাই। আমি যে একজন বিশেষ নামধারী ব্যক্তি, আমার ব্যক্তিত্ব আশ্রয় করিয়া অসংখ্য পরিবর্ত্তন প্রবাহিত হইয়া চলিয়াছে,—ছেলেবেলা হইতে আজ পর্য্যন্ত আমি কত ভুল বুঝিয়াছি ও সে ভুল ছাড়িয়াছি কত মত লইয়াছি ও বিসর্জ্জন দিয়াছি, শিক্ষকমহাশয়ের দ্বারা কাটাকুটিকরা আমার রাশি রাশি এক্সের্সাইজ বহির সঙ্গে আর আমার অদ্যকার শিক্ষার একেবারে আকাশ-পাতাল প্রভেদ, আশৈশবকাল হইতে আজ পর্য্যন্ত নিজের সমস্ত খুঁটিনাটি যদি বিচার করিয়া দেখি ত দেখিব মতে ভাবে কর্ম্মে আত্মবিরোধের আর অন্ত নাই কিন্তু তৎসত্ত্বেও সেই সমস্ত বিরোধ ও অনৈক্যগুলিও একটি গভীরতম ঐক্যসূত্রে গ্রথিত হইয়াছে; সেই সূত্রটি আচ্ছন্ন, তাহাকে প্রত্যক্ষ করিয়া নির্দ্দেশ করা কঠিন;—অনৈক্যের পরম্পরাটাই বাহিরে প্রকাশমান—তবু যে লোক দেখিতেছে সে এই অনৈক্যের মালাকেও মালা বলিয়া দেখিতেছে—সে প্রতিদিনের ভূরি ভূরি বিচ্ছেদের মধ্যেও আমাকে বিচ্ছিন্ন পদার্থ বলিয়া ভ্রম করিতেছে না। অতএব, যেমন সকল জাতিরই, যেমন সকল মানুষেরই, তেমনি হিন্দুরও ইতিহাসে মতের ধর্ম্মের আচারের পরিবর্ত্তনহীন অবিচলিত ঐক্য নাই, সেরূপ ঐক্য থাকিতে পারে না, এবং না থাকাই মঙ্গল।

সেরূপ নিশ্চল ঐক্য আছে বলিয়া যাঁহারা গৌরব বোধ করেন তাঁহাদের সেই গৌরববোধ কাল্পনিক—সেরূপ ঐক্য নাই বলিয়া যদি কেহ অবজ্ঞা প্রকাশ করেন তবে তাঁহাদের সেই অবজ্ঞাও একেবারে অযৌক্তিক।

ভারতবর্ষে হিন্দুজাতির সহস্র বিচ্ছিন্নতার মাঝখানে যে এক প্রবল শক্তি গভীরভাবে কাজ করিতেছে সেই শক্তি আর্য্যের সঙ্গে অনার্য্যকে রক্তে রক্তে মিলাইয়া দিয়াছে; সেই শক্তি শক হূন এবং গ্রীক উপনিবেশগুলিকে আত্মসাৎ করিয়া ফেলিয়াছে; সেই শক্তি শত শত ধর্ম্ম মত ও আচারকে আপনার মধ্যে স্থান দিয়াছে এবং সেই শক্তিই সকল ধর্ম্মের অনৈক্যের ভিতর দিয়া অনন্ত সত্যের একটি সুমহৎ ঐক্যকে উপলব্ধি করিবার সাধনায় প্রবৃত্ত হইয়াছে। তাহার কার্য্যক্ষেত্র অতি বৃহৎ তাহার উপকরণ অতি বিপুল বলিয়াই তাহার বাধাও পর্ব্বতপ্রমাণ—কিন্তু এই বাধাই তাহার নিত্য নহে; সে মহত্তম সত্যকে চায় বলিয়াই গুরুতর ভ্রান্তির সহিত পদে পদে তাহাকে লড়াই করিতে হইতেছে; সে যে সামঞ্জস্যকে ঘটাইয়া তুলিবার দায়িত্ব নিজের স্কন্ধে লইয়াছে তাহা সঙ্কীর্ণ নহে বলিয়াই তাহার অনৈক্যভারে সুদীর্ঘপথ সে এমন পীড়িত হইয়া চলিয়াছে কিন্তু তৎসত্ত্বেও এই অনৈক্যরাশিই তাহার চরম সঞ্চয় নহে। আজ যদি এই হিন্দুর ইতিহাসের সমস্ত শিক্ষার ভিতর দিয়া আমরা কোনো একটি ঐক্যের উপলব্ধিকে পাইয়া থাকি তবে অকৃতজ্ঞের মত কি আমরা এমন কথা বলিতে পারি যে, সাধনা যাহার সিদ্ধি তাহার নহে; এতদিনের দায় বহনটা রহিল হিন্দুর আর সেই দায়শোধের অঙ্কটা কেবলমাত্র আমাদের সাম্প্রদায়িক ক্ষুদ্রখাতায় জমা করিয়া লইব এবং তাহাকেই নাম দিব অসাম্প্রদায়িকতা? যেখানেই হিন্দু ইতিহাসের সফলতা সেইখানেই আমি তাড়াতাড়ি সকলকে ঠেলিয়া ঠুলিয়া সকল হিন্দুর সঙ্গে পৃথক হইয়া নিজের আসনটা চৌকা করিয়া পাতিয়া লইয়া চারিদিকে সাম্প্রদায়িকতার বেড়া তুলিয়া দিব এবং উচ্চৈঃস্বরে বলিতে থাকিব, এস খৃষ্টান, এস মুসলমান, এস য়িহুদী, আমরা ব্রহ্মনামের সদাব্রত খুলিয়াছি, কিন্তু এই সদাব্রতের আয়োজনটি হিন্দুর নহে ইহা কেবল আমাদেরই এই কয়জনের; ইহার মধ্যে অতীতের কোনো সাধনা নাই, চিরন্তন-কালের ঐতিহাসিক পরীক্ষাশালার কোনো ছাপ নাই, মানবসমাজে সত্যমাত্রই বিধাতার স্বহস্তস্বাক্ষরিত যে একটি বিশেষ দেশকালের পরিচয় লইয়া আসে ইহার মধ্যে সেই স্বাক্ষর নাই, সেই পরিচয় নাই—এই যে আমাদের ভাবাবেগ, এই যে আমাদের আইডিয়াল, কবন্ধের মত ইহার মুণ্ড নাই কেবল দেহ আছে, ইহার বিশেষত্ব নাই কেবল বিশ্বত্ব আছে; ইহা নিজের পায়ের তলার আশ্রয়কে মাটি বলিয়া অবজ্ঞা করে এবং শূন্যের উপর দাঁড়াইয়া জগৎকে আলিঙ্গন করিতে চায়, তাহাও নিজের হাত দিয়া নহে পাছে সেই নিজত্বের দ্বারা বিশ্বজনীনতার খর্ব্বতা ঘটে।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বুদ্ধচরিত।

আজ যে মহাপুরুষ-চরিত্র আমাদের হৃদয়ে উপলব্ধি করিবার নিমিত্ত এখানে আসিয়া সকলে মিলিত হইয়াছি তাঁহার জীবন এত মহান যে আমরা কল্পনায় আনিতে পারি না।

নদী যে প্রকার পর্ব্বতের নিবিড়তম গহ্বর হইতে বিন্দু বিন্দু করিয়া বারিসংগ্রহপূর্ব্বক দেশকে সুশীতল এবং উর্ব্বর করিয়া চলিয়া যায়, তাহা যেমন আমরা কল্পনা করিতে পারি না, সেই প্রকার এই মহাপুরুষের জীবনপ্রদীপও যে কোন নিবিড়তম স্থান হইতে জ্বলিয়া কত শত লোককে আলোক প্রদান করিয়াছে তাহা আমরা হৃদয়ে উপলব্ধি করিতে পারি না। কোন মহাপুরুষের জীবনের ঘটনাবলীকে জানিলেই তাঁহার ধর্ম্মজীবনের আদর্শকে যথার্থভাবে জানা হয় না, তাঁহার মূলগত প্রেমকে জানিতে পারিলেই তাঁহাকে সর্ব্বতোভাবে জানা হয়। এই জ্যোৎস্নাবিধৌত রাত্রিতে কি প্রকারে যে এই মহাপুরুষের ধর্ম্মজীবনদ্বারা আমাদের হৃদয়কে পূর্ণ করিব, তাহা ভাবা কঠিন! মহাপ্রভু বুদ্ধদেব শিষ্যদিগকে একদিন যে উপদেশ দিয়াছিলেন তাহার দ্বারা এই মহাপুরুষের ধর্ম্মজীবনের আদর্শকে আমরা হৃদয়ে গ্রহণ করিব। বুদ্ধদেব তাঁহার শিষ্যগণকে এই বলিয়া উপদেশ দিয়াছিলেন।

"দেখ সিদ্ধিকে আমরা তিন ভাবের সাধনার দ্বারা পাইতে চেষ্টা করি। এক রকম অধঃকুম্ভ; আর এক প্রকার উৎসঙ্গ বদর, এবং অন্য প্রকার উর্দ্ধকুম্ভ। অধঃকুম্ভ অর্থ হচ্ছে এই যে একটি কলসিকে নিম্নদিকে মুখ করিয়া তাহা জল দ্বারা পূর্ণ করা। কিন্তু এই প্রণালীতে একটি কলসীকে জল দ্বারা পূর্ণ করা অসম্ভব, কারণ ইহা যতক্ষণ চাপিয়া জলের নীচে রাখা যায়, ততক্ষণ জলের নীচে থাকিবে, কিন্তু যেমনি ইহাকে জল হইতে তোলা হইবে, অমনি ইহা একটি শূন্য কলসী ভিন্ন আর কিছুই থাকিবে না। ইহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে, ইহাকে জলের নীচে যতক্ষণ চাপিয়া রাখা হইয়াছিল, ততক্ষণ ছিল, কিন্তু একবিন্দু জলও কলসীতে প্রবেশ

করে নাই। উৎসঙ্গ বদরী হচ্ছে এই যে কতকগুলি কুলকে সংগ্রহ করিয়া কাপড়ে না বাঁধিয়া কোলে রাখিয়া দেওয়া; কিন্তু এই প্রণালীতে কুলসংগ্রহ করা বিড়ম্বনামাত্র, কারণ যতক্ষণ বসিয়া থাকা যায়, ততক্ষণ কুলগুলি কাপড়ে থাকে, আর যেমনি উঠা তেমনি সবগুলি পড়িয়া যায়, আর পাওয়া যায় না। শেষ সাধনা হচ্ছে ঊর্দ্ধকুম্ভ, এই প্রণালীতে কলসীটি অতি সহজেই পূর্ণ করা যায়। যুবতী যখন ঊর্দ্ধদিকে মুখ করিয়া কলসীটি পূর্ণ করিতে চায়, তখন ইহা সহজেই পূর্ণ হয়, তাহাকে আর অধিক ক্লেশ পাইতে হয় না। কিন্তু কলসীটি একবার পূর্ণ হইলে আর উঠিতে চায় না, তবু যুবতী ত তখন কলসীটি ফেলিয়া যান না, কারণ তিনি জানেন এই কলসীর জল দ্বারা অনেক ময়লা ধৌত করিতে হইবে, সুতরাং তখন তিনি ইহা বহন করিয়া গৃহে লইয়া আসেন। আমাদের জীবনের মধ্যে এই তিন প্রকার সাধনা আছে। সংসারের একপ্রকার লোক আছেন যাঁহারা অধঃকুম্ভের ন্যায় বাহিরের শাসনদ্বারা সাধনপ্রণালীর মধ্যে বলপূর্ব্বক ধৃত হইয়া থাকেন। তাঁহারা নির্দ্দিষ্ট নিয়মের অনুরোধে ধর্ম্মমন্দিরে যাইতে, ধর্ম্ম করিতে বাধ্য হন, কিন্তু অধঃকুম্ভের ন্যায় তাঁহাদের অন্তরে একবিন্দুও ভক্তিরস, বা ধর্ম্মভাব প্রবেশ করে না। যতক্ষণ কঠিন নিয়মের শৃঙ্খলে তাঁহাদিগকে আবদ্ধ রাখা হয়, ততক্ষণ তাঁহারা বাহিরের দিক দিয়া কিছু শুনিয়া যান কিছু করিয়া যান বটে কিন্তু তাঁহাদের হৃদয়ে কিছুই প্রবেশ করিতে পারে না, এরূপ ধর্ম্মসাধনের কোন সার্থকতা নাই। এই ত গেল অধঃকুম্ভের কথা। কিন্তু সংসারে আর এক শ্রেণীর লোক আছেন, যাঁহার উৎসঙ্গ বদরীর ন্যায় সাধনা করিয়া থাকেন তাঁহারা নিজ হইতেই ইচ্ছা করিয়া ধর্ম্মমন্দিরে গমন করেন, ধর্ম্মব্রত পালন করেন, কোন কঠোর নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া এ সকল কাজ করেন না। যাহা কিছু উপদেশ পান, তাহা মন দিয়া শুনেন, কিন্তু উৎসঙ্গ বদরীর ন্যায় হৃদয়ে বাঁধিতে পারেন না। যেমনি তাঁহারা আসন হইতে উঠেন তেমনি আল্গা ফুলের ন্যায় সব ঝরিয়া পড়িয়া যায়। অবশেষে শূন্যহৃদয়ে তাঁহাদিগকে ঘরে ফিরিতে হয়। এই প্রকার সাধনাতেও আমাদের কোন সার্থকতা নেই, কারণ যাহা কানে শুনি, যাহা মনে ভাবি তাহা যদি হৃদয়ের প্রতি গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে নিবদ্ধ করিতে না পারি, তবে আমরা পাইলাম কি? যতক্ষণ উপাসনামন্দিরে থাকিলাম, ততক্ষণ হয়ত ক্ষণকালের জন্য আনন্দ পাইতে পারি, কিন্তু এই ক্ষণকালের আনন্দের দ্বারা আমাদের জীবনকে কি করিয়া পূর্ণ করিব? তবে কোন্ সাধনার দ্বারা আমরা সাধনার ধনকে জীবনের মধ্যে উজ্জ্বলতর করিতে পারিব? আমাদের সেই ঊর্দ্ধকুম্ভ সাধনা চাই, ইহার দ্বারাই আমাদের হৃদয়কে পূর্ণ করিতে হইবে। পৃথিবীতে যাঁহারা এই প্রণালীতে সাধনা করিয়াছেন, তাঁহারাই ধন্য হইতে পারিয়াছেন, নিজের মধ্যে পূর্ণ হইতে পারিয়াছেন। এই সাধকেরা যখন মন্দিরে প্রবেশ করেন, তখন তাঁহারা কোন বিধিসূত্রে বা নিয়ম রক্ষার জন্য আসেন না, নিজের হৃদয়ের ব্যাকুলতা লইয়া তাঁহারা আসেন। একটি কলসীকে সোজাভাবে জলপূর্ণ করিতে গেলে, যে প্রকার কোন বাধা পাইতে হয় না, সেই প্রকার তাঁহাদিগকে ভক্তিরসে, প্রেমরসে, পূর্ণ করিতে কিছুমাত্র বিঘ্ন ঘটে না। তাঁহারা নিজ হইতেই ভাবসমুদ্রে ডুবিয়া যান, তবে কিনা এই ঊর্দ্ধকুম্ভের ন্যায় একবার ডুবিয়া আর তাঁহারা সংসারে আসিতে চাহেন না। কিন্তু তখন কি তাঁহারা না আসিয়া থাকিতে পারেন?—কিছুতে পারেন না, কারণ তাঁহারা জানেন এই ভক্তিরস দ্বারা অনেক লোকের তৃষ্ণা দূর করিতে হইবে, অনেক লোকের মনের ময়লা ধৌত করিতে হইবে। সুতরাং তাঁহারা সেই যুবতীর ন্যায় হৃদয়কে পূর্ণ করিয়া সাধনাক্ষেত্র হইতে কর্ম্মক্ষেত্রে আগমন করেন, এবং সেই ভক্তিরসদ্বারা শত শত লোকের তৃষ্ণা নিবৃত্তি করেন, এবং শত শত লোকের মনের মলিনতা ধৌত করিয়া তাহাদিগকে নূতন জীবন দান করেন।" বুদ্ধদেব তাঁহার শিষ্যদিগকে এই উপদেশ দিয়াছিলেন।

অদ্য এই জ্যোৎস্নাপ্লাবিত রজনীতে, এই মধুর বসন্ত সমীরণে এই শেষোক্ত সাধনার দ্বারাই আমাদের হৃদয়কে পূর্ণ করিতে হইবে। কিন্তু এই প্রণালীতে পূর্ণ হইতে হইলে, আমাদিগকে বক্র থাকিলে হইবে না, সোজা হইতে হইতে এবং অনেকদিন পূর্ব্ব হইতে প্রস্তুত হইয়া থাকিত হইবে, দুই একদিনের সাধনাতে ত তাঁহার দান গ্রহণ করিবে পারিব না। কিন্তু দেখ বৃক্ষ যখন বসন্তরাজের নিকট হইতে নূতন পত্র গ্রহণ করে, তখন সে আপনার সমস্ত শুষ্ক পুরাণো পাতা ঝরাইয়া ফেলে সেইরূপ আমাদের হৃদয় হইতেও প্রথমে সমস্ত জীর্ণতা ব্যর্থতা দূর করিয়া তাঁহার দান গ্রহণ করতে হইবে। আর একটি কথা বলিয়াই আমি আজিকার উপাসনা শেষ করিব।

আমরা যে মহাপুরুষকে স্মরণ করিবার জন্য এখানে সমবেত হইয়াছি তাঁহার সাধনাক্ষেত্র বুদ্ধ গয়াতে, সুদূর চীন, জাপান, ব্রহ্মদেশ প্রভৃতি স্থান হইতে কত সাধক, আত্মীয়পরিজন ত্যাগ করিয়া ব্যাকুলভাবে আসিয়া ধ্যান করিতেছেন, তাহা বোধ হয় তোমরা জান। আমি তাহারি একটি ঘটনা বলিব। বুদ্ধদেব যে বোধিবৃক্ষের তলায় বসিয়া সাধনা করেন আমি একদিন সেই স্থান দর্শন করিতে একবার বুদ্ধগয়াতে গিয়াছিলাম। সেখানে গিয়া দেখি অনেক বিদেশীয় লোক ঐ বৃক্ষমূলে বসিয়া চক্ষু

মুদ্রিত করিয়া এই মহাপুরুষের ধ্যান করিতেছেন। একটি সাধকের উপর আমার চক্ষু বিশেষরূপে আকৃষ্ট হইল—দেখিলাম তিনি একটি জীর্ণ বস্ত্র পরিয়া একমনে বুদ্ধদেবের স্তোত্র পাঠ করিতেছেন। তাঁহাকে দেখিয়া একজন বিদেশীয় বড়লোক বলিয়াই মনে হইল। এই ভক্তটির সঙ্গে আলাপ করিতে আমার ইচ্ছা হইল, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে—ঐ ভক্তটি একঘণ্টার মধ্যে চক্ষু উন্মীলন করিলেন না; পরদিন সকাল বেলা আবার আমি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলাম, ঐদিন ঘণ্টা-খানেক পরে চক্ষু খুলিলে, আমি তাঁহার নিকটবর্ত্তী হইয়া নামধাম জিজ্ঞাসা করিলাম। শুনিলাম তিনি শ্যামদেশের একজন বণিক্। তিনি হৃদয়ের শান্তির নিমিত্ত স্ত্রীপুত্র পরিজন ত্যাগ করিয়া বিদেশে আসিয়া এই মহাপুরুষের ধ্যান করিতেছেন। সাধকটি অতি সরলভাবে আমার নিকট আসিয়া বলিলেন, প্রায় দুইবৎসর যাবৎ আমি এখানে এই মহাপুরুষের সাধনা করিতেছি, কিন্তু এখন পর্য্যন্ত তাঁহাকে লাভ করিতে পারি নাই, আর কতদিন পর্য্যন্ত যে তাহাকে ডাকিব তাহাও জানি না। এ ভক্তটির কথায় বার্ত্তায় আমি মুগ্ধ হইয়া গেলাম। ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিলাম যেন তাঁহার কামনা পূর্ণ হয়।

হে বৎসগণ, আমাদেরও তাঁহাকে পাইবার নিমিত্ত এইরূপ একাগ্রচিত্তে সাধনা করিতে হইবে। এক দুই দিনের ডাকে তাঁহাকে পাওয়া যায় না। তাঁহাকে পাইতে হইলে অনেকদিন, এমন কি, চিরজীবন প্রস্তুত হইতে হইবে। *

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ
হরিঃ ওঁ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

গত ১৪ই এপ্রেল আটলাণ্টিক মহাসাগরে যে হৃদয়বিদারক শোচনীয় দুর্ঘটনা সঙ্ঘটিত হইয়াছে পৃথিবীর ইতিহাসে তাহার তুলনা বিরল। ইংলণ্ড ও আমেরিকার মধ্যে যাত্রী লইয়া জাহাজ চালাইবার জন্য অনেকগুলি কোম্পানি আছে—হোয়াইট ষ্টার লাইন তাহাদের মধ্যে অন্যতম। সম্প্রতি হোয়াইট ষ্টার কোম্পানি টাইট্যানিয়া নামক যে জাহাজখানি নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন আয়তনে, দ্রুত গতিতে ও আরোহীদিগের সর্ব্বপ্রকার স্বাচ্ছন্দ্য, আয়াস ও বিলাসের ব্যবস্থায় তাহা অদ্বিতীয় ছিল। সাধারণত সমুদ্রে জাহাজের যে সমুদায় বিপদ ঘটে তাহা হইতে রক্ষা করিবার জন্য বিজ্ঞান যত প্রকার কৌশল উদ্ভাবন করিতে পারে এই জাহাজনির্ম্মাণে তাহার কোনই ত্রুটি করা হয় নাই। এমন কি এই জাহাজ নির্ম্মিত হইলে, ইহার নির্ম্মাতা-গণ বলিয়াছিলেন যে বরঞ্চ জলে কর্ক ডুবান সম্ভব হইবে তবুও ইহাকে ডুবান সম্ভব হইবে না। এই মত বিশ্বাসে প্রতারিত হইয়া জাহাজের সত্ত্বাধিকারী-গণ উপযুক্ত সংখ্যক Life Boat-এর সংস্থান করেন নাই—Search light-এর ব্যবস্থা করেন নাই—যাহারা পাহারা দেয় তাহাদিগকে দূরদৃষ্টির যন্ত্র পর্য্যন্ত দিতে অবহেলা করিয়াছিলেন। এইরূপে প্রায় আড়াই হাজার লোক লইয়া জাহাজখানি গত ১০ই এপ্রেল ইংলণ্ড হইতে আমেরিকার অভিমুখে যাত্রা করে। আশা ছিল ১৭ই এপ্রেল রাত্রে নিউইয়র্ক পৌছিবে। মানুষ নিজের বুদ্ধির অহঙ্কারে আত্মহারা হইয়া নিঃশঙ্ক-চিত্তে দৃঢ়তার সহিত আপনার অভিষ্ট পথ আঁকিয়া লয় কিন্তু কোন অদৃশ্য বিরাট মহাশক্তি মুহূর্ত্তের আঘাতে তাহার সমুদায় সংকল্প চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া দেন ও নিমেষে বুঝাইয়া দেন, তাহার সমুদায় জ্ঞান বিজ্ঞান বুদ্ধি কৌশল সত্ত্বেও সে কতই অকিঞ্চিৎকর। দুর্ঘটনার কিছু পূর্ব্বেই টাইটানিকের কর্ম্মচারী তারে সংবাদ পাইলেন, নিকটে প্রকাণ্ড হিমশিলা (Iceberg) রহিয়াছে। কিন্তু এ সংবাদেও কোনও বিপদের আশঙ্কা ক্যাপটেনের মনে স্থান পাইল না। তিনি জাহাজের গতি সংযত করিলেন না অথবা অন্য কোনও প্রকার সতর্কতা অবলম্বন করিলেন না। জাহাজ পূর্ণবেগে অগ্রসর হইতে লাগিল। চারিদিকে সমুদ্র প্রশান্ত স্থির। কোথাও বাতাসের চিহ্নমাত্র ছিল না—কোনও বিপদের আশঙ্কার লেশমাত্রও কাহারও মনে হয় নাই। এমন সময় জাহাজ একেবারে একখণ্ড ভাস-মান হিমশীলার উপর আসিয়া পড়িল। সামান্য একটু ধাক্কা লাগিল—জাহাজের কোন আরোহী তাহা বড় একটা অনুভব করিতেও পারেন নাই। কিন্তু জাহাজের তলদেশ একেবারে বিদীর্ণ হইয়া গিয়াছিল। জাহাজ রক্ষার আর কোনও উপায় নাই দেখিয়া ক্যাপটেন সমু-দায় আরোহীদিগকে সমবেত হইতে আহ্বান করিলেন। জাহাজের আরোহী সংখ্যা ২৩৪০ কিন্তু লাইফ্ বোটে ৯ শতের অধিক লোকের স্থান ছিল না। অবশিষ্ট প্রায় ১৫ শত লোক ধীরচিত্তে মৃত্যুর প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। ক্যাপটেন্ হুকুম দিলেন, বালক ও স্ত্রী-লোকগণ প্রথমে নৌকায় উঠিবে, পুরুষেরা সরিয়া দাঁড়াও। জাহাজের অশিক্ষিত নাবিকগণ পর্য্যন্ত প্রাণের

* বুদ্ধদেবের মৃত্যুসাম্বৎসরিক ফাল্গুনপূর্ণিমাতিথিতে শান্তিনিকে-তন প্রান্তরে শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয় কর্ত্তৃক প্রদত্ত উপদেশের সারমর্ম।

ভয়ে বিচলিত হইল না। স্থিরচিত্তে আপন আপন কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতে লাগিল, অসহায় স্ত্রীলোক এবং বালকদিগকে নৌকায় উঠাইতে সাহায্য করিতে লাগিল। জাহাজের তারের সংবাদদাতা চারিদিকে জাহাজের বিপদবার্ত্তা প্রেরণ করিতে লাগিলেন। শীতল জল তাঁহার ক্যাবিনের মধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিল কিন্তু তাঁহার ভ্রূক্ষেপ নাই, নিজের জীবন তুচ্ছ করিয়া অন্যের প্রাণরক্ষার উপায় করিতে তিনি ব্যস্ত রহিলেন। আমেরিকার বিখ্যাত ধনকুবের অ্যাসটর সাহেব, আমেরিকার প্রেসিডেন্টের শরীররক্ষক মেজর বাট সকলকে উৎসাহিত করিতে লাগিলেন। কত স্ত্রীলোক তাঁহাদের স্বামীদিগকে ছাড়িয়া যাইতে কিছুতেই সম্মত হইলেন না।

এই দারুণ দুর্ঘটনায় মৃত্যুর সম্মুখে দাঁড়াইয়া জাহাজের আরোহী ও নাবিকগণ যে নির্ভীকতার পরিচয় দিয়াছে তাহা হইতে এই কথাই আমাদের কাছে নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হইয়াছে যে, এ নির্ভীকতা ও বীরত্ব শুধু তাহাদের আপনার জিনিস নহে—ইহার পশ্চাতে কত যুগের কঠিন কর্ত্তব্যনিষ্ঠা ও আত্মত্যাগের জাতীয় তপস্যা রহিয়াছে। সেই তপস্যাই সমস্ত জাতিকে একটি সুদৃঢ় চরিত্রবল দান করিয়াছে—তাহাই অতগুলি আরোহীকে আসন্ন মৃত্যুর সম্মুখেও কর্ত্তব্যে স্থির রাখিয়াছে—ধনকুবেরকে বিলাসীকেও লেশমাত্র বিচলিত বা চঞ্চল হইতে দেয় নাই। ইহা কি কম বিস্ময়কর ব্যাপার! জগতের ইতিহাসে এমন ঘটনা কয়টি বা ঘটিয়াছে!

লাইফ বোটে যখন শেষ যাত্রী তোলা হইল তখন ক্যাপ্টেন আদেশ দিলেন—তোমরা তোমাদের কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়াছ এক্ষণে আমি তোমাদিগকে মুক্তি দিতেছি, নিজদিগকে রক্ষা করিবার চেষ্টা কর। তখন জাহাজের নাবিকগণ মগ্নপ্রায় জাহাজের উপর ব্যাণ্ড বাজাইতে লাগিল—Nearer my God to Thee আরও তোমার কাছে নিকটতর কর হে প্রভু! অল্পক্ষণ পরে সকলই ফুরাইল। জাহাজ সমুদ্রের অতলগর্ভে ডুবিয়া গেল।

মানুষের একটি বিরাট স্বরূপ আছে অনেক সময়েই মানুষ তাহার পরিচয় পায় না। কত ক্ষুদ্রতার আবরণ তাহা ঢাকিয়া রাখে। কিন্তু যখনই কোনও আঘাতে তাহার এই আবরণ ভাঙ্গিয়া যায় এবং প্রকৃত স্বরূপ বাহির হইয়া পড়ে তখন আমরা দেখি এই ক্ষুদ্রতা, নীচতার মধ্যে তাহার কত বড় আত্মা লুকায়িত আছে। অহঙ্কার, লোভ, মোহ, মৃত্যুভয়, যশলিপ্সা তাহাকে পদে পদে বিভ্রান্ত করে ও তাহার প্রকৃত স্বরূপকে সঙ্কুচিত করিয়া রাখে। কিন্তু যখনই ইহার একটা পর্দ্দা একটু সরিয়া যায়, তখনই মানুষ যে কত বড় তাহা দেখিয়া আমরা অবাক হইয়া যাই। টাইটানিয়ার আরোহিগণ যখনই তাহাদের মৃত্যুভয় জয় করিল, তখনই তাহাদের সত্যস্বরূপ প্রকাশিত হইয়া পড়িল—তাহাদের জাতিকুল, ধনের বিভাগ ঘুচিয়া গেল—সকল দুর্ব্বলতা চাঞ্চল্য চলিয়া গেল তখন প্রকৃতই সকলে বোধ করিতে লাগিল—"Nearer my God to Thee"

আরোহিগণের মধ্যে মানববন্ধু নির্ভীকচেতা ষ্টেড্ সাহেব ছিলেন। বারান্তরে আমরা তাঁহার কথা বলিব।

সম্প্রতি ইংলণ্ড, তুরস্ক ও ইটালীর মধ্যে সন্ধিস্থাপনের প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছেন। এই মহৎ উদ্দেশ্যে কৃতকার্য্য হইলে ইংলণ্ড যে শুধু মুসলমানগণের কৃতজ্ঞতাভাজন হইবেন তাহা নহে, প্রাচ্য পাশ্চাত্য সকল জাতির আশীর্ব্বাদ তাঁহার মস্তকে বর্ষিত হইবে। শুনা যায় ইংলণ্ডের প্রস্তাবে ইটালি যে উত্তর প্রদান করিয়াছেন তাহাতে তাঁহার শান্তিস্থাপনকল্পে আগ্রহ লক্ষিত হয়। তুরস্কও ত্রিপলিতে তাহার অধিকার অক্ষুণ্ণ থাকিলে সন্ধিস্থাপনে অনিচ্ছুক নহে। বাণিজ্যবিস্তারের দুরাকাঙ্ক্ষা কোনও প্রকার ন্যায় ও ধর্ম্মের বাধা স্বীকার করিতে চায় না—ইউরোপীয় সভ্যতার এই কলঙ্ক কতদিনে অপনীত হইবে বিধাতাই জানেন। এইরূপ বাণিজ্যবিস্তারে কেবল মুষ্টিমেয় ধনীরই লাভ, প্রজাসাধারণের ভাগ্যে রক্তপাত ও করভারগ্রহণই অবশিষ্ট থাকে। সম্প্রতি মরক্কো লইয়া ফ্রান্স জর্ম্মনী ও ইংলণ্ডে যে ভীষণ সমরানল প্রজ্জ্বলিত হইবার উপক্রম হইয়াছিল, জর্ম্মনীর প্রজাসাধারণ তাহার তীব্র প্রতিবাদ করিয়া জগতের সমক্ষে এই বাণিজ্যবিস্তারনীতির অসারতা ঘোষণা করিয়াছেন। ভরসা করা যায় ইউরোপীয় অন্যান্য দেশেরও প্রজামণ্ডলী এই ভ্রম বুঝিতে পারিবেন এবং জগতের শান্তি, দুর্ব্বলের অধিকার অব্যাহত ও অক্ষুণ্ণ থাকিবে।

অবাধ প্রতিযোগিতা পাশ্চাত্য দেশসমূহে এতদিন মূলমন্ত্র ছিল। তাহার ফলে ব্যবসায়ের লাভের অংশ ধনীদিগেরই সম্পূর্ণ আয়ত্ত হইত। শ্রমজীবিগণ শিক্ষার অভাবে, দারিদ্র্যের পীড়নে এই প্রতিযোগিতার মুখে একান্তই অসহায় ছিল। শিক্ষার ও সমবেত চেষ্টার ফলে তাহারা শুধু আপনাদের স্বত্ব ও অধিকার রক্ষা করিতে সমর্থ হইতেছে এরূপ নহে তাহারা ধনীদের অবস্থা নিতান্তই বিপন্ন করিয়া তুলিয়াছে। শুধু ইংলণ্ডে নহে, জর্ম্মনি ফ্রান্স প্রভৃতি দেশে এই শ্রমজীবিদিগের অভ্যুত্থান জগতের ইতিহাসে এক নূতন যুগের সূচনা করিতেছে। জর্ম্মান রাষ্ট্রসভার বিগত নির্ব্বাচনে সোস্যালিষ্টগণের প্রতিনিধিগণ সংখ্যায় সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। কিন্তু সর্ব্বা-

পেক্ষা ইংলণ্ডেই ইহার পূর্ণপরাক্রম। সেখানে শ্রমজীবিগণ ক্রমাগত ধর্ম্মঘট করিয়া গভর্ণমেণ্টকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছে। সম্প্রতি কয়লাখনির মজুরগণ ধর্ম্মঘট করিয়া কার্য্য বন্ধ করিয়াছে। ইহাতে ইংলণ্ডের সর্ব্বত্র হাহাকার পড়িয়া গিয়াছে। ২০ লক্ষ মজুর কার্য্য বন্ধ করায় প্রায় ৫০ লক্ষ লোক নিরন্ন হইয়াছে। কত স্থানে বালক ও স্ত্রীলোকদিগকে আহারপ্রদানের ব্যবস্থা করা হইতেছে কিন্তু তবুও অনাহারে বহুলোক কষ্ট পাইতেছে ও কয়েক জনের মৃত্যুসংবাদ পাওয়া গিয়াছে। গভর্ণমেণ্ট আইন করিয়া বেতনের নিম্নতর হার নির্দ্ধারণ করিয়া শ্রমজীবিদিগকে শান্ত করিবার চেষ্টা করিতেছেন কিন্তু এখনও কৃতকার্য্য হন নাই। সম্প্রতি যেরূপ সংবাদ আসিয়াছে তাহাতে ভরসা করা যায় শীঘ্রই এ গোলযোগ মিটিয়া যাইবে।

বর্ত্তমান সময়ে পার্লিয়ামেণ্টে আয়র্ল্যাণ্ডে স্বতন্ত্র পার্লিয়ামেণ্ট স্থাপনকর আইনের পাণ্ডুলিপি বিবেচিত হইতেছে। ব্রিটিস সাম্রাজ্যের প্রধান মন্ত্রী এস্কিথ সাহেব কিছুদিন হইল এই পাণ্ডুলিপি উপস্থিত করেন। ২৬ বৎসর পূর্ব্বে মহামতি গ্লাড্‌ষ্টোন সাহেব যখন পার্লিয়ামেণ্টে প্রথম এই প্রস্তাব উপস্থিত করেন তখন সমগ্র দেশময় কি উত্তেজনার সঞ্চার হইয়াছিল! জন ব্রাইট, মিঃ চেম্বরলেন প্রভৃতি যাঁহারা চিরকাল গ্লাডষ্টোন সাহেবের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন, তাঁহারা সকলেই গ্লাডষ্টোন সাহেবকে পরিত্যাগ করিয়া গেলেন। কিন্তু গ্লাডষ্টোন যাহা ন্যায় ও সাধারণের কল্যাণকর বলিয়া বুঝিতেন, কোনো বাধা বিঘ্নতেই তাহা হইতে বিচলিত হইবার পাত্র ছিলেন না। তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া, নবীন যুবার উদ্যম ও উৎসাহে, এই বিষয়ে স্বদেশীয়দিগের ভ্রান্ত সংস্কার দূর করিতে বদ্ধপরিকর হইলেন। ছয় বৎসরের মধ্যেই দেশের লোকের মন হইতে অযথা ভীতি দূর হইল—আয়র্ল্যাণ্ডে স্বতন্ত্র পার্লিয়ামেণ্ট স্থাপনের উপকারিতা তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন। তাঁহার দলস্থ কেহ কেহ পুনরায় তাঁহার দলে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। তিনি পুনরায় প্রধান মন্ত্রী হইয়া তাঁহার দ্বিতীয় হোমরুল বিল উপস্থিত করিলেন। হাউস অব্‌ কমোন্স সভায় অনেক বাদানুবাদের পর তাহা গৃহীত হইল বটে কিন্তু লর্ড সভা তাহা অগ্রাহ্য করিলেন। এবং অল্প কাল পরেই গ্লাডষ্টোন সাহেব কার্য্যক্ষেত্র হইতে অবসর গ্রহণ করিলেন। দীর্ঘকাল পরে তাঁহার মতানুবর্ত্তীগণ পুনরায় এই বিল উপস্থিত করিয়াছেন। তিনজন মাত্র লিবারল বিলের বিপক্ষে মত দিয়াছেন—মন্ত্রীগণের পৃষ্ঠপোষকদিগের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন মতাবলম্বী ভিন্ন শাখা সকলেই এই প্রস্তাবিত সংস্কার সমর্থন করিয়াছেন। কনসার্ভেটিবগণ প্রাণপণে বিলের বিরুদ্ধাচরণ করিতেছেন—কেহ কেহ আশঙ্কা করিতেছেন আয়র্ল্যাণ্ডের আলষ্টারবাসী প্রোটেষ্টাণ্ট খৃষ্টীয়ানগণ বিদ্রোহ উপস্থিত করিবেন কিন্তু সাধারণের মধ্যে কোনও আশঙ্কার সঞ্চার দেখা যাইতেছে না। লর্ড সভা গ্লাডষ্টোন সাহেবের দ্বিতীয় হোমরুল বিল যেরূপে বিনাশ করিয়াছিলেন বর্ত্তমানে তাহার সম্ভাবনা নাই। এস্কিথ সাহেব পূর্ব্ব হইতেই সাবধান হইয়াছিলেন এবং আইন করিয়া লর্ড সভার কোনও পাণ্ডুলিপি অগ্রাহ্য করিবার ক্ষমতা খর্ব্ব করিয়া দিয়াছেন। এক্ষণে এই পাণ্ডুলিপি তাঁহারা দুইবারমাত্র অগ্রাহ্য করিতে পারিবেন কিন্তু তাহার পরও কমন্স সভায় গৃহীত হইলেই ইহা আইনে পরিণত হইবে—লর্ডদিগের সম্মতির আর প্রয়োজন হইবে না। সুতরাং ভরসা করা যায় বর্ত্তমান পার্লিয়ামেণ্ট ইহার নির্দ্দিষ্ট কাল—আর দুই বৎসর—বাঁচিয়া থাকিলে আয়র্ল্যাণ্ডে স্বতন্ত্র পার্লিয়ামেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হইবে। কোন কোন বিষয়ে আয়র্ল্যাণ্ডের পালিয়ামেণ্টের সম্পূর্ণ ক্ষমতা থাকিবে না বটে কিন্তু পক্ষান্তরে ব্রিটিস সাম্রাজ্যের পালিয়ামেণ্টেও আইরিসগণের নির্ব্বাচিত হইবার অধিকার পূর্ব্বের ন্যায় অব্যাহত রহিল—কেবল তাঁহাদের সংখ্যা হ্রাস করিয়া ৪০ করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

প্রায় দুই শতাব্দীর অধিক কাল আয়র্ল্যাণ্ড লইয়া ইংলণ্ডকে পদে পদে বিব্রত হইতে হইতেছে। আয়র্ল্যাণ্ডের দরিদ্র প্রজাকুল কত প্রকারে রাজশক্তির নিকট নিগৃহীত ও লাঞ্ছিত হইয়াছে। আয়র্ল্যাণ্ডের ইংরেজ জমিদারগণ, নানাপ্রকারে অসহায় প্রজাগণকে পীড়িত করিয়াছেন। বহু আন্দোলনের পর, অনেক নির্য্যাতন, অশেষ লাঞ্ছনার পর আয়র্ল্যাণ্ডবাসিগণের মনস্কামনা সিদ্ধ হইতে চলিল। আইরিসগণও বিধিমতে তাহাদের ইংরেজবিদ্বেষের পরিচয় দিতে ত্রুটি করে নাই। আমেরিকায় ও অন্যান্য ইংরেজ-উপনিবেশে তত্রত্য আইরিসগণ ইংরেজের প্রধান শত্রু ও ইংলণ্ডের সহিত মৈত্রীবন্ধনের প্রধান অন্তরায়। এতদিনের সঞ্চিত এই অন্তর্বিদ্রোহ শান্ত হইলে উভয় পক্ষেরই মঙ্গল তাহাতে কি সন্দেহ আছে?

শ্রীনেপালচন্দ্র রায়।

মিশ্র বারোয়াঁ—দাদরা।

[পা পা -া]

II মা পা -া। মপা -ধণা ধপা I মা গমজ্ঞা -রসা। ন্‌সাঃ -ন্‌ঃ -সরজ্ঞা I

কো লা ০ হ০ ০ল্ ত০ বা র০ ০ণ হ০ ০ ০০০

I রা -া -া। -া -া -া I গা গা -া। গা গা -সা I সা গা -া।

ল ০ ০ ০ ০ ০ এ বা র্ ক থা ০ কা নে ০

। মা -পা -ধপা I মা -া -া। -া -া -া I রা জ্ঞা -া। রা জ্ঞা -া I

কা ০ ০০ নে ০ ০ ০ ০ ০ এ খ ন্ হ বে ০

I রা জ্ঞা -রা। জ্ঞজ্ঞা -মমা -জ্ঞরা I সা -ন্‌া -া। -া -া -া I প্‌া ন্‌া -া।

প্রা ণে র্ আ০ ০০ ০০ লা ০ ০ ০ ০ ০প্ কে ব ল্

। সা -া সা I সা সরা -ন্‌া। সা -া -সা I সজ্ঞা -া -া। -রা -পা -া I [ ] I

মা ০ ত্র গা নে ০ গা ০ ০ নে ০ ০ ০ ০ ০

II {পা মপা -জ্ঞা। -া জ্ঞা জ্ঞমা I পা -না না। না র্সা -া I র্সা র্সা -না।

রা জা ০ ব্ প থে০ লো ক্ ছু টে ছে ০ বে চা ০

। র্সা র্সা র্জ্ঞর্রা I র্সা -র্রর্সা না। না র্সাঃ -নঃ} I র্সা র্সণা -া। -া ধা পা I

কে না ০র্ হাঁ ০ক্ উ ঠে ছে ০ আ মা০ ০ র্ ছু টি

I পা পা -া। পা পা -ধা I ণা -র্সা ণা। ধা পা -ধপা I মা গা মগা।

অ বে ০ লা তে ই দি ন্ ছ পু রে ০র্ ম ০ ধ্য

। গা মা -া I রা জ্ঞা -া। রা জ্ঞা -া I রজ্ঞা -মা জ্ঞা। রা সা -া I

খা নে ০ কা জে র্ মা ঝে ০ ডা০ ক্ প ড়ে ছে ০

I পা পা -া। পা পা -ধপা I মা -রমা জ্ঞা। রা সা -া II

কে ন ০ যে তা ০০ কে ০ই বা জা নে ০

II {সা -জ্ঞা জ্ঞা। রা জ্ঞা -া I রা জ্ঞা -রা। জ্ঞা পা -া I মা মা -মজ্ঞা।

মো র্ কা ন নে ০ অ কা ০ লে ফু ল্ উ ঠ্ ০০

০ ১´ ০ ১´ ০
। -র্সা সা র্রা I র্রা -মা জ্ঞা। র্রা সা -া I পা -া পা। পা পা -া I
০ক্ ত বে মু ০ ঞ্জ রি য়া ০ ম ০ ধ্য দি নে র্

১´ ০ ১´ ০ ১´
I পা -া ধা। ণা র্সা -া I ণা ধণা -ধা। পা পা -ধপা I মা -গা মগা।
মো ০ মা ছি রা ০ বে ড়া ক্ মৃ হু ০০ গু ০ ঞ্জ

০ ১ ০ ১´ ০
। গা মা -া } I { পা -া পা। ক্ষপা মজ্ঞা -মা I পা -মা মা। না র্সা -া I
রি য়া ০ ম ০ ন্দ ভা লো র্ ছ ০ ন্দে থে টে ০

১´ ০ ১´ ০ ১´
I র্সা র্সা -না। র্সা র্সা -র্জ্ঞর্রা I র্সা র্সা -র্রর্সা। না র্সা -া } I র্সা র্সণা -া।
গে ছে ০ ত দি ০ন্ অ নে ০ক্ কে টে ০ অ ল০ ০

০ ১´ ০ ১´ ০
। -া ধা পা I পা পা -া। পা পা -ধা I ণা র্সা -ণা। ধা পা -ধপা I
স্ বে লার্ খে লা র্ সা থী ০ এ বা র্ আ মা ০র্

১´ ০ ১´ ০ ১´
I মা গা -মগা। গা মা -া I র্রা জ্ঞা -া। র্রা জ্ঞা -া I রজ্ঞা -মা জ্ঞা।
হৃ দ য়্ টা নে ০ বি না ০ কা জে র্ ডা০ ক্ পা

০ ১´ ০ ১´ ০
। র্রা সা -া I পা পা -া। পা পা -ধপা I মা -রমা জ্ঞা। র্রা সা -া II II
ড়ে ছে ০ কে ন ০ যে তা ০০ কে ০ই বা জা নে ০

এই সংখ্যার প্রথমে প্রকাশিত "ছুটি" শীর্ষক গানের স্বরলিপি।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

ব্রহ্মবিদ্যালয়।

আশ্রমকথা।

গতবারে আমরা বলিয়াছি যে আমরা ইংরাজী ভাষা গোড়ায় কথাবার্ত্তার স্বাভাবিক প্রণালী অর্থাৎ Direct method অবলম্বনে শিক্ষাদিবার চেষ্টা করিয়া থাকি।

ইউরোপীয় ভাষাসমূহে লিখিতভাষা কথিত ভাষা হইতেই উৎপত্তি লাভ করিয়াছে। যেমন কয়েক শতাব্দী পূর্ব্বে ইংরাজী ভাষায় Thou hast, he hath প্রভৃতি পদ কথিত ভাষায় প্রচলিত ছিল, এখন নাই—এখন কেবল লিখিত ভাষায় সাহিত্যে এ সকল পদের প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়।

কথিত ভাষায় অনাবশ্যক কথার বাহুল্য থাকে না বলিয়া ভাষাশিক্ষার সুবিধা হয়—যেমন আকাশকে কথায় Sky বলিলেই চলে কিন্তু সাহিত্যে Heaven firmament প্রভৃতি নানা শব্দ দ্বারা আকাশ বলা যায়। গল্প আছে যে একদা এক জর্ম্মাণকে তাঁহার ইংরাজ বন্ধু জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, জনৈক মহিলা কেমন আছেন, সে কপালে হাত দিয়া বলিয়াছিল, she was rapt ইংরাজ প্রশ্নকর্ত্তা তাহাকে কপালে হাত দিতে দেখিয়া ভাবিলেন যে স্ত্রীলোকটির মাথায় আঘাত লাগিয়াছে—শেষটা অনেক কথাবার্ত্তার পর বুঝিলেন যে জর্ম্মাণ বলিতে চাহিয়াছিল যে সেই: মহিলাটি উন্মনা হইয়া গিয়াছেন কারণ শেক্সপীয়রে আছে "how our partners rapt" rapt মানে transported।

যিনি যাই বলুন বিদেশীর পক্ষে ইংরাজী ভাষা শেখা বিষম কষ্টকর ব্যাপার। ভাষা জিনিসটাই নিছক যুক্তিযুক্ত rational জিনিস নয়। up দিয়া lock up, wrap up, pack up সবই বলি, অথচ pack up এর কথায় কথায় অর্থ করিতে গেলে ঠিক উলটা অর্থ হয়—খুলিয়া ফেলা বুঝায়। Sharp বিশেষণটা ছুরী বা অস্ত্রাদিতে ব্যবহার করে, আবার প্রভেদ উত্তর প্রভৃতি কথায় বিশেষণরূপেও ব্যবহার করে, যেমন sharp distinction, sharp answer—সুতরাং কোন কথারই বেশ সুনির্দ্দিষ্ট অর্থ থাকে কোথায়? I could not help being late—সে জায়গায় help মানে avoid—অথচ আর কোন জায়গায় তা নয়। এ এক মস্ত ন্যাটা। ইংরাজী ভাষাটা যদি কেবল বিশুদ্ধ ব্যাকরণের নিয়মের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকিত তাহা হইলে আমরা বিদেশীরা যাহা লিখিতাম তাহাই ইংরাজী হইত—অথচ ছোটকথার ছোট বাক্যরচনায় যে ব্যাকরণশুদ্ধ হওয়া সত্বেও আমাদের ইংরাজী হয় না, সেটা ইংরাজেরাই ভাল বুঝিতে পারেন।

Ahn Ollendorff প্রভৃতি ভাষায় যোগরূঢ় (idiometic) প্রয়োগ বাদ দিয়া কেবল কতকগুলি কাটাছাঁটা বিভিন্ন বাক্য সাজাইয়া ভাষা শিখাইবার প্রণালী উদ্ভাবন করিয়াছিলেন। কিন্তু ব্যাকরণের প্রণালীতে ভাষা শিক্ষার যে দোষ এ প্রণালীতেও সেই দোষ দূর হয় না, যথার্থ ভাষার সঙ্গে পরিচয় হয় না—বিচ্ছিন্ন বাক্যগুলি পড়িয়া ভাষার কাঠামোটার (Structure) কিছুটা জ্ঞান জন্মে মাত্র।

শিক্ষাবিজ্ঞানশাস্ত্র ও ভিন্ন ভিন্ন দেশের শিক্ষার নানা অভিজ্ঞতা ভাল করিয়া আলোচনা না করিবার জন্য ব্রহ্মবিদ্যালয়ে আমরা কখনো শুধু Direct method কখনো Ahn Ollendorff এর ন্যায় Sentence cramming-এর method কখনো বা পুরাণো ব্যাকরণ ও প্রচুর exercise শিখাইবার প্রণালী অবলম্বন করিয়াছি এবং কোনটাতেই ভাল ফল পাই নাই। শুধু কথাবার্ত্তায় ইংরাজী শব্দ ও পদ ছাত্ররা অতি অল্পই আয়ত্ত করে, কারণ প্রশ্নের মধ্যেই উত্তর থাকিয়া যায় এবং প্রশ্নও ক্রমে একঘেয়ে হইয়া উঠে। ইংরাজী-সোপানের প্রশ্নোত্তর-প্রণালীর মধ্যে এই দোষটি আছে। তারপর যদিবা প্রশ্নকে নানা বিচিত্রতা দেওয়া যায়—তখন সময় এত অধিক লাগে যে পাঠোন্নতি অতি অল্পই হয়। আধ ঘণ্টা বা ৪৫ মিনিট কথাবার্ত্তা কহিল তারপর সমস্ত দিনে এবং চারিদিকের পরিবেষ্টনের মধ্যে কোথাও ইংরাজী কথাবার্ত্তা শুনিলনা ইহাতে ইংরাজী শিক্ষা স্বাভাবিক উপায়ে হইতেই পারে না।

ইংরাজী-সোপানে অবশ্য শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রবাবু এই সমস্ত প্রণালীগুলিরই একটা সামঞ্জস্য করিবার চেষ্টা পাইয়াছেন—গোড়ায় Language Drill ও কথাবার্ত্তা রাখিয়া পরে Ollendroff প্রণালীর মত ছোট ছোট শব্দ যোজনা করিয়া সহজ বাক্যের সঙ্গে পরিচয় সাধন ও সহজ বাক্যরচনার চেষ্টা ও সেই একই সঙ্গে প্রশ্নোত্তর করানো এ সমস্তই রাখিয়াছেন। এমন কি তিনি ব্যাকরণকেও একেবারে বাদ দেন নাই। যদিও ব্যাকরণ শিক্ষার বিরুদ্ধে আজকাল কোন কোন শিক্ষাসম্প্রদায়ের ঘোরতর আপত্তি। তাঁহারা বলেন যে ব্যাকরণ শিখিয়া কোন দিন ভাষা শিক্ষা হয় না—ব্যাকরণ অনেকটা নাম ও সংজ্ঞা সম্বলিত formal জিনিস—ভাষার মধ্য দিয়াই যখন ব্যাকরণ শেখা যায় তখন আলাদা করিয়া

ব্যাকরণ শিখাইবার প্রয়োজন কি? ছাত্র নিজেই ভাষার মধ্য দিয়া ব্যাকরণের নিয়ম আবিষ্কার করিয়া লইবে।

কিন্তু এ সকল আপত্তি থাকা সত্ত্বেও আজ পর্য্যন্ত কেহই ব্যাকরণকে বাদ দিয়া চলিতে পারেন নাই। যে জিনিসটা নানা বৎসর ধরিয়া তৈরি হইয়া আসিয়াছে একজন শিশু যে তাহাকে ক্লাসে বসিয়া বসিয়া সৃষ্টি করিবে এরূপ কল্পনাই হাস্যাস্পদ। আজকাল formal ব্যাকরণের দিন চলিয়া গিয়াছে—আগে সংজ্ঞা ও নিয়ম তারপর তার প্রয়োগ এভাবে আধুনিক ব্যাকরণ রচিত হয় না। ভাষার প্রয়োগ ও সেই সঙ্গে সঙ্গে তাহার নিয়ম আলোচনা এই দিক দিয়াই ব্যাকরণ আলোচিত হয়—যে প্রণালীকে ইংরাজিতে বলে induction method—সুতরাং ভাষার কাঠামোটা বুঝাইবার জন্য যেটুকু ব্যাকরণের প্রয়োজন হয় তাহা গ্রহণ করিলে কোন ক্ষতি হয় না। I am, he is কেন হয় বলিয়া দিলে কোন ক্ষতি নাই—বরং ভাষার সঙ্গে সঙ্গে ভাষার নিয়ম বলিয়া দিলে ভাষা জিনিসটা তাড়াতাড়ি আয়ত্ত হইয়া যাইতে পারে।

তথাপি Ollendorff প্রণালী এবং তার সঙ্গে ব্যাকরণের অল্প একটু যোজনা হইলেও আমাদের ইংরাজী সোপান প্রভৃতির প্রণালীতে একটা দোষ থাকিয়া গিয়াছিল এই যে ছেলেরা শুধু কানে শুনিয়া শিখিত চোখে দেখিত না,—ইহাতে আমাদের বিদ্যালয়ে বানান ও পড়া বহুকাল পর্য্যন্ত অত্যন্ত দুর্ব্বল থাকিয়াছিল। আরও একটি ত্রুটি ছিল এই যে গোড়ায় ইংরাজীতে কথাবার্ত্তা কহাইলেও, ইংরাজী বাক্যরচনা অভ্যাস করাইবার সময় আগে বাংলায় বলিয়া তার পর তাহার ইংরাজী করানো হইত—অথচ দুই ভাষার ভাবানুবন্ধিতা association একেবারে উল্টাপাল্টা সুতরাং ছাত্রেরা এই দুই ভাষার প্রতিকূল স্রোতের মধ্যে পড়িয়া হাবুডুবু খাইত। তখন হয় বাংলাকে ইংরাজীর মত করিয়া বিকৃত করিয়া লইতে হয় নয় বাংলাকে বর্জ্জন করিয়া ইংরাজীকেই একমাত্র করিয়া আশ্রয় করিতে হয়। I have a book আমার একটি বই আছে—ছাত্র my a book is „ y a book has বলিবেই কারণ তাহার মাথায় বাংলার association টা পুরাপুরি জাগ্রত হইয়া আছে।

এই অভাব দূর করিবার জন্য আমাদিগকে সোপানের সঙ্গে সঙ্গে রিডার লইতে হইয়াছে বটে কিন্তু তাহাতে লিখিত ভাষার সঙ্গে গোড়ায় পরিচয় সাধনের যে সকল অসুবিধা সে সমস্তই ভোগ করিতে হইতেছে। কথিত ভাষায় if it were প্রভৃতি দু একটা জায়গা ছাড়া Subjunctive mood এর তেমন ব্যবহার নাই কিন্তু লিখিতভাষায় বিস্তর আছে। লিখিতভাষায় একই সময়ে সমস্ত tence গুলি আসিয়া পড়ে। কেবল পড়া ছাড়া এবং খানিকটা বানানের সহায়তা ছাড়া রিডারে আর কোন সুবিধা পাওয়া যায় না।

আমার বিশ্বাস যে সোপানের সঙ্গে সঙ্গে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রবাবু যেরূপ "ইংরাজী পাঠ" তৈরি করিয়াছিলেন তাহাকেই যদি বানানের ক্রমানুসারে সাজাইয়া লইয়া লেখা যায় এবং ক্রমে ক্রমে সরল হইতে জটিল বাক্য তাহার মধ্যে আনিয়া ফেলা যায় তবে ভাষাশিক্ষার বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীর সঙ্গে একটা সঙ্গতি রক্ষা করা যায়। নহিলে কেবল মুখস্থকে প্রশ্রয় দেওয়া হয় এবং ভাষা প্রয়োগের কোন চর্চ্চারই অবকাশ থাকে না।

আশ্রমসম্পর্কে নানা সংবাদের মধ্যে এবার নববর্ষের দিনে পূজনীয় শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রবাবুর হঠাৎ আগমন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁহার শরীর অসুস্থ, তথাপি তিনি নববর্ষে আশ্রমে আসিয়া বর্ষারম্ভের উৎসবটি নিজে সুসম্পন্ন করিয়াছিলেন। সেদিন তাঁহার উপদেশের বিষয় ছিল রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যম্। রুদ্রকে অনেকে দয়াময় বলিয়া কোমল করিয়া লইতে চান্—কিন্তু যথার্থ মনুষ্যত্বের সাধনা জীবনের সকল দুঃখ বিপদ আঘাত ক্ষতির মধ্যে, রুদ্রের সকল ভীষণতার মধ্যে তাঁহার দক্ষিণ মুখকে দর্শন করা—রুদ্রকে তাঁহার রুদ্রত্বের মধ্যে না দেখিতে যাওয়া ভীরুতামাত্র এবং সে ভীরুতাকে তিনি নিজে কোন দিনই প্রশ্রয় দেন না।

১৩ই বৈশাখ হইতে ২৯এ জ্যৈষ্ঠ পর্য্যন্ত গ্রীষ্মাবকাশের জন্য ছুটি দেওয়া হয়। ১০ই বৈশাখ আশ্রমে রাজা ও রাণী নাট্য সংক্ষিপ্ত করিয়া অভিনয় করা হয়। অভিনয় মন্দ হয় নাই। ১১ই প্রাতঃকালে বুধবারে মন্দিরে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রবাবু উপাসনা ও বিদায়কালীন উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন যে বিশ্বপ্রকৃতিতে কাজের সঙ্গে সঙ্গে বিশ্রাম একেবারে গাঁথা হইয়া আছে—কিন্তু মানুষের কাজের মধ্যে কোথাও সেই পরিপূর্ণ অবকাশটিকে দেখিতে পাওয়া যায় না—সেই জন্যই তাহার ক্লান্তি আসে, তাহাকে মধ্যে মধ্যে ছুটি লইতে হয়। কিন্তু ইহাতে মানুষের কোন গৌরব নাই—ইহাতে বরং এই প্রমাণ হয় যে মানুষ আপনার কাজের মধ্যে এখনও বড় একটি আনন্দের সঞ্চার করিতে পারিতেছে না যাহাতে কাজের ভিতর হইতেই সে আপনার কাজের মূল্য পায়—তাহার খাটুনিই তাহাকে ছুটি দেয়। আমাদের আশ্রমের কিন্তু তাহাই উদ্দেশ্য—সেইজন্য যেখানে ধর্ম্মসাধনার স্থান, সেইখানে শিক্ষার ক্ষেত্র স্থাপিত হইয়াছে। শিক্ষা যে একটা বড় আনন্দের মধ্যে ও শান্তির

মধ্যে স্থান পাইতে পারে এ ধারণাটা কোথাও নাই—অন্যত্র তাই শিক্ষাদানে এবং শিক্ষাগ্রহণে একটা নিরানন্দময় দীনতা আছে—কিন্তু এখানে শিক্ষাকে জীবনের ভিতরকার জিনিস করিয়া তোলা হইতেছে এখানকার শিক্ষকগণ নিজের জীবনের সঙ্গে ছাত্রের জীবনকে মিলাইয়া লইতেছেন;—যতই এই কাজটি সম্পূর্ণ হইয়া উঠিতেছে ততই এ বিদ্যালয় প্রাণ পাইতেছে। এখানে তাই জীবনের সাধনা যত বড় হইয়া উঠিবে ততই শিক্ষা সুন্দর ও সার্থক হইবে, তখন ছুটির প্রয়োজন হইবে না কারণ তখন কর্ম্মের ভিতর হইতেই কর্ম্মের যেটি লভ্য আনন্দ তাহা প্রত্যক্ষ উজ্জ্বল হইয়া উঠিবে।

শ্রীঅঃ

বিষাক্ত গাছ ও জীব।

অনেকেই জানেন যে যেমন কাঁকড়াবিছা প্রভৃতি বিষাক্ত জন্তু আছে সেইরূপ নানাপ্রকারের বিষাক্ত উদ্ভিদও আছে। প্রত্যেক জাতীয় উদ্ভিদের মধ্যেই কতকগুলি উদ্ভিদ ন্যূনাধিকপরিমাণে বিষাক্ত দ্রব্য উৎপন্ন করে। অধিকপরিমাণে তাহাদের গ্রহণ করা মানুষের পক্ষে নিরাপদ নহে, অথচ অল্পমাত্রায় গ্রহণ করিলে তাহারাই আবার অপকার না করিয়া মানুষের উপকার করিয়া থাকে।

সকলেই জানেন যে বিছুটি গায়ে লাগিলে কিরূপ যন্ত্রণা হয়। সাধারণ বিছুটির পাতা যে সব শুঁয়াদ্বারা আবৃত, তাহা বেশ দৃঢ়, কিন্তু ভঙ্গুর ও ফাঁপা; চর্ম্মে প্রবেশ করিলে এগুলি ভাঙ্গিয়া যায় এবং ইহার ভিতর হইতে বিষাক্ত রস নির্গত হয়। অনুবীক্ষণদ্বারা পরীক্ষা করিলে সহজেই দেখা যায় যে এই শুয়াঁগুলির অভ্যন্তরদেশ জীবাণু (Protoplasu) দ্বারা পূর্ণ; ইহা চটচটে এবং স্বচ্ছ বস্তু এবং সর্ব্বদাই স্রোতের ন্যায় চলাফেরা করিতেছে। এই শুয়াঁগুলিকে কোষ (Cell) বলা যাইতে পারে। এই কোষের যে অংশটুকু জীবাণুদ্বারা পূর্ণ নহে তাহা পরিস্কার তরল পদার্থদ্বারা পূর্ণ এবং ইহাই বিষ। অধিক পরিমাণে বিছুটির শুঁয়া লইয়া পরীক্ষা করিয়া জানা গিয়াছিল যে ইহার অভ্যন্তরস্থ তরল পদার্থটি ফার্ম্মিক্ এ্যাসিড্ (পিপীলিকা হইতে উৎপন্ন এ্যাসিড্)। পিপীলিকা কামড়াইলে এই পদার্থটি আমাদিগকে যন্ত্রণা দেয়। কিন্তু পরে পরীক্ষা করিয়া জানা গিয়াছে যে ইহাতে অতি ক্ষুদ্র পরিমাণে এক বিশেষপ্রকারের বিষ আছে। ইহা শ্বেতবর্ণ এবং অনেকটা সাপের বিষের ন্যায়।

গ্রীষ্মপ্রধান দেশ-জাত বিছুটির বিষ শীতপ্রধান দেশের বিছুটির বিষঅপেক্ষা অনেক তীব্র। যবদ্বীপে একপ্রকার বিছুটি দেখা যায়, ইহার নাম Urtica Stimulans ইহার পাতা ছেঁচিলে একপ্রকার দূষিত বায়বীয় পদার্থ বহির্গত হয় এবং ইহা চক্ষু ও মুখকে আক্রমণ করে। হাত দিয়া নাড়াচাড়া করিলে হাত ফুলিয়া অত্যন্ত যন্ত্রণা হয় এবং তাহাতে তিন চার সপ্তাহ পর্য্যন্ত ভুগিতে হয়। এমন কি কখনো কখনো পরিণামে মৃত্যুও হইতে পারে। ভারতবর্ষ-জাত Lapora Crenulata নামক বিছুটির বিষও এই প্রকার তীব্র। এই প্রকার আরও অন্যজাতীয় গাছ আছে।

পদ্ম এবং অন্যান্য ফুলের গন্ধ মাঝে মাঝে মানুষ দূর হইতেই মোহাক্রান্তের ন্যায় হয়। ইহার গন্ধ কখন কখন এমন অনিষ্ট করিতে পারে যে ইহাতে অত্যন্ত মাথা ধরে, এমন কি অজ্ঞান হইয়া পড়িতে হয়।

কিন্তু জন্তুদের বিষদাঁত এবং হুল ভাল করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিলে ইহাতে আরও বেশীরকম বৈচিত্র্য দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদ্বারা তাহারা যে কেবলমাত্র আত্মরক্ষা করে তাহা নহে; নিজেদের শিকারকে অসাড় করিয়া ফেলিতেও সমর্থ হয়। সাধারণ পোকাতে যে ফার্ম্মিক্ এ্যাসিড্ আছে তাহারও মধ্যে এইরূপ অসাড় করিবার মত এক প্রকার বিষ আছে।

জেলি ফিস্ নামক মাছকে সাধারণতঃ সমুদ্রের বিছুটি বলে। কারণ তাহাদের দেহে অতি ক্ষুদ্র বিষাক্ত শুঁয়া আছে। ইহার দ্বারা তাহারা তাহাদের শিকারকে অসাড় করিয়া ফেলে। সামুদ্রিক এ্যানিমোন্-এর দেহেও এইরূপ ষ্টার ফিস্ ইত্যাদি আরও অনেক মাছ আছে যাহাদের বিষ খুব তীব্র।

পোকার মধ্যেও আমরা মৌমাছি, বোল্‌তা, এবং পিপীলিকাতে হুল দেখিতে পাই। শুটিপোকার দেহে বিষাক্ত শুঁয়া আছে। মাকড়সার বিষাক্ত গ্রন্থি-বিশিষ্ট নখ আছে। আমরা বিষাক্ত মাছের কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। সরীসৃপের মধ্যে কেবলমাত্র কয়েক প্রকারের সর্পই বিষাক্ত; ইহাদের বিষদাঁত আছে। কেবলমাত্র একপ্রকারের গিরগিটির মুখে বিষ-গ্রন্থি আছে। ইহার নাম হেলোডার্ম এবং ইহা আমেরিকাতে পাওয়া যায়। কিন্তু ইহাদের বিষদাঁত নাই।

এরূপ অনেক পোকা আছে যাহাদের বিষ নাই কিন্তু মানুষকে কামড়াইলে কি হুল ফুটাইলে খুব যন্ত্রণা হয়। এমন কি খুব ঘা হয়। প্রায়ই তাহারা এক জীব হইতে অন্য জীবের দেহে অতি ক্ষুদ্র ব্যাধির বীজাণু ঢুকাইয়া দেয়। যেমন মশা ইত্যাদি। ইহাদের দ্বারাই ম্যালেরিয়া পৈত্তিকজ্বর, প্লেগ ইত্যাদি ব্যাধি এক দেহ হইতে অন্যদেহে নীত হইয়া থাকে।

শ্রীতরুণকুমার রায়।

প্রকৃতি-পর্য্যবেক্ষণ।

কাঠবিড়ালী।

এই আশ্রমে কাঠবিড়ালী একটি বিশেষ দেখিবার জিনিস। ইহারা সাধারণতঃ শাল, আম, দেবদারু বকুল প্রভৃতি বড় বড় ডালপাতাযুক্ত গাছে এবং ঘরের চালে খড়ের মধ্যে বাস করে। ইহারা গাছে দুই প্রকারের বাসা নির্ম্মাণ করিয়া তাহার মধ্যে বাস করিয়া থাকে। এক শ্রেণীর বাসা গাছের কোটরের মধ্যে এবং আর এক শ্রেণীর বাসা পাখীর মত ডাল-পালা দিয়া গাছের উপরে ইহারা নির্ম্মাণ করে।

কাঠবিড়ালীদের পিঠে লম্বালম্বিভাবে কয়েকটি কালো দাগ আছে। ইহাদের শরীরের তুলনায় লেজটি খুব বড়। এই লেজই ইহাদের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিয়াছে। ইহাদের শরীরের ও লেজের লোম খুব কোমল। দৌড়াইবার বা লাফাইবার সময় ইহারা লেজ খাড়া করে। লেজের লোমগুলি অল্প খাড়া থাকে। যখন ইহারা স্ফীত বা রাগান্বিত হয় তখন ইহাদের লেজের গোড়ারদিককার লোম অপেক্ষাকৃত খাড়া হইয়া উঠে।

যে সমস্ত গাছে কাঠবিড়ালীরা বাস করে সেই গাছের রংএর সঙ্গে তাহাদের খুব মিল আছে; তাহারা যখন ভয় পায় তখন নিজেদের রক্ষা করিবার জন্য এমনভাবে গাছের সহিত লাগিয়া থাকে যে সহজে চেখে পড়ে না।

কাঠবিড়ালীরা এক গাছ হইতে অন্য গাছে লাফ দিতে খুব পটু। ইহাদের পিছনের পা সম্মুখের পা অপেক্ষা বড়। ইহাতে তাহাদের গাছে উঠিতে খুব সুবিধা হয়।

ছানাগুলি যখন একটু ছোট থাকে তখন তাহাদের মাতারা তাহাদিগকে আহার আনিয়া দেয়। পরে ছানারা বড় হইলে আস্তে আস্তে খাইতে শেখে।

কাঠবিড়ালীর প্রধান খাদ্য শস্য, পিপীলিকার ন্যায় ছোট পোকা এবং ফল মূল। ইহাদের দাঁত খুব তীক্ষ্ণ। এই জন্য ইহারা অনায়াসেই নারিকেলের ছোবড়া ছাড়াইয়া তাহার ভিতরের অংশ খাইতে পারে পূর্ব্বেই বলিয়াছি ইহারা গাছের কোটরে বাস করে। এই কোটর দাঁত দিয়া গাছ কাটিয়া ইহারা প্রস্তত করে। ইহারা খাইবার সময় পিছনের পা দুটির উপর ভর দিয়া বসিয়া সম্মুখের পা দুটি দ্বারা আহার্য্য বস্তু খায়।

কাঠবিড়ালীরা খুব কলহ-প্রিয় ইহারা যখন রাগে তখন শত্রুর পিছনে পাছে পাছে তাড়া করিয়া বেড়াইয়া এক এক সময়ে মারামারি করিতে করিতে ইহারা গাছ হইতে পড়িয়াও যায়।

কাঠবিড়ালীদের পুষিলে বেশ পোষ মানে। একবার পোষমানাইলে আর সঙ্গ ছাড়িতে চায় না।

ইহারা যখন ডাকে তখন অনেক সময় পাখীর ডাক বলিয়া ভ্রম হয়।

প্রদ্যোত।

কবিতা।

ব্যর্থদিন।

তোমায় ভুলিয়া থেকে পদে পদে আমি,
এত ব্যথা পাই প্রাণে হে পরাণস্বামী।
শুষ্ক হৃদে ডাকি আমি শুষ্ক কণ্ঠস্বরে
তখনি স্নেহের রস ঢাল মোর পরে।
আমি যদি নাহি চাই ফিরে যাই প্রভু,
তুমিত হৃদয় দ্বারে দাঁড়াইয়া তবু
ছোট কথা নিয়ে থাকি, করি ধূলাখেলা
তবুও আমারে তুমি করনা ত হেলা।
পেয়েছি দিবস নিশি আশিষ তোমার
কি দিয়েছি তাই ভাবি কোন্ উপহার!
পারি নাই তোমা পরে রাখিতে বিশ্বাস,
তবুও গোপনে মনে দিতেছ আশ্বাস।
এত যে অজস্র দয়া প্রভু মোর পরে—
চেনা কেন নাহি দাও নিমেষের তরে?
এ পাপ বহিয়া বুকে খেলি আর কত,
দিন যে চলিয়া যায় বেলা হয় গত!

দীনু।

একমেবাদ্বিতীয়ং

অষ্টাদশ কল্প
দ্বিতীয় ভাগ।
আষাঢ়, ব্রাহ্মসম্বৎ ৮৩

৮২৭ সংখ্যা ১৮৩৪ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

"ব্রহ্মবা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্
সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়ং সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া
পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যং সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।"

শেষ কথা।

যাবার দিনে এই কথাটি
বলে যেন যাই—
যা দেখেছি যা পেয়েছি
তুলনা তার নাই।
এই জ্যোতিঃ সমুদ্রমাঝে
যে শতদলপদ্ম রাজে
তারি মধু পান করেছি
ধন্য আমি তাই—
যাবার দিনে এই কথাটি
জানিয়ে যেন যাই॥
বিশ্বরূপের খেলা ঘরে
কতই গেলেম খেলে,
অপরূপকে দেখে গেলেম
দুটি নয়ন মেলে।
পরশ যাঁরে যায় না করা
সকল দেহে দিলেন ধরা;
এইখানে শেষ করেন যদি
শেষ করে দিন তাই—
যাবার বেলা এই কথাটি
জানিয়ে যেন যাই॥

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বিদ্যা এবং অবিদ্যা।

সকল জীবই অজ্ঞানের নিবিড় অন্ধকারে আবৃত রহিয়াছে। মনুষ্যও তাহার মধ্য হইতে বর্জ্জনীয় নহে। আবার, প্রাণধারণ, দুঃখ-সাধন, দুঃখদূরীকরণ প্রভৃতি কতকগুলি অবশ্যপ্রয়োজনীয় বিষয়ের একপ্রকার অশিক্ষিত জ্ঞান সকল জীবেরই আছে। বেদান্তাদি শাস্ত্রের মতে জীবরাজ্যের ঐরূপ সাধারণসুলভ সংস্কারমূলক অশিক্ষিত জ্ঞান জ্ঞানাভাস মাত্র, তা বই তাহা প্রকৃত জ্ঞান নহে। এইজন্য ঐসকল পুরাতন শাস্ত্রে অবিদ্যাচ্ছন্ন জীবচৈতন্যকে বলা হইয়াছে আভাসচৈতন্য—অর্থাৎ ছায়াচৈতন্য। কিন্তু জীবদিগের মধ্যে জ্ঞানসম্বন্ধে মনুষ্যের বিশেষত্বও আছে কম না। আর আর জীবের ন্যায়, মনুষ্য, জ্ঞানের একটু আধটু আভাস বা প্রতিচ্ছবিতে তৃপ্ত থাকিতে পারে না। মনুষ্য জ্ঞানাভাস হইতে প্রকৃত জ্ঞানে উত্থান করিবার জন্য সর্ব্বদাই সচেষ্ট। বেদান্তাদি শাস্ত্রের পারিভাষায় ভ্রমসংকুল লৌকিক জ্ঞান জ্ঞানাভাস মাত্র, আর, তাহারই নাম অবিদ্যা। জ্ঞান-বীরেরা অবিদ্যার সহিত রীতিমত যুদ্ধ করিয়া বিদ্যারাজ্যে ক্রমে ক্রমে অধিকার বিস্তার করেন। এক এক জ্ঞানবীর এক এক খণ্ড বিদ্যারাজ্য অধিকার করেন। কেহ বা জ্যোতিষের আকাশরাজ্য, কেহ বা ভূতত্ত্ববিদ্যার পাতালরাজ্য, কেহ বা বৈদ্যুতাদি বিদ্যার অন্তরীক্ষ রাজ্য অধিকার করেন; এইরূপ, নানা বিদ্যাপতি বিদ্যারাজ্যের নানা খণ্ড অধিকার করেন।

বিদ্যারাজ্যের রাজাদের নাম গুরু, প্রজাদের নাম শিষ্য। সময়ে সময়ে শিষ্যপ্রধানেরা গুরুদের উত্তরাধিকারী হইয়া অধিকৃত রাজ্যের সংস্কারসাধন এবং বিস্তার-সাধন করেন। এইরূপে গুরুপরম্পরাক্রমে বিদ্যা মার্জ্জিত এবং বর্দ্ধিত হইয়া চলিতে চলিতে নগর গ্রাম পল্লীতে জ্ঞানধর্ম্মরূপী অমৃত ফল শতধা সহস্রধা বিকীর্ণ করিতে থাকে, আর, সেই সকল অমৃতফল ভোজন করিয়া

দেশবিদেশের মনুষ্যমণ্ডলী বন্য অবস্থা হইতে সভ্য অবস্থায় পদনিক্ষেপ করিতে থাকে। অবিদ্যা অন্ধসংস্কার মাত্র জ্ঞানের ছায়া মাত্র। বিদ্যাই প্রকৃত জ্ঞান। বিদ্যা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত অপরা বিদ্যা এবং পরা বিদ্যা। অপরা বিদ্যার আরএক নাম বিজ্ঞান। পরাবিদ্যার আর এক নাম ব্রহ্মজ্ঞান। বিদ্যাই পৃথিবীস্থ সভ্যজাতিদিগের সভ্যতার ভিত্তিমূল।

সভ্যতার নাম শুনিবামাত্র প্রথমেই আমাদের দৃষ্টি পড়ে অধুনাতন কালের পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রতি। পাশ্চাত্য দেশের সভ্যতার চমৎকার্য্যে আমরা এরূপ বিমোহিত হইয়া যাই যে, তাহার প্রতি আমরা হাঁ করিয়া তাকাইয়া থাকি; তা বই তাহার গোড়ার কথা যে কি তাহা একবার জিজ্ঞাসাও করি না। একটু ভাবিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারা যাইবে যে, পাশ্চাত্য সভ্যতার গোড়ার কথা বিজ্ঞান বই আর কিছুই নহে। বিজ্ঞান শুধুই যে কেবল বস্তু-বিজ্ঞান তাহা নহে, ধর্ম্মবিজ্ঞানও বিজ্ঞান, রস-বিজ্ঞানও বিজ্ঞান। পাশ্চাত্য ভূখণ্ডে যতদিন পর্য্যন্ত না বিজ্ঞানের সূর্য্যোদয় হইয়াছিল ততদিন পর্য্যন্ত পাশ্চাত্য সভ্যতা প্রাচ্য সভ্যতা অপেক্ষা অপকৃষ্ট বই কোনো অংশেই উৎকৃষ্ট ছিল না—ইহা সকলেরই জানা কথা। নব্যতম পাশ্চাত্য সভ্যতার গোড়ার কথা কি যদি জিজ্ঞাসা কর, তবে তাহার উত্তর এই যে, বিজ্ঞানতত্ত্বের নবতব আবিষ্কারের গোড়ার কথাই নব্যতম পাশ্চাত্য সভ্যতার গোড়ার কথা। বিজ্ঞানের গোড়ার কথা কি—যদি জিজ্ঞাসা কর, তবে তাহার উত্তর এই যে, বিজ্ঞানের গোড়ার কথা আর কিছু না-অবিদ্যার বা জ্ঞানাভাসের বা অন্ধসংস্কারের পাশচ্ছেদন। আমাদের দেশের পূজ্যতম আচার্য্যেরাও তাহাই বলেন। সমস্ত অবিদ্যার বন্ধন এক উদ্যমে ছিন্ন করিয় পরাবিদ্যায় উত্তীর্ণ হওয়াই শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্যের প্রাণগত চেষ্টা ছিল। তাঁহার মতো ত্যাগী এবং যোগী ব্যক্তির পক্ষে সেরূপ অসমসাহসিক অধ্যবসায় শোভা পাইতে পারে, পরন্তু সাধারণ শ্রেণীর জনসমাজের পক্ষে অপরা বিদ্যার সোপান মাড়াইয়া পরাবিদ্যার দিকে ধীরে ধীরে অগ্রসর হওয়াই পরামর্শসিদ্ধ। রজ্জুতে সর্প-ভ্রম তো সামান্য অবিদ্যা; পৃথিবীর গোলাকারে চ্যাপ্‌টা-ভ্রম, সূর্য্যের স্থৈর্য্যে গতি-ভ্রম, পার্থিব ছায়াবগুণ্ঠনে রাহুভ্রম, এইরূপ আরো অনেক মাথালো মাথালো অবিদ্যার পাশচ্ছেদন করিয়া অধুনাতন কালের জ্যোতিষবিদ্যা আলোকে মস্তক উত্তোলন করিয়া দাঁড়াইয়াছে। আমাদের দেশেও ভাস্করাচার্য্যের ন্যায় প্রতিভাশালী মহাত্মারা অনেকানেক অবিদ্যার পাশচ্ছেদন করিয়া জ্যোতির্বিদ্যার উন্নতিসাধন করিয়াছিলেন। জ্যোতিষবিদ্যার এই যেমন দেখা গেল সকল বিদ্যারই গোড়ার কথা ঐ; কিনা অবিদ্যার পাশচ্ছেদন। কথাটি খুব সোজা; তাহা এই যে,

(১) মনুষ্যত্বের গোড়ার কথা বিদ্যা।

(২) বিদ্যার গোড়ার কথা অবিদ্যার পাশচ্ছেদন।

কিন্তু আমাদের দেশের স্কন্ধে এক্ষণে এম্‌নি জড়তা আলস্য এবং নিরুদ্যমের, আর সেই সঙ্গে দ্বেষ ঈর্ষা এবং দালপত্যের ভূত চাপিয়াছে যে, ঐ সোজা কথাটির প্রতি আমরা সোজা ভাবে দৃষ্টি করিতে নিতান্তই অপারগ। আমরা মনে করি যে, অবিদ্যার পাশচ্ছেদনের নামই উচ্ছৃঙ্খলতা, আর, যাহা চলিয়া আসিয়াছে তাহাই চলুক—এইরূপ গতানুগতিকতার নামই সদাচার। অবিদ্যার পাশচ্ছেদন করিতে আমাদের হাত এগোয় না—কিন্তু ব্যাধগণকে ডাকিয়া অবিদ্যার দড়াদড়ি দিয়া আমাদের হস্তপদ আরো দৃঢ়রূপে বন্ধন করাইয়া লইতে আমরা যেমন তৎপর এমন আর কেহই নহে। আমাদের দেশের এইরূপ হীনাবস্থার মধ্যেও যে সময়ে-সময়ে উচ্চশ্রেণীর প্রতিভাশালী মহাত্মারা অন্ধকার আলোকিত করিয়া দণ্ডায়মান হ'ন, তাহা সর্ব্বদেশের মঙ্গলবিধাতা জগদ্‌গুরু পরমেশ্বরের করুণার জাজ্বল্যমান নিদর্শন।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

যাত্রার পূর্ব্বপত্র।

মাঠের মাঝখানে এই আমাদের আশ্রমের বিদ্যালয়। এখানে আমরা বড়য় ছোটয় একসঙ্গে থাকি, ছাত্র ও শিক্ষকে একঘরে শয়ন করি, তেমনি এখানে আরো আমাদের সঙ্গী আছে; আকাশ আলোক এবং বাতাসের সঙ্গেও আমরা কোনো আড়ালের সম্পর্ক রাখি নাই। এখানে ভোরের আলো একেবারে আমাদের চোখের উপর আসিয়া পড়ে, আকাশের তারা একেবারে আমাদের মুখের উপর তাকাইয়া থাকে। ঝড় যখন আসে সে একেবারে দিক্‌প্রান্তে ধূলার উত্তরীয় দুলাইয়া বহুদূর হইতে আমাদের খবর দিতে থাকে। কোনো ঋতু যখন আসন্ন হয় তখন তাহার প্রথম সংবাদটি আমাদের গাছের পত্রে পত্রে প্রকাশিত হয়। বিশ্বপ্রকৃতিকে এক মুহূর্ত্ত আমাদের দ্বারের বাহিরে অপেক্ষা করিতে হয় না।

আমাদের ইচ্ছা পৃথিবীর মানুষের সঙ্গেও আমাদের এমনি একটা যোগ থাকে। সর্ব্বমানুষের ইতিহাসে যে সমস্ত ঋতু আসে যায়, সূর্য্যের যে উদয়াস্ত ঘটে, ঝড় বাদলের যে মাতামাতি চলে, সমস্তকেই যেন আমরা স্পষ্ট করিয়া এবং বড় আকাশের মধ্যে বড় করিয়া দেখিতে পাই, ইহাই আমাদের মনের বাসনা। আমরা লোকালয় হইতে দূরে আছি বলিয়াই আমাদের এই সুযোগ আছে। পৃথিবীর সমস্ত সংবাদ এখানে কোনো একটি ছাঁচের মধ্যে

আসিয়া পড়িতে পায় না, আমরা ইচ্ছা করিলে তাহাকে অবাধে বিশুদ্ধরূপে গ্রহণ করিতে পারি।

মানুষের জগতের সঙ্গে আমাদের এই মাঠের বিদ্যালয়ের সম্বন্ধটিকে অবারিত করিবার জন্য পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিবার প্রয়োজন অনুভব করি। আমরা সেই বড় পৃথিবীর নিমন্ত্রণের পত্র পাইয়াছি। কিন্তু সেই নিমন্ত্রণ ত বিদ্যালয়ের দুইশো ছাত্র মিলিয়া রক্ষা করিতে যাইতে পারিব না। তাই স্থির করিয়াছিলাম তোমাদের হইয়া আমি একলাই এই নিমন্ত্রণ রক্ষা করিয়া আসিব। আমার একলার মধ্যেই তোমাদের সকলের ভ্রমণ সারিয়া লইব। যখন আবার তোমাদের আশ্রমে ফিরিয়া আসিব তখন বাহিরের পৃথিবীটাকে আমার জীবনের মধ্যে অনেকটা পরিমাণে ভরিয়া আনিতে পারিব।

যখন ফিরিব তখন অবকাশমত অনেক কথা হইবে এখন বিদায়ের সময় দুই একটা কথা পরিষ্কার করিয়া যাইতে চাই।

আমাকে অনেকেই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন, তুমি য়ুরোপে ভ্রমণ করিতে যাইতেছ কেন? একথার কি জবাব দিব ভাবিয়া পাই না। ভ্রমণ করাই ভ্রমণ করিতে যাইবার উদ্দেশ্য এমন একটা সরল উত্তর যদি দিই তবে প্রশ্নকর্ত্তারা নিশ্চয় মনে করিবেন কথাটাকে নিতান্ত হাল্কা রকম করিয়া উড়াইয়া দিলাম। ফলাফল বিচার করিয়া লাভ লোকসানের হিসাব না ধরিয়া দিতে পারিলে মানুষকে ঠাণ্ডা করা যায় না।

প্রয়োজন না থাকিলে মানুষ অকস্মাৎ কেন বাহিরে যাইবে এ প্রশ্নটা আমাদের দেশেই সম্ভব। বাহিরে যাইবার ইচ্ছাটাই যে মানুষের স্বভাবসিদ্ধ একথাটা আমরা একেবারে ভুলিয়া গিয়াছি। কেবলমাত্র ঘর আমাদিগকে এত বাঁধনে এমন করিয়া বাঁধিয়াছে, চৌকাঠের বাহিরে পা বাড়াইবার সময় আমাদের এত অযাত্রা এত অবেলা এত হাঁচিটিক্‌টিকি এত অশ্রুপাত যে বাহির আমাদের পক্ষে অত্যন্তই বাহির হইয়া পড়িয়াছে, ঘরের সঙ্গে তাহার সম্বন্ধ অত্যন্ত বিচ্ছিন্ন হইয়াছে। আত্মীয়মণ্ডলী আমাদের দেশে এত নীরন্ধ্র, নিবিড় যে, পরের মত পর আমাদের কাছে আর কিছুই নাই। এইজন্যই অল্প সময়ের জন্যও বাহির হইতে হইলেও সকলের কাছে আমাদের এত বেশি জবাবদিহি করিতে হয়। বাঁধা থাকিয়া থাকিয়া আমাদের ডানা এমনি বদ্ধ হইয়া গিয়াছে যে, উড়িবার আনন্দ যে একটা আনন্দ একথাটা আমাদের দেশে বিশ্বাসযোগ্য নহে।

অল্প বয়সে যখন বিদেশে গিয়াছিলাম তখন তাহার মধ্যে একটা আর্থিক উদ্দেশ্য ছিল, সিভিল সার্বিসে প্রবেশের বা বারিষ্টার হওয়ার চেষ্টা একটা ভাল কৈফিয়ৎ—কিন্তু বাহান্ন বৎসর বয়সে সে কৈফিয়ৎ খাটে না, এখন কোনো পারমার্থিক উদ্দেশ্যের দোহাই দিতে হইবে।

আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য ভ্রমণের প্রয়োজন আছে একথাটা আমাদের দেশের লোকেরা মানিয়া থাকে সেই জন্য কেহ কেহ কল্পনা করিতেছেন এবয়সে আমার যাত্রার উদ্দেশ্য তাহাই। এই জন্য তাঁহারা আশ্চর্য্য হইতেছেন সে উদ্দেশ্য য়ুরোপে সাধিত হইবে কি করিয়া? এই ভারতবর্ষের তীর্থে ঘুরিয়া এখানকার সাধুসাধকদের সঙ্গ লাভ করাই একমাত্র মুক্তির উপায়।

আমি গোড়াতেই বলিয়া রাখিতেছি কেবলমাত্র বাহির হইয়া পড়াই আমার উদ্দেশ্য। ভাগ্যক্রমে পৃথিবীতে আসিয়াছি পৃথিবীর সঙ্গে পরিচয় যথাসম্ভব সম্পূর্ণ করিয়া যাইব ইহাই আমার পক্ষে যথেষ্ট। দুইটা চক্ষু পাইয়াছি সেই দুটা চক্ষু বিরাটকে যত দিক দিয়া যত বিচিত্র করিয়া দেখিবে ততই সার্থক হইবে।

তবু একথাও আমাকে স্বীকার করিতে হইবে যে লাভের প্রতিও আমার লোভ আছে। কেবল সুখ নহে এই ভ্রমণের সঙ্কল্পের মধ্যে প্রয়োজন সাধনেরও একটা ইচ্ছা গভীরভাবে লুকানো রহিয়াছে।

আমি মনে করি য়ুরোপের কেহ যদি যথার্থ শ্রদ্ধা লইয়া ভারতবর্ষ ভ্রমণ করিয়া যাইতে পারেন তবে তাঁহারা তীর্থভ্রমণের ফললাভ করেন, তেমন য়ুরোপীয়ের সঙ্গে আমার দেখা হইয়াছে, আমি তাঁহাদিগকে ভক্তি করি।

সে ভক্তির কারণ ইহা নহে যে আমাদের ভারতবর্ষের মাহাত্ম্য তাঁহাদের শ্রদ্ধার মধ্য দিয়া প্রতিফলিত হইয়া আমাদের কাছে উজ্জ্বল হইয়া দেখা দেয়। তাঁহাদেরই হৃদয়ের শক্তি দেখিয়া আমার মন প্রণত হয়। অপরিচয়ের বাধা ভেদ করিয়া সত্যকে স্বীকার ও কল্যাণকে গ্রহণ করিবার ক্ষমতা সর্ব্বদা দেখিতে পাই না। পরের দেশে না গেলে সত্যের মধ্যে সহজে সঞ্চরণ করিবার শক্তির পরিচয় পাওয়া যায় না। যাহা অভ্যস্ত তাহাকেই বড় সত্য বলিয়া মানা ও যাহা অনভ্যস্ত তাহাকেই তুচ্ছ বা মিথ্যা বলিয়া বর্জ্জন করা, ইহাই দীনাত্মার লক্ষণ।

অনভ্যাসের মন্দিরের কপাট ঠেলিয়া যখন আমরা সত্যকে পূজা দিয়া আসিতে পারি তখন সত্যের প্রতি ভক্তিকে আমরা বিশেষভাবে উপলব্ধি করিতে পারি। আমাদের সেই পূজা স্বাধীন, আমাদের সেই ভক্তি প্রথার দ্বারা অন্ধভাবে চালিত নহে।

য়ুরোপে গিয়া সংস্কারমুক্ত দৃষ্টিতে আমরা সত্যকে প্রত্যক্ষ করিব এই শ্রদ্ধাটি লইয়া যদি আমরা সেখানে যাত্রা করি তবে ভারতবাসীর পক্ষে এমন তীর্থ পৃথিবীতে

কোথায় মিলিবে ? ভারতবর্ষে আমি শ্রদ্ধাপরায়ণ যে য়ুরোপীয় তীর্থযাত্রীদিগকে দেখিয়াছি আমাদের দুর্গতি যে তাঁহাদের চোখে পড়ে নাই তাহা নহে কিন্তু সেই ধূলায় তাঁহাদিগকে অন্ধ করিতে পারে নাই ; জীর্ণ আবরণের আড়ালেও ভারতবর্ষের অন্তরতম সত্যকে তাঁহারা দেখিয়াছেন।

য়ুরোপেও যে সত্যের কোনো আবরণ নাই তাহা নহে। সে আবরণ জীর্ণ নহে তাহা সমুজ্জল। এই জন্যই সেখানকার অন্তরতম সত্যটিকে দেখিতে পাওয়া হয়ত আরো কঠিন। বীর প্রহরীদের দ্বারা রক্ষিত মণিমুক্তার ঝালরের দ্বারা খচিত সেই পর্দ্দাটাকেই সেখানকার সকলের চেয়ে মূল্যবান পদার্থ মনে করিয়া আমরা আশ্চর্য্য হইয়া ফিরিয়া আসিতে পারি—তাহার পিছনে যে দেবতা বসিয়া আছেন তাঁহাকে হয়ত প্রণাম করিয়া আসা ঘটিয়া উঠে না।

সেই পর্দ্দাটাই আছে আর তিনি নাই এমন একটা অদ্ভুত অশ্রদ্ধা লইয়া যদি সেখানে যাই তবে এই পথখরচাটার মত এতবড় অপব্যয় আর কিছুই হইতে পারে না।

য়ুরোপীয় সভ্যতা বস্তুগত, তাহার মধ্যে আধ্যাত্মিকতা নাই এই একটা বুলি চারিদিকে প্রচলিত হইয়াছে। যে কারণেই হউক, এইরূপ জনশ্রুতি যখন প্রচার লাভ করিতে আরম্ভ করে তখন তাহার আর সত্য হওয়ার প্রয়োজন থাকে না। পাঁচজনে যাহা বলে ষষ্ঠব্যক্তির তাহা উচ্চারণ করিতে বাধে না এবং নানা কণ্ঠের আবৃত্তিই তখন যুক্তির স্থান গ্রহণ করিয়া বসে।

একথা গোড়াতেই মনে রাখা দরকার মানবসমাজে যেখানেই আমরা যে কোনো মঙ্গল দেখিনা কেন তাহার গোড়াতেই আধ্যাত্মিক শক্তি আছে। অর্থাৎ মানুষ কখনই সত্যকে কল দিয়া পাইতে পারে না তাহাকে আত্মা দিয়াই লাভ করিতে হয়। য়ুরোপে যদি আমরা মানুষের কোনো উন্নতি দেখি তবে নিশ্চয়ই জানিতে হইবে সে উন্নতির মূলে মানুষের আত্মা আছে—কখনই তাহা জড়ের সৃষ্টি নহে। বাহিরের বিকাশে আত্মারই শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়।

য়ুরোপে মানুষ মানবাত্মাকে প্রকাশ করিতেছে না কেবল জড়বস্তুকেই স্তূপাকার করিতেছে একথাও যা, আর যদি বলি বনস্পতি কেবল শুকনো পাতা ঝরাইয়া মাটি ছাইয়া ফেলে সে আপনার জীবনকে প্রকাশ করে না তবে সেও তেমনি। বস্তুত বনস্পতির প্রবল প্রাণশক্তিই প্রচুর পল্লব বর্ষণ করে—অবিশ্রাম পরিত্যক্ত মৃত পত্রে তাহার মৃত্যু প্রমাণ করে না। জীবনই প্রতিমুহূর্ত্তে মরিতে পারে—মৃত্যু যখন বন্ধ হইয়া যায় তখনি যথার্থ মৃত্যু।

য়ুরোপে দেখিতেছি, মানুষ নব নব পরীক্ষা ও নব নব পরিবর্ত্তনের পথে চলিতেছে—আজ যাহাকে গ্রহণ করিতেছে কাল তাহাকে সে ত্যাগ করিতেছে। সে কোথাও চুপ করিয়া থাকিতেছে না; অনেকে বলিয়া থাকেন ইহাতেই তাহার আধ্যাত্মিকতার অভাব প্রমাণ করে।

বিশ্বজগতেও আমরা কেবলি পরিবর্ত্তন ও মৃত্যু দেখিতেছি তবু কি এই বিশ্বসম্বন্ধেই ঋষিরা বলেন নাই, যে আনন্দ হইতেই এই সমস্ত কিছু উৎপন্ন হইতেছে? অমৃতই কি আপনাকে মৃত্যুউৎসের ভিতর দিয়া নিরন্তর উৎসারিত করিতেছে না ?

বাহিরকেই চরম করিয়া দেখিলে ভিতরকে দেখা হয় না এবং বাহিরকেও সত্যরূপে গ্রহণ করা অসম্ভব হয়। য়ুরোপেরও একটা ভিতর আছে, তাহারও একটা আত্মা আছে, এবং সে আত্মা দুর্ব্বল নহে।

য়ুরোপের সেই আধ্যাত্মিকতাকে যখন দেখিব তখনি তাহার সত্যকে দেখিতে পাইব—তখনি এমন একটি পদার্থকে জানিতে পারিব যাহাকে আত্মার মধ্যে গ্রহণ করা যায়, যাহা কেবল বস্তু নহে, যাহা কেবল বিদ্যা নহে, যাহা আনন্দ।

যে কথাটা আমি বলিবার চেষ্টা করিতেছি তাহা সহজে বুঝিবার মত একটা ঘটনা সম্প্রতি ঘটিয়াছে। দুই হাজার যাত্রী লইয়া আট্‌লাণ্টিক সমুদ্রে এক জাহাজ পাড়ি দিতেছিল; সেই জাহাজ অর্দ্ধরাত্রে চলমান হিমশৈলে ঠেকিয়া যখন ডুবিবার উপক্রম করিল তখন অধিকাংশ য়ুরোপীয় ও আমেরিকান যাত্রী নিজের জীবনরক্ষার প্রতি ব্যাকুলতা প্রকাশ না করিয়া স্ত্রীলোক ও বালকদিগকে উদ্ধার করিবার চেষ্টা করিয়াছে। এই প্রকাণ্ড অপমৃত্যুর অভিঘাতে য়ুরোপের বাহিরের আবরণ সরিয়া যাওয়াতে আমরা এক মুহূর্ত্তে তাহার অন্তরতর মানবাত্মার একটি সত্যমূর্ত্তি দেখিতে পাইয়াছি।

যেমনি দেখিয়াছি অমনি তাহার কাছে মাথা প্রণত করিতে আমাদের আর লজ্জা হয় নাই। অমনি আত্মার পরিচয়ে আত্মার আনন্দ উদারভাবে প্রকাশ পাইয়াছে।

এই ঘটনার অনতিকালের মধ্যে আমাদের কয়েকজন বন্ধু ঢাকা হইতে ষ্টীমারে করিয়া ফিরিতেছিলেন। ষ্টীমারের আঘাতে পদ্মার মাঝখানে একটা নৌকা ডুবিয়া গেল, তাহার তিনজন আরোহী জলের মধ্যে পড়িল। অনতিদূরে পাশ দিয়া আর একখানা নৌকা চলিয়া যাইতেছিল—জাহাজের সকল লোকে মিলিয়া চীৎকার করিয়া উদ্ধারের জন্য তাহার মাঝিকে বিস্তর ডাকাডাকি করিল—সে কর্ণপাতমাত্র না করিয়া চলিয়া গেল।

বিপদের কোনো আশঙ্কা ছিল না, নিকটেও সে ছিল, কাজটাকে কোনোমতেই দুঃসাধ্য বলা চলে না।

আমার আর একদিনের কথা মনে পড়িল। রাত্রে প্রবল ঝড় হইয়া গিয়াছে। সকালবেলা বাতাসের বেগ কমিয়া গেছে কিন্তু নদী চঞ্চল। গোরাই নদীর তীরে আমার বোট বাঁধা। হঠাৎ মনে হইল নদীর মাঝখান দিয়া স্ত্রীলোকের দেহ ভাসিয়া চলিয়াছে। জলের উপরে চুল এলাইয়া পড়িয়াছে, আর কিছুই দেখা যায় না। ঘাটের কাছে যাহারা ছিল আমি সকলকেই ডাকিয়া বলিলাম আমার ছোট লাইফ্ বোটটা বাহিয়া উহাকে উদ্ধার করিয়া আন, কি জানি হয়ত বাঁচিয়া আছে? কেহই অগ্রসর হইল না। আমি বলিলাম, যে কেহ যাইবে প্রত্যেককে আমি পাঁচটাকা পুরস্কার দিব। তখনি কয়েকজন লোক নৌকা ভাসাইয়া দিয়া তাহাকে তুলিয়া আনিল, এবং মূর্চ্ছিত স্ত্রীলোকটি ক্রমশ চেতনা লাভ করিল। পুরস্কারের আশা না থাকিলে কেহই যাইত না।

আর একদিন আমি বোটে করিয়া একটা বড় বিল দিয়া আসিতেছিলাম। বিলের জল যেখানে নদীতে আসিয়া পড়ে সেখানে মাছ ধরিবার সুবিধা করিবার জন্য জেলেরা বড় বড় খোঁটা পুঁতিয়া জলের নির্গমন পথকে সঙ্কীর্ণ করিয়া দেয়, তাহাতে জলধারার বেগ অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠে;—এইরূপ স্থানে অনেক বোঝাই নৌকাকে বিপন্ন হইতে দেখিয়াছি। এই সঙ্কীর্ণ পথ পার হইবার কালে আমার বোট কোনোমতে খোঁটার আঘাত বাঁচাইতে গিয়া ভারি একটি সঙ্কটের জায়গায় আটকাইয়া পড়িল। আট দশ হাত দূরেই জেলেরা মাছ ধরিতেছিল। আমাদের সাহায্য করিবার জন্য তাহাদিগকে ডাকাডাকি করা গেল, তাহারা তাকাইয়াও দেখিল না। বোটের মাঝি পুরস্কার কবুল করিল। তাহারা ডাক বাড়াইবার প্রত্যাশায় বধিরতার ভান করিল। ডাক বাড়িয়া যখন বেশ একটা মোটা অঙ্কে উঠিয়াছে তখন জেলেদের শ্রবণশক্তির বাধা হঠাৎ সম্পূর্ণ দূর হইয়া গেল। অথচ তাহাদেরই কৃতকর্ম্মের ফল আমরা ভোগ করিতে বসিয়াছিলাম। আমাদের দেশের কোনো পাঠককে একথা বলা বাহুল্য যদি হাকিমের বোট হইত তাহা হইলে ইহাদের শ্রুতিশক্তির পরীক্ষায় অন্যরূপ ফল দেখা যাইত।

বোলপুরের বাজারে একটা দোকানে যখন আগুন লাগিয়াছিল তখন তোমাদের মনে আছে আগুন নিবাইবার কাজে চারজন বিদেশী কাবুলী তোমাদের সাহায্য করিয়াছে, পাড়ার লোককে ডাকিয়া সাড়া পাও নাই। মনে আছে, যাহাদের নিকট হইতে কলসী চাহিতে গিয়াছিলে তাহারা, পাছে তাহাদের কলস অপবিত্র হইয়া নষ্ট হয় এজন্য, দিতে চাহিল না।

আমরা আমাদের চারিদিকে এই যে আত্মত্যাগের কার্পণ্য দেখিতে পাই দৃষ্টান্তবাহুল্যের দ্বারা তাহা প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিতে হইবে না, কেননা আমরা মুখে যে যাহাই বলি না কেন অন্তত মনে মনে আমাদের চরিত্রের এই দৈন্য সকলেই স্বীকার করিয়া থাকি।

আত্মত্যাগের সঙ্গে আধ্যাত্মিকতার কি কোনো যোগ নাই? এটা কি ধর্ম্মবলেরই একটা লক্ষণ নহে? আধ্যাত্মিকতা কি কেবল জনসঙ্গ বর্জ্জন করিয়া শুচি হইয়া থাকে এবং নাম জপ করে? আধ্যাত্মিক শক্তিই কি মানুষকে বীর্য্য দান করে না?

টাইটানিক জাহাজ ডোবার ঘটনায় আমরা এক মুহূর্ত্তে অনেকগুলি মানুষকে মৃত্যুর সম্মুখে উজ্জ্বল আলোকে দেখিতে পাইয়াছি। ইহাতে কোনো একজন মাত্র মানুষের অসামান্যতা প্রকাশ হইয়াছে এমন নহে। সকলের চেয়ে আশ্চর্য্য এই যে যাহারা লক্ষ্মীর ক্রোড়ে লালিত ক্রোড়পতি; যাহারা টাকার জোরে চিরকাল নিজেকে অন্য সকলের চেয়ে বেশি বলিয়াই মনে করিয়া আসিয়াছে;—ভোগে যাহারা বাধা পায় নাই এবং রোগে বিপদে যাহারা আপনাকে বাঁচাইবার সুযোগ অন্য সকলের চেয়ে সহজে লাভ করিয়া আসিয়াছে তাহারা ইচ্ছা করিয়া দুর্ব্বলকে অক্ষমকে বাঁচিবার পথ ছাড়িয়া দিয়া মৃত্যুকে বরণ করিয়াছে। এরূপ ক্রোড়পতি এ জাহাজে কেবল এক আধজনমাত্র ছিল না।

আকস্মিক উৎপাতে মানুষের আদিম প্রবৃত্তিই সভ্যসমাজের সংযম ছিন্ন করিয়া দেখা দিতে চায়। ভাবিবার সময় হাতে পাইলে মানুষ আত্মসম্বরণ করিতে পারে। টাইটানিক জাহাজে অন্ধকার রাত্রে কেহবা নিদ্রার মধ্যে হঠাৎ জাগিয়া কেহবা আমোদ প্রমোদের মধ্য হইতে হঠাৎ বাহির হইয়া সম্মুখে অপঘাত মৃত্যুর কালোমূর্ত্তি দেখিতে পাইল। তখন যদি ইহাই দেখা যায় মানুষ পাগলের মত হইয়া অক্ষমকে ঠেলিয়া ফেলিয়া আপনাকে বাঁচাইবার চেষ্টা করিতেছেনা—তবে বুঝিতে হইবে এই বীরত্ব আকস্মিক নয়, ব্যক্তিগত নয়; সমস্ত জাতির বহুদিনের তপস্যার সহিত আধ্যাত্মিকশক্তি ভীষণ পরীক্ষায় মৃত্যুর উপরে জয়লাভ করিল।

এই জাহাজডুবিতে একসঙ্গে নিবিড় করিয়া যে শক্তিকে দেখিয়াছি য়ুরোপে সেই শক্তিকেই কি নানাদিকে নানা আকারে দেখিনাই? দেশহিতের ও লোকহিতের জন্য সর্ব্বস্বত্যাগ ও প্রাণবিসর্জ্জনের দৃষ্টান্ত কি সেখানে প্রত্যহই হাজার হাজার দেখা যায় না? সেই অজস্রসঞ্চিত পুঞ্জীভূত ত্যাগের দ্বারাই কি য়ুরোপীয় সভ্যতা প্রবালদ্বীপের মত মাথা তুলিয়া উঠে নাই?

কোনো সমাজে যথার্থ কোনো উন্নতিই হইতে পারে

না যাহার ভিত্তি দুঃখের উপর প্রতিষ্ঠিত নহে। এই দুঃখকে তাহারাই বরণ করিতে পারেনা যাহারা Materialist—যাহারা জড় বস্তুর দাস। বস্তুতেই যাহাদের চরম আনন্দ, বস্তুকে তাহারা ত্যাগ করিবে কেন? কল্যাণকে তাহারা আপনার প্রাণের চেয়ে কেন বড় করিয়া স্বীকার করিবে? শাস্ত্রবিহিত যে পুণ্যকে মানুষ পারলৌকিক বিষয় সম্পত্তির মতই জানে সেই স্বার্থপর পুণ্যের জন্যও সে দুঃখ স্বীকার করিতে পারে—কিন্তু যে পুণ্য শাস্ত্রবিধির সামগ্রী নহে, যাহা তীর্থযাত্রার দুঃখ নহে, যাহা শুভনক্ষত্রযোগের দান নহে—যাহা হৃদয়ের স্বাধীন প্ররোচনা—সেই দুঃখ সেই মৃত্যুকে কি কখনো কোনো বস্তুউপাসক গ্রহণ করিতে পারে?

য়ুরোপে দেশের জন্য মানুষের জন্য, জ্ঞানের জন্য প্রেমের জন্য হৃদয়ের স্বাধীন আবেগে সেই দুঃখকে সেই মৃত্যুকে আমরা প্রতিদিনই বরণ করিতে দেখিয়াছি!

ইহার মধ্যে সমস্তটাই খাঁটি নহে, ইহার মধ্যে অনেকটা আছে যাহা বাহাদুরি কিন্তু সেই অপবাদ দিয়া সত্যকে খর্ব্ব করিবার চেষ্টা করা উচিত নহে। কোনো কোনো রাত্রে চন্দ্রের চারিদিকে একটা জ্যোতির চক্র দেখা যায়। আমরা জানি তাহা চন্দ্র নহে, তাহা ছায়া, তাহা মিথ্যা। কিন্তু চন্দ্র মাঝখানে না থাকিলে সেই চন্দ্রের ভানটুকুও থাকিতে পারে না। সকল সমাজেই যেটি শ্রেষ্ঠ পদার্থ তাহাকে ঘিরিয়া তাহার আলোক ধার করিয়া লইয়া একটা ভানের মণ্ডল সৃজিত হইয়া থাকে। কিন্তু সেই নকলটা আসলের প্রতিবাদ করে না, তাহারই সমর্থন করে। ভণ্ড সন্যাসীকে দেখিয়া আমাদের দেশের সাধু সন্যাসীকে অবিশ্বাস করিয়া বসিলে ঠকিতে হইবে!

য়ুরোপের যাঁহারা অসামান্য লোক তাঁহাদের কথা আমরা বইয়ে পড়িয়াছি, তাঁহাদিগকে কাছে দেখি নাই। কাছে যে দুই একজনকে দেখিয়াছি য়ুরোপের জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর মধ্যে তাঁহারা স্থান পান নাই। অনেকদিন হইল একটি সুইডেনের মানুষকে দেখিয়াছিলাম তাঁহার নাম হ্যামারগ্রেণ। তিনি সেই দূরদেশে বসিয়া দৈবক্রমে রামমোহন রায়ের কি একটুকু পরিচয় কোনো একটা বইয়ে পাইয়াছিলেন। ইহাতে তাঁহার মনে এমন একটি ভক্তি জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছিল যে তাঁহার দারিদ্র্য সত্ত্বেও দেশ ছাড়িয়া তিনি বহুকষ্টে সমুদ্র পার হইয়া এই বাংলা দেশে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এখানকার ভাষা জানিতেন না, মানুষকে চিনিতেন না, তবু বাঙালীর বাড়িতেই আশ্রয় লইয়া এই রামমোহন রায়ের দেশকেই তিনি বরণ করিয়া লইলেন। যে অল্প কয়দিন বাঁচিয়াছিলেন কি দুঃসহ ক্লেশ সহ্য করিয়া কি নিষ্ঠা ও অধ্যবসায়ের সঙ্গে, অথচ কি সম্পূর্ণ নম্রতার মধ্যে নিজেকে প্রচ্ছন্ন রাখিয়া, তিনি এই দেশের হিতের জন্য নিজের প্রাণ উৎসর্গ করিয়াছিলেন তাহা যাঁহারা দেখিয়াছেন তাঁহারা কখনই ভুলিতে পারিবেন না। নিমতলার ঘাটে তাঁহার মৃত দেহ দাহ করা হইয়াছিল; তদুপলক্ষ্যে, হিন্দুর শ্মশান কলুষিত করা হইল বলিয়া, আমাদের কোনো সাপ্তাহিক পত্র ক্ষোভ প্রকাশ করিয়াছিল।

ভগিনী নিবেদিতা স্বামী বিবেকানন্দের প্রতি ভক্তি বহন করিয়া কিরূপ অদ্ভুত আত্মত্যাগের দ্বারা ভারতবর্ষের নিকট আপনাকে উৎসর্গ করিয়াছিলেন তাহা কাহারও অবিদিত নাই!

এই দুই দৃষ্টান্তেই আমরা দেখিয়াছি এই দুটি ভক্ত এমন স্থানে এমন অবস্থার মধ্যে আত্মদান করিয়াছেন যেখানে তাঁহাদের জীবনের কোনো পূর্ব্বাভ্যস্ত সহজ পথ তাঁহাদের সম্মুখে ছিল না। যেখানে তাঁহাদের হৃদয়মনের আজন্মকালের সংস্কার পদে পদে কঠোর বাধা পাইয়াছে। যেখানে কেবল যে তাঁহারা আত্মোৎসর্গ করিয়াছেন তাহা নহে, পদে পদে আত্মোৎসর্গের পথ তাঁহাদের নিজেকে খনন করিয়া চলিতে হইয়াছে—কেননা তাঁহাদের প্রবেশ চারিদিকেই অবরুদ্ধ।

সত্যকে ভক্তি করিবার এই ক্ষমতা, এবং সত্যের জন্য দুর্গম বাধা লঙ্ঘন করিয়া দিনের পর দিন আপনাকে অকুণ্ঠিতভাবে নিঃশেষে দান করিবার এই শক্তি, এ যে তাঁহাদের জাতীয় সাধনা হইতেই তাঁহারা পাইয়াছিলেন। এই আশ্চর্য্য শক্তি কি বস্তু-উপাসনার সাধনা হইতে কেহ কোনোদিন লাভ করিতে পারে? ইহা কি যথার্থই আধ্যাত্মিক নহে? এবং জিজ্ঞাসা করি এই শক্তি কি আমাদের দেশে যথেষ্ট পরিমাণে দেখিতে পাই?

কিন্তু তাই বলিয়া আমাদের দেশে কি আধ্যাত্মিকতা নাই? আমি তাহা বলি না। এখানেও আধ্যাত্মিকতার একটা দিক প্রকাশ পাইয়াছে। আমাদের দেশের যাঁহারা সাধক তাঁহারা কেহবা জ্ঞানে কেহবা ভক্তিতে অখণ্ডস্বরূপকে সমস্ত খণ্ডপদার্থের মধ্যে সহজেই স্বীকার করিতে পারেন। এইখানে জ্ঞানের দিকে এবং ভাবের দিকে, অনেক কালের চিন্তায় এবং সাধনায়, তাঁহাদের বাধা অনেক পরিমাণে ক্ষয় হইয়া আসিয়াছে। এইজন্য আমাদের দেশের যাঁহারা সাধুপুরুষ তাঁহারা চিৎলোকে বা হৃদয়ধামে অনন্তের সঙ্গে সহজে যোগ উপলব্ধি করিতে পারেন।

আমাদের দেশের মানবপ্রকৃতিতে এই শক্তিটি দেখিবার জন্য যদি কোনো বিদেশী শ্রদ্ধা ও দৃষ্টিশক্তি লইয়া আসেন তবে নিশ্চয়ই তিনি কৃতার্থ হইবেন; এবং সম্ভবত তিনি আপনার প্রকৃতির ভিতরকার একটা অভাব পূরণ করিয়া লইয়া যাইতে পারিবেন।

আমার বলিবার কথা এই যে, আমাদের মধ্যেও

তেমনি পূরণ করিবার মত একটা অভাব আছে এবং সেই অভাবই আমাদিগকে দুর্ব্বলতার অবসাদের মধ্যে বহুদিন হইতে আকর্ষণ করিতেছে।

একথা শুনিলেই আমাদের দেশাভিমানীরা বলিয়া উঠেন, হাঁ, অভাব আছে বটে কিন্তু তাহা আধ্যাত্মিকতার নহে, তাহা বস্তুজ্ঞানের, তাহা বিষয়বুদ্ধির। য়ুরোপে তাহারই জোরে পৃথিবীর অন্য সকলকে ছাড়াইয়া উঠিয়াছে।

আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তাহা কোনোমতেই হইতে পারে না। কেবল বস্তুসঞ্চয়ের উপরে কোনো জাতিরই উন্নতি দাঁড়াইতে পারে না এবং কেবল বিষয়বুদ্ধির জোরে কোনো জাতিই বল লাভ করে না। প্রদীপে অজস্র তেল ঢালিতে পারিলেও দীপ জ্বলে না এবং সলিতা পাকাইবার নৈপুণ্যে সুদক্ষ হইয়া উঠিলেও দীপ জ্বলে না—যেমন করিয়াই হউক আগুন ধরাইতেই হইবে।

আজ পৃথিবীকে য়ুরোপ শাসন করিতেছে বস্তুর জোরে, ইহা অবিশ্বাসী নাস্তিকের কথা। তাহার শাসনের মূল শক্তি নিঃসন্দেহই ধর্ম্মের জোর—তাহা ছাড়া আর কিছু হইতেই পারে না।

বৌদ্ধধর্ম্ম বিষয়াসক্তির ধর্ম্ম নহে একথা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে অথচ ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্ম্মের অভ্যুদয়কালে এবং তৎপরবর্ত্তী যুগে সেই বৌদ্ধসভ্যতার প্রভাবে এদেশে শিল্প বিজ্ঞান বাণিজ্য এবং সাম্রাজ্যশক্তির যেমন বিস্তার হইয়াছিল এমন আর কোনো কালে হয় নাই।

তাহার কারণ এই, মানুষের আত্মা যখন জড়ত্বের বন্ধন হইতে মুক্ত হয় তখনই আনন্দে তাহার সকল শক্তিই পূর্ণবিকাশের দিকে উদ্যম লাভ করে। আধ্যাত্মিকতাই মানুষের সকল শক্তির কেন্দ্রগত, কেননা তাহা আত্মারই শক্তি। পরিপূর্ণতাই তাহার স্বভাব। তাহা অন্তর বাহির কোনোদিকেই মানুষকে খর্ব্ব করিয়া আপনাকে আঘাত করিতে চাহে না।

য়ুরোপের যে শক্তি, তাহার বাহ্যরূপ যাহাই হউক না কেন, তাহার আন্তররূপ যে ধর্ম্মবল সে সম্বন্ধে আমার মনে সন্দেহ মাত্র নাই।

এই তাহার ধর্ম্মবল অত্যন্ত সচেতন। তাহা মানুষের কোনো দুঃখ কোনো অভাবকেই উদাসীনভাবে পাশে ঠেলিয়া রাখিতে পারে না। মানুষের সর্ব্বপ্রকার দুর্গতি মোচন করিবার জন্য নিত্য নিয়তই তাহা দুঃসাধ্য চেষ্টায় নিযুক্ত রহিয়াছে। এই চেষ্টার কেন্দ্রস্থলে যে একটি স্বাধীন শুভবুদ্ধি আছে—যে বুদ্ধি মানুষকে স্বার্থত্যাগ করাইতেছে, আরাম হইতে টানিয়া বাহির করিতেছে এবং অকুণ্ঠিত মৃত্যুর মুখে ডাক দিতেছে, তাহাকে শক্তি জোগাইতেছে কে? কোথায় সেই অমৃত আছে যাহা এই উদার মঙ্গলকামনাকে এমন করিয়া সতেজ রাখিয়াছে?

খৃষ্টের জীবনবৃক্ষ হইতে যে ধর্ম্মবীজ য়ুরোপের চিত্তক্ষেত্রে পড়িয়াছে তাহাই সেখানে এমন করিয়া ফলবান হইয়া উঠিয়াছে। সেই বীজের মধ্যে যে জীবনীশক্তি আছে, সেটি কি? সেটি দুঃখকে পরমধন বলিয়া গ্রহণ করা।

স্বর্গের দয়া যে মানুষের প্রেমে মানুষের সমস্ত দুঃখকে আপনার করিয়া লয় এই কথাটি আজ বহুশত বৎসর ধরিয়া নানা মন্ত্রে অনুষ্ঠানে সঙ্গীতে য়ুরোপ শুনিয়া আসিতেছে। শুনিতে শুনিতে এই আইডিয়াটি তাহার এমন একটি গভীর মর্ম্মস্থানকে অধিকার করিয়া বসিয়াছে যাহা চেতনারও অন্তরালবর্ত্তী অতিচেতনার দেশ—সেইখানকার গোপন নিস্তব্ধতার মধ্য হইতে মানুষের সমস্ত বীজ অঙ্কুরিত হইয়া উঠে—সেই অগোচর গভীরতার মধ্যেই মানুষের সমস্ত ঐশ্বর্য্যের ভিত্তি স্থাপিত হয়।

সেইজন্য আজ য়ুরোপে সর্ব্বদা এই একটা আশ্চর্য্য ঘটনা দেখিতে পাই যাহারা মুখে খৃষ্টধর্ম্মকে অমান্য করে এবং জড়বাদের জয় ঘোষণা করিয়া বেড়ায় তাহারাও সময় উপস্থিত হইলে ধনেপ্রাণে আপনাকে এমন করিয়া ত্যাগ করে, নিন্দাকে দুঃখকে এমন বীরের মত বহন করে যে তখনি বুঝা যায় তাহারা নিজের অজ্ঞাতসারেও মৃত্যুর উপরে অমৃতকে স্বীকার করে এবং সুখের উপরে মঙ্গলকেই সত্য বলিয়া মানে।

টাইটানিক জাহাজে যাঁহারা নিজের প্রাণকে নিশ্চিতভাবে অবজ্ঞা করিয়া পরের প্রাণকে রক্ষার চেষ্টা করিয়াছেন তাঁহারা সকলেই যে নিষ্ঠাবান ও উপাসনারত খৃষ্টান তাহা নহে, এমন কি তাঁহাদের মধ্যে নাস্তিক বা আজ্ঞেয়িকও কেহ কেহ থাকিতে পারেন কিন্তু তাঁহারা কেবলমাত্র মতান্তর গ্রহণের দ্বারা সমস্ত জাতির ধর্ম্মসাধনা হইতে নিজেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন করিবেন কি করিয়া? কোনো জাতির মধ্যে যাঁহারা তাপস তাঁহারা সে জাতির সকলের হইয়া তপস্যা করেন এইজন্য সেই জাতির পনেরো আনা মূঢ়ও যদি সেই তাপসদের গায়ে ধূলা দেয় তথাপি তাহারাও তপস্যার ফল হইতে একেবারে বঞ্চিত হয় না।

ভগবানের প্রেমে মানুষের ছোট বড় সমস্ত দুঃখ নিজে বহন করিবার শক্তি ও সাধনা আমাদের দেশে পরিব্যাপ্তভাবে দেখিতে পাইনা এ কথা যতই অপ্রিয় হউক তথাপি ইহা আমাদিগকে স্বীকার করিতেই হইবে। প্রেমভক্তির মধ্যে যে ভাবের আবেগ, যে রসের লীলা তাহা আমাদের যথেষ্ট আছে কিন্তু প্রেমের মধ্যে যে দুঃখ

স্বীকার, যে আত্মত্যাগ, যে সেবার আকাঙ্ক্ষা আছে যাহা বীর্য্যের দ্বারাই সাধ্য তাহা আমাদের মধ্যে ক্ষীণ। আমরা যাহাকে ঠাকুরের সেবা বলি তাহা দুঃখপীড়িত মানুষের মধ্যে ভগবানের সেবা নহে। আমরা প্রেমের রসলীলাকেই একান্তভাবে গ্রহণ করিয়াছি, প্রেমের দুঃখ-লীলাকে স্বীকার করি নাই।

দুঃখকে লাভের দিক দিয়া স্বীকার করার মধ্যে আধ্যাত্মিকতা নাই—দুঃখকে প্রেমের দিক দিয়া স্বীকার করাই আধ্যাত্মিকতা। কৃপণ ধনসঞ্চয়ের যে দুঃখ ভোগ করে, পারলোকিক সদ্গতির লোভে পুণ্যকামী যে দুঃখ-ব্রত গ্রহণ করে, মুক্তিলোলুপ মুক্তির জন্য যে দুঃখ সাধন করে এবং ভোগী ভোগের জন্য যে দুঃখকে বরণ করে তাহা কোনোমতেই পরিপূর্ণতার সাধনা নহে। তাহাতে আত্মার অভাবকেই দৈন্যকেই প্রকাশ করে। প্রেমের জন্য যে দুঃখ তাহাই যথার্থ ত্যাগের ঐশ্বর্য্য; তাহাতেই মানুষ মৃত্যুকে জয় করে ও আত্মার শক্তিকে ও আনন্দকে সকলের উর্দ্ধে মহীয়ান করিয়া তুলে।

এই দুঃখলীলার ক্ষেত্রেই আমরা আপনাকে ছাড়িয়া বিশ্বকে সত্যভাবে গ্রহণ করিতে পারি। সত্যের মূল্যই এই দুঃখ। এই দুঃখ সম্পদই মানবাত্মার প্রধান ঐশ্বর্য্য। এই দুঃখের দ্বারাই তাহার বল প্রকাশ হয় এবং এই দুঃখের দ্বারাই সে আপনাকে এবং অন্যকে লাভ করে। তাই শাস্ত্রে বলে "নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ" অর্থাৎ দুঃখস্বীকার করিবার বল যাহার নাই সে আপনাকে সত্যভাবে উপলব্ধি করিতে পারে না।

ইহার একটা প্রমাণ এই, আমরা নিজের দেশকে নিজে লাভ করিতে পারি নাই। আমাদের দেশের লোক কেহ কাহারও আপন হইল না। দেশ যাহাকে চায় সে সাড়া দেয় না। এখানকার জনসংখ্যা বড় কম নয়—কিন্তু সেই সংখ্যাবহুলতায় তাহার শক্তি প্রকাশ না করিয়া তাহার দুর্ব্বলতাই ব্যক্ত করে।

তাহার প্রধান কারণ এই, আমরা দুঃখের দ্বারা পরস্পরকে আপন করিতে পারি নাই। আমরা দেশের মানুষকে কোনো মূল্য দিই নাই—মূল্য না দিয়া পাইব কি করিয়া? মা আপন গর্ভের সন্তানকেও অহরহ সেবাদুঃখের মূল্য দিয়া লাভ করেন। যাহাকেই আমরা সত্য বলিয়া মনের মধ্যে শ্রদ্ধা করি তাহাকেই এই মূল্য আমরা স্বভাবতই দিয়া থাকি, কাহাকেও তাগিদ করিতে হয় না। চারিদিকের মানুষকে আমরা অন্তরের সহিত সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি নাই তাই আপনাকে আনন্দের সহিত ত্যাগ করিতেও পারিলাম না।

মানুষকে এইরূপ সত্য বলিয়া দেখা, ইহা আত্মার সত্যদৃষ্টি অর্থাৎ প্রেমের দ্বারাই ঘটে। তত্ত্বজ্ঞান যখন বলে, সর্ব্বভূতই এক, সে একটা বাক্যমাত্র—সেই তত্ত্ব-কথার দ্বারা সর্ব্বভূতকে আত্মবৎ করা যায় না। প্রেম নামক আত্মার যে চরমশক্তি—যাহার ধৈর্য্য অসীম, আপনাকে ত্যাগ করাতেই যাহার স্বাভাবিক আনন্দ সেই সেবাতৎপর প্রেম নহিলে আর কিছুতেই পরকে আপন করা যায় না। এই শক্তির দ্বারাই দেশপ্রেমিক পরমাত্মাকে সমস্ত দেশের মধ্যে উপলব্ধি করেন—মানব-প্রেমিক পরমাত্মাকে সমস্ত মানবের মধ্যে লাভ করেন।

য়ুরোপের ধর্ম্ম য়ুরোপকে সেই দুঃখপ্রদীপ্ত সেবা-পরায়ণ প্রেমের দীক্ষা দিয়াছে। ইহার জোরেই সেখানে মানুষের সঙ্গে মানুষের মিলন সহজ হইয়াছে। ইহার জোরেই সেখানে দুঃখতপস্যার হোমাগ্নি নিবিতেছে না এবং জীবনের সকল বিভাগেই শত শত তাপস আত্মাহুতির যজ্ঞ করিয়া সমস্ত দেশের চিত্তে অহরহ তেজ সঞ্চার করিতেছেন। সেই দুঃসহ যজ্ঞ-হুতাশন হইতে যে অমৃতের উদ্ভব হইতেছে তাহার দ্বারাই সেখানে শিল্প বিজ্ঞান সাহিত্য বাণিজ্য রাষ্ট্রনীতির এমন বিরাট বিস্তার হইতেছে;—ইহা কোনো কারখানা ঘরে লোহার যন্ত্রে তৈরি হইতেই পারে না—ইহা তপস্যার সৃষ্টি এবং সেই তপস্যার অগ্নিই মানুষের আধ্যাত্মিক শক্তি মানুষের ধর্ম্মবল।

সেই জন্য দেখিতে পাই বৌদ্ধযুগে ভারতবর্ষ যখন প্রেমের সেই ত্যাগধর্ম্মকে বরণ করিয়া লইয়াছিল তখনি সমাজে তাহার এমন একটি বিকাশ ঘটিয়াছিল যাহা য়ুরোপে সম্প্রতি দেখিতেছি। রোগীদের জন্য ঔষধ পথ্যের ব্যবস্থা, এমন কি পশুদের জন্যও চিকিৎসা-লয় এখানে স্থাপিত হইয়াছিল, এবং জীবের দুঃখনিবা-রণের চেষ্টা নানা আকার ধারণ করিয়া দেখা দিয়াছিল। তখন নিজের প্রাণ ও আরাম তুচ্ছ করিয়া ধর্ম্মাচার্য্যগণ দুর্গম পথ উত্তীর্ণ হইয়া পরদেশীয় ও বর্ব্বরজাতীয়দের সদ্গতির জন্য দলে দলে এবং অকাতরে দুঃখ বহন করিয়া-ছেন। ভারতবর্ষে সেদিন প্রেম আপনার দুঃখরূপকে বিকাশ করিয়াই ভক্তগণকে বীর্য্যবান মহৎ মনুষ্যত্বের দীক্ষা দান করিয়াছিল। সেই জন্যই ভারতবর্ষ সেদিন ধর্ম্মের দ্বারা কেবল আপনার আত্মা নহে পৃথিবীকে জয় করিতে পারিয়াছিল এবং আধ্যাত্মিকতার তেজে ঐহিক পারত্রিক উন্নতিকে একত্র সম্মিলিত করিয়াছিল। তখন য়ুরোপের খৃষ্টান সভ্যতা স্বপ্নের অতীত ছিল। ভারতবর্ষের সেই দুঃখব্রত আত্মত্যাগপরায়ণ প্রেমের উজ্জ্বল দীপ্তি কৃত্রিমতা ও ভাবরসাবেশের দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়াছে কিন্তু তাহা কি নির্ব্বাপিত হইয়াছে? বাহিরে যদি কোথাও তাহার উদ্বোধন দেখিতে পায় তবে আপনাকে কি তাহার আবার আপনি মনে পড়িবে না—

আজ যাহা পরের ঘরে বিরাজ করিতেছে তাহাকেই কি তাহার আপনার সামগ্রী বলিয়া চেতনা হইবে না? শক্তির আগুন যেখানে প্রচুর পরিমাণে জ্বলে সেখানে ছাইভস্মও প্রভূত হইয়া উঠে একথা মনে রাখিতে হইবে। নির্জ্জীবতার উৎপাত অল্প, তাহার দায় সামান্য, তাহার দুর্গতির মূর্ত্তিও অতি প্রশান্ত। অশান্তির ক্ষোভ এবং পাপের প্রচণ্ডতা য়ুরোপীয় সমাজে যেমন প্রত্যক্ষ হয় এমন আমাদের দেশে নহে একথা স্বীকার করিতে হইবে।

কিন্তু তাহাকে তাহারা উদাসীনভাবে মানিয়া লয় নাই। তাহা তাহাদের চিত্তকে অভিভূত করে নাই বরঞ্চ নিয়তই জাগ্রত করিয়া রাখিয়াছে। ম্যালেরিয়ার বাহন মশা হইতে আরম্ভ করিয়া সমাজের ভিতরকার পাপ পর্য্যন্ত সকল অসুরের সঙ্গেই সেখানে হাতাহাতি লড়াই চলিতেছে, অদৃষ্টের উপর বরাত দিয়া কেহ বসিয়া নাই—নিজের প্রাণকেও সঙ্কটাপন্ন করিয়া বীরের দল সংগ্রাম করিতেছে। সম্প্রতি London Police Courts নামক একটি আশ্চর্য্য বই পড়িতেছিলাম। সেই গ্রন্থে লণ্ডন রাজধানীর নীচের অন্ধকার তলায় দারিদ্র্যের মালিন্য ও পাপের পঙ্কিলতা উদ্‌ঘাটিত হইয়া বর্ণিত হইয়াছে। এই চিত্র যতই নিদারুণ হউক—খৃষ্টান তাপসের অদ্ভুত ধৈর্য্য, বীর্য্য ও করুণাপরায়ণ প্রেম সমস্ত বীভৎসতাকে ছাড়াইয়া উঠিয়া উজ্জ্বল দীপ্তিতে প্রকাশ পাইয়াছে। গীতায় একটি আশার বাণী আছে স্বল্পপরিমাণ ধর্ম্মও মহৎ ভয় হইতে ত্রাণ করে। কোনো সমাজে সেই ধর্ম্মকে যতক্ষণ সজীব দেখা যায় ততক্ষণ সেখানকার ভূরি পরিমাণ দুর্গতির অপেক্ষাও তাহাকে বড় করিয়া জানিতে হইবে।

য়ুরোপে দুর্ব্বল জাতির প্রতি ন্যায়ধর্ম্মের ব্যভিচার দেখা যাইতেছেনা এমন নহে, কিন্তু তাহাই একান্ত হইয়া নাই। সেই সঙ্গেই সেই নিষ্ঠুর বলদৃপ্ত লুব্ধতার মধ্য হইতেই ধিক্কার ও ভর্ৎসনা উচ্ছ্বসিত হইতেছে। প্রবলের অন্যায়ের প্রতিবাদ করিতে পারেন এবং প্রতিকার করিতে চাহেন এমন সাহসিক যাঁরও সেখানে অনেক আছেন। দূরবর্ত্তী পরজাতির পক্ষ অবলম্বন করিয়া নির্য্যাতন সহ্য করিতে কুণ্ঠিত নহেন এমন দৃঢ়নিষ্ঠ সাধুব্যক্তির সেখানে অভাব নাই। ভারতবাসীরা স্বদেশের রাজ্যশাসনে প্রশস্ত অধিকার লাভ করেন সেই চেষ্টায় প্রবৃত্ত গুটিকয়েক ভারতবর্ষীয় আমাদের দেশে আছেন—কিন্তু দীক্ষা তাঁহারা কাহাদের কাছে পাইয়াছেন এবং যথার্থ সহায় তাঁহাদের কে? যাঁহারা আত্মীয়দের বিদ্রূপ ও প্রতিকূলতা স্বীকার করিয়া স্বজাতির স্বার্থপরতার ক্ষেত্রকে সঙ্কীর্ণ করিবার জন্য দেশের লোককে ধর্ম্মের দোহাই দিতেছেন তাঁহারা কোন্ দেশের মানুষ? তাঁহারা সংখ্যায় অল্প কিন্তু সত্যদৃষ্টিতে দেখিলে দেখা যাইবে তাঁহারা সংখ্যায় অল্প নহেন। কেননা তাঁহাদের মধ্যেই তাঁহাদের শেষ নহে। দেশের মধ্যে গোচর এবং অগোচর তাঁহাদের একটি পরম্পরা আছে;—তাঁহারা সকলেই এক কাজ করিতেছেন বা এক সময়ে আছেন তাহা নহে, কিন্তু তাঁহারাই সমাজের ভিতরকার ন্যায়শক্তি। তাঁহারাই ক্ষত্রিয়; পৃথিবীর সমস্ত দুর্ব্বলকে ক্ষত হইতে ত্রাণ করিবার জন্য তাঁহারা সহজ কবচ ধারণ করিয়াছেন। দুঃখ হইতে মানুষকে উদ্ধার করিবার জন্য যিনি দুঃখ বহন করিয়াছিলেন, মৃত্যু হইতে মানুষকে অমৃতলোকে লইয়া যাইবার জন্য যিনি মৃত্যু:স্বীকার করিয়াছেন সেই তাঁহাদের স্বর্গীয় গুরুর অপমানিত রক্তাক্ত দুর্গমপথে তাঁহারা সারি সারি চলিয়াছেন। সমস্ত জাতির চিত্তপ্রান্তরের মাঝখান দিয়া তাঁহারাই অমৃতমন্দাকিনীর ধারা।

আমরা সর্ব্বদাই নিজেকে এই বলিয়া সান্ত্বনা দিয়া থাকি যে আমরা ধর্ম্মপ্রাণ আধ্যাত্মিক জাতি—বাহিরের বিষয়ে আমাদের মনোযোগ নাই এই জন্যই বহির্বিষয়েই আমরা দুর্ব্বল হইয়াছি। বাহিরের দৈন্য সম্বন্ধে আমাদের লজ্জাকে এমনি করিয়া আমরা খর্ব্ব করিতে চাই। আমাদের অনেকেই মুখে আস্ফালন করিয়া বলিয়া থাকেন দারিদ্র্যই আমাদের ভূষণ।

ঐশ্বর্য্যকে অধিকার করিবার শক্তি যাহাদের আছে দারিদ্র্য তাহাদেরই ভূষণ। যে ভূষণের কোনো মূল্য নাই তাহা ভূষণই নহে। এই জন্য ত্যাগের দারিদ্র্যই ভূষণ, অভাবের দারিদ্র্য ভূষণ নহে; শিবের দারিদ্র্যই ভূষণ, অলক্ষ্মীর দারিদ্র্য কদর্য্য। যাহারা পেট ভরিয়া খাইতে পায় না বলিয়া নিরত অবসাদে মলিন, যাহারা কোনমতে প্রাণ বাঁচাইতে চায় অথচ প্রাণ বাঁচাইবার কঠিন উপায় গ্রহণ করিবার শক্তি নাই বলিয়া যাহারা বারবার ধূলায় লুটাইয়া পড়ে, দরিদ্র বলিয়াই যাহারা সুযোগ পাইলে অন্য দরিদ্রকে শোষণ করে এবং অক্ষম বলিয়াই ক্ষমতা পাইলে যাহারা অন্য অক্ষমকে আঘাত করে কখনই দারিদ্র্য তাহাদের ভূষণ নহে।

আমাদের এই যে দুঃখ দারিদ্র্য অপমান ইহাকে কোনোমতেই আমাদের ধর্ম্মপ্রাণতার পুরস্কার বলিয়া আমরা আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রকে প্রসারিত করিতে পারি নাই, তাহাকে ব্যক্তিগত ভক্তিসাধনার মধ্যে বদ্ধ করিয়াছি; তাহার আহ্বানে সমস্ত মানুষকে একত্র করি নাই; যেখানে সমাজশাসনের অন্ধ উৎপাতের দ্বারা বিধিবিধানের পাথরের জাঁতায় মানুষের বিচারশক্তি ও স্বাধীন মঙ্গলবুদ্ধিকে পিষিয়া সমস্তকে একাকার করি-

য়াছি সেইখানেই ধর্ম্মবোধের সঙ্কীর্ণতা ও অচেতনতাই আমাদিগকে জড়পিণ্ড করিয়া দাসত্বের উপযোগী করিয়া তুলিয়াছে। আমরা এখনো মনে করিতেছি আইনের দ্বারা আমাদের দুর্গতির প্রতিকার হইবে, রাষ্ট্রশাসন-সভায় আসন লাভ করিলে আমরা মানুষ হইয়া উঠিব—কিন্তু জাতীয় সম্পতি কলের সামগ্রী নহে, এবং মানুষের আত্মা যতক্ষণ আপনার ভিতর হইতে তাহার পূরা মূল্য চুকাইয়া দিবার জন্য প্রস্তুত হইতে না পারিবে ততক্ষণ নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।

তাই বলিতেছিলাম, তীর্থযাত্রার মানস করিয়াই যদি য়ুরোপে যাইতে হয় তবে তাহা নিষ্ফল হইবে না। সেখানেও আমাদের গুরু আছেন, সে গুরু সেখানকার মানবসমাজের অন্তরতম দিব্যশক্তি। সর্ব্বত্রই গুরুকে শ্রদ্ধার গুণে সন্ধান করিয়া লইতে হয়—চোখ মেলিলেই তাঁহাকে দেখা যায় না। সেখানেও সমাজের যিনি প্রাণপুরুষ, অন্ধতা ও অহঙ্কারবশত তাঁহাকে না দেখিয়া ফিরিয়া আসা অসম্ভব নহে—এবং এমন একটা অদ্ভুত ধারণা লইয়া আসাও আশ্চর্য্য নহে যে ইংলণ্ডের প্রতাপ পার্লামেণ্টের দ্বারা সৃষ্ট হইতেছে, য়ুরোপের ঐশ্বর্য্য কারখানা ঘরে প্রস্তুত হইতেছে এবং পাশ্চাত্য মহাদেশের সমস্ত মাহাত্ম্য যুদ্ধের অস্ত্র, বাণিজ্যের জাহাজ এবং বাহ্য বস্তুপুঞ্জের দ্বারা সংঘটিত। নিজের মধ্যে শক্তির সত্য অনুভূতি যাহার নাই অতি সহজেই সে মনে করিয়া বসে শক্তি বাহিরেই আছে এবং যদি কোনো সুযোগে আমরাও কেবলমাত্র ঐ জিনিষগুলা দখল করিতে পারি তাহা হইলেই আমাদের অভাব পূরণ হয়। কিন্তু "যেনাহং নামৃতা স্যাম্ কিমহং তেন কুর্য্যাম্" একথাটি য়ুরোপেরও অন্তরের কথা। য়ুরোপও নিশ্চয়ই জানে রেলে টেলিগ্রাফে কলে কারখানায় সে বড় নহে এইজন্যই য়ুরোপ বীরের ন্যায় সত্যব্রত গ্রহণ করিয়াছে, বীরের ন্যায় সত্যের জন্য ধনপ্রাণ উৎসর্গ করিতেছে, এবং যতই ভুল করিতেছে, যতই ব্যর্থ হইতেছে ততই দ্বিগুণতর উৎসাহের সহিত নূতন করিয়া উদ্যোগ আরম্ভ করিতেছে—কিছুতেই হাল ছাড়িয়া দিতেছে না। মাঝে মাঝে অমঙ্গল দেখা দিতেছে, সংঘাতে সংঘর্ষে বহ্নি জ্বলিয়া উঠিতেছে সমুদ্রমন্থনে মাঝে মাঝে বিষও উদ্গীর্ণ হইতেছে কিন্তু মন্দকে তাহারা কোনোমতেই মানিয়া লইতেছে না। অস্ত্র তাহাদের প্রস্তুত, সৈন্যদল তাহাদের নির্ভীক, এবং সত্যের দীক্ষায় তাহারা মৃত্যুঞ্জয়ী বললাভ করিয়াছে। সত্যের সম্মুখীন হইতে আমরা আলস্য করিয়াছি, সত্যের সাধনায় আমরা উদাসীন, আমরা ঘরগড়া বাঁধাবাঁধনের মধ্যে আপাদমস্তক আপনাকে জড়াইয়া তাহাকেই সত্য আশ্রয় বলিয়া কল্পনা করিয়াছি,—সেইজন্য বিপদের দিন যখন আসন্ন হয়, সত্য পন্থা ব্যতীত যখন আমাদের আর গতি নাই তখন আমরা কিছুতেই আপনাকে জাগ্রত করিতে পারিনা, আপনাকে ত্যাগ করিতে পারিনা; তখনো খেলা করাকেই কাজ করা মনে করি, নকল করিয়াই আসলের ফল প্রত্যাশা করি, কৃত্রিম উৎসাহকে উদ্দীপ্ত রাখিতে পারিনা; আরব্ধ কর্ম্মকে শেষ করিতে পারিনা এবং ভূরিপরিমাণ তাত্ত্বিকতা ও ভাবুকতার জালে জড়িত হইয়া বারম্বার ব্যর্থ হইতে থাকি। সেইজন্য সত্যের দায়িত্বকে বীরের ন্যায় সর্ব্বান্তঃকরণে স্বীকার করিবার দীক্ষা; সেই সত্যের প্রতি অবিচলিত প্রাণান্তিক নিষ্ঠা; জীবনের সমস্ত শ্রেষ্ঠ সম্পদকে প্রাণপণ দুঃখের মূল্য দিয়া অর্জ্জন করিবার সাধনা; এবং বুদ্ধি হৃদয় ও কর্ম্মে সকল দিক দিয়া মানুষের কল্যাণসাধন মানুষের প্রতি শ্রদ্ধাদ্বারা ভগবানের দুঃসাধ্য সেবাব্রত গ্রহণ করিবার জন্য তীর্থযাত্রীর পক্ষে য়ুরোপে যাত্রা কখনই নিষ্ফল হইতে পারে না; অবশ্য যদি তাহার মনে শ্রদ্ধা থাকে এবং সর্ব্বাঙ্গীন মনুষ্যত্বের পরিপূর্ণতাকেই যদি সে আধ্যাত্মিক সাফল্যের সত্য পরিচয় বলিয়া বিশ্বাস করে।

আমি জানি য়ুরোপের সঙ্গে এক জায়গায় আমাদের স্বার্থের সংঘাত ঘটিয়াছে এবং সেই সংঘাতে আমাদিগকে অন্তরে বাহিরে অনেক স্থলে গভীর বেদনা পাইতে হইতেছে, সে বেদনা আমাদের আধ্যাত্মিক দৈন্যেরই দুঃখ এবং আমাদের সঞ্চিত পাপেরই প্রায়শ্চিত্ত হইলেও তাহা বেদনা; আমাদের পক্ষে এই বেদনার উপলক্ষ্য যাহারা তাহাদের ক্ষুদ্রতা ও নিষ্ঠুরতার পরিচয় আমরা নানা আকারে পাইয়া থাকি; ইহাও আমরা প্রতিদিন দেখিয়াছি তাহারা নিজের নীচতাকে উদ্ধত কপটতার দ্বারা গোপন করিয়াছে ও পরজাতীয়ের মাহাত্ম্যকে অন্ধতা ও অহঙ্কারের দ্বারা অস্বীকার করিয়াছে; এই কারণেই আমাদের সেই ক্ষতবেদনা লইয়া য়ুরোপের সত্যকে দেখিতে ও তাহাকে গ্রহণ করিতে আমরা অন্তরের মধ্যে বাধা পাইয়া থাকি; তাহাদের ধর্ম্মকেও আমরা অবিশ্বাস করি ও তাহাদের সভ্যতাকে আমরা বস্তুজালজড়িত স্থূলপদার্থ বলিয়া নিন্দা করিয়া থাকি। শুধু তাহাই নহে, আমাদের ভয় আছে, পাছে প্রবলের প্রবলতাকেই আমরা সত্যের আসন দিয়া তাহার পূজা করি ও তাহার কাছে ধূলিলুণ্ঠিত হইয়া আপনাকে অপবিত্র করি; পাছে অন্যের গৌরবকে নিজের গৌরবের সহিত গ্রহণ করিতে না পারি; পাছে আত্মঅবিশ্বাসের অবসাদে নিজের সত্যকে বিসর্জ্জন দিয়া অনুকরণের শূন্যতার মধ্যে পরের কায়ার ছায়া ও পরের ধ্বনির প্রতিধ্বনি হইয়া জগৎ সংসারে নিজেকে একেবারেই ব্যর্থ করিয়া দিই; পাছে এইরূপ একটা অদ্ভুত ভ্রম করিয়া বসি যে অন্যকে স্বীকার করিতে

গিয়া নিজেকে অস্বীকার করিয়া বসাই যথার্থ ঔদার্য্যের পন্থা।

এই সমস্ত বিঘ্নবিপদ আছে—সেই জন্যই এই পথে সত্যসন্ধানের যাত্রা তীর্থযাত্রা। সমস্ত অসত্যকে উত্তীর্ণ হইয়াই চলিতে হইবে, বাধার দুঃখকে সহ্য করিয়াই অগ্রসর হইতে হইবে, আত্মঅভিমানের ব্যর্থ বোঝাকে পশ্চাতে ফেলিয়া যাইতে হইবে অথচ আত্মগৌরবের পাথেয়কে একান্ত যত্নে রক্ষা করিয়া চলিতে হইবে। বস্তুত অত্যন্ত বিঘ্নের দ্বারাই আমরা এই তীর্থযাত্রার পূর্ণ ফললাভের আশা করিতে পারি; কারণ যাহা সহজে পাই তাহা সচেতন হইয়া গ্রহণ করি না;—অথচ কোনো মহৎ লাভের যথার্থ সফলতাই চেতনার পূর্ণতর বিকাশ—অর্থাৎ আমরা যাহা কিছু সত্যভাবে লাভ করি তাহার দ্বারা আপনাকেই সত্যতররূপে উপলব্ধি করি। তাহা যদি না করি, যদি বাহিরের বস্তুকেই বাহিরে পাই তবে তাহা মায়া, তাহা মিথ্যা।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সৌন্দর্য্য ও মহিমা।

একবার একজন ইংরাজীভাষী কবি আমাকে বলিয়াছিলেন যে, বাংলাদেশের ভূপ্রকৃতি মহিমার ভাব যতটা জাগায়, সৌন্দর্য্যের ভাব ততটা জাগায় না, তাহা অনির্ব্বচনীয় কিন্তু মুগ্ধকর নয়। দেখনা কেন, আমাদের বাংলাদেশটা কেবলি সমতল প্রান্তর, সুদূর দিগন্ত পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হইয়া চলিয়া গিয়াছে; এখানকার আকাশ বাষ্পমুক্ত ও অনবরুদ্ধ, এবং নদী, ঘাট, বন, গ্রাম সমস্তই কেমন বৃহদায়তন, দূরবিস্তৃত—এখানে তাই মানুষের মনকে স্বভাবতই উদাসীন ও উন্মনা করিয়া দেয়। ইংলণ্ডে সমস্তই ইহার বিপরীত। সেখানে সবই ছোটখাট, আয়ত্তের মধ্যে—নদীগুলি কোথাও পার্ব্বত্যপ্রদেশে সঙ্কীর্ণ উপলপথ দিয়া সফেন কলহাস্যে ছুটিয়া চলিয়াছে, কোথাও সমতল স্থানে বনগুল্মে শৈবালে আচ্ছন্ন হইয়া শীর্ণধারায় ক্ষীণস্রোতে বহিতেছে—তাহাদের কটি বেষ্টন করিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সাঁকো—শুভ্র পথগুলি—বেড়াদেওয়া ক্ষেতগুলি—চিম্নিওয়ালা কুটিরগুলি, দেয়ালে আইভিলতা উঠিয়াছে, আঙ্গুরের লতায় বাড়ীগুলিকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়াইয়া ধরিয়াছে। এমনি করিয়া ফুলটি, লতাটি, গাছগুলি, পথটি, বাগানটি, পাহাড়টি, নদীটি—সবই ছোটখাট সীমায় ধরা দেয়, কোথাও হাত ছাড়াইয়া পালায় না। তিনি আরও বলিলেন, যে উভয়দেশের ভূপ্রকৃতির এই প্রভেদের জন্য উভয়দেশের কাব্যেরও প্রভেদ ঘটিয়াছে। বাংলাদেশের কাব্য বল, গান বল—সমস্তই ঐ মহান্ ভাবে পূর্ণ, তাহার মধ্যে একটি উদাসকরা ভৈরবীর বিষাদের সুর আছে। প্রকৃতিটা এত বড় যে তাহা উপভোগ্য হইয়া উঠিতে পারে নাই এবং তাহার পাশে মানুষের সমস্ত সুখদুঃখ হাসিকান্না অত্যন্ত ছোট হইয়া পড়িয়াছে। এ একেবারে মায়াবাদের দেশ। এখানে সবাই হাল ছাড়িয়া দিয়া বসিয়া আছে।

তাঁহার এই কথাটা আমার খুবই মনে লাগিয়াছিল। সত্যই তো তাই। ইংলণ্ডের প্রকৃতির মধ্যে এদেশের প্রকৃতির মত এমন নিশ্চিন্ত শান্তিময় বৃহৎ অবকাশ কোথায়! সেখানে প্রকৃতি মানুষের অনুগামিনী সহচরী, ফিট্‌ফাট্ বেশে হাসিমুখে তাহার সঙ্গে হাত ধরাধরি করিয়া চলিয়াছে। এখানে তো তাহা নয়। এখানে আলোয় আবিষ্ট করে, গন্ধে বিধুর করে, মর্ম্মরধ্বনিতে উদাস করে এবং আকাশের সুদূর ব্যাপ্তিতে মনকে একেবারে গৃহছাড়া নিরুদ্দেশ করিয়া দেয়। দাঁড় বাহিতে বাহিতে এখানে মাঝিরা গায়, মনমাঝি, তোর বৈঠা নেরে, আমি আর বাইতে পারলাম না! বড় বড় কবিরাও এখানে যা লেখেন তাও ঐ সুরেই সুর মেলায়! তাঁরাও গাহেন:—

"আকাশ ছেয়ে মন-ভোলান হাসি
আমার প্রাণে বাজাল আজ বাঁশি!
লাগল আলস পথে চলার মাঝে
হঠাৎ বাধা পড়্‌ল সকল কাজে!"

খেয়া।

ঘুরিয়া ফিরিয়া ঐ একই সুর! "হে সুদূর, আমি উদাসী"! সঙ্গীতেও দেখ, সকাল বেলার ভৈরবী বল, বিকালের পূরবী মূলতান বল, রাত্রের বেহাগ বল—সকল সুরেরই অব্যক্ত আকুতিকে ভাষায় তর্জ্জমা করিলে ঐ দাঁড়ায়—"হে সুদূর, আমি উদাসী!" ইউরোপের কবিতায় গানে ঠিক এই ভাবটি নাই। সেখানে কবিতায় যে কোথাও মহান্ ভাব ফুটে নাই, তাহা নহে, কিন্তু সে হয়ত কোন একটা বিস্ময়কর ব্যাপার দেখিয়া—যেমন সমুদ্র, কি উত্তুঙ্গ গিরিশৃঙ্গ, কি প্রবল ঝটিকা, কি মানুষের মধ্যে কোন আশ্চর্য্য শক্তির প্রকাশ—যাহার কাছে মানুষ স্বভাবতই অভিভূত হইয়া যায়! দৃষ্টান্তস্বরূপে যেমন ধর, বায়রণের চাইল্ড হেরল্ডে সমুদ্রের প্রতি যে শ্লোকগুলি আছে,—Roll on, Thou deep and darkblue ocean roll! কিম্বা ওয়ার্ডস্বার্থের সেই ওয়াই নদীর তীরে পর্ব্বতদৃশ্যের মধ্যে রচিত কবিতাটি—Five years have past—ইত্যাদি।

"Once again
Do I behold these steep and lofty cliffs

"That on a wild secluded scene impress
Thoughts of more deep seclusion"

আবার হেরিনু আমি সেই মহা তুঙ্গ গিরিরাজি
বিজন আরণ্য দৃশ্যে দেয় যাহা মুদ্রিত করিয়া
সুগভীরতর কোন্ বিজনতা-রহস্য-বারতা!

কিন্তু সমস্ত ইউরোপীয় সাহিত্য ঘাঁটিলেও এমন শ্লোক কোথাও পাইবে না যে—

দূরে কোথায় দূরে দূরে
মন বেড়ায় যে ঘুরে ঘুরে!
যে বাঁশীতে বাতাস কাঁদে
সেই বাঁশীটির সুরে সুরে!

ইউরোপীয় সাহিত্যে এই অনির্ব্বচনীয় ভাবের চেয়ে সৌন্দর্য্য উপভোগের আনন্দ ও সৌন্দর্য্যমুগ্ধতার ভাব অনেক বেশী প্রবল।

কিন্তু এইখানে একটি বড় প্রশ্ন জাগে—সৌন্দর্য্যে ও মহিমায় কি কোন জাতিগত ভেদ আছে? আমাদের কবিদের মধ্যে মহিমার ভাব অধিক যখন বলিতেছ, তখন তার মানে কি এই যে তাঁহাদের সৌন্দর্য্য-দৃষ্টি নাই? অর্থাৎ সৌন্দর্য্যই বা তুমি কাহাকে বল এবং মহিমাই বা কাহাকে বল তাহা ভাল করিয়া বুঝাইয়া দাও।

ইংরাজী সৌন্দর্য্যশাস্ত্রে আমরা যাহাকে মহিমা বলিতেছি তাহাকে বলে Sublimity * আর যাহাকে সৌন্দর্য্য বলিতেছি তাহাকে বলে Beauty এবং এই দুয়ের পার্থক্য সম্বন্ধে সেখানেও বিস্তর মতামতের গোলযোগ আছে।

সৌন্দর্য্য কি তাহা সংজ্ঞিত করিতে যাওয়াও যা আর গ্রীকপুরাণকথিত স্ফিংক্সের মুখের মধ্যে প্রবেশ করাও তাই—একই কথা। স্ফিংক্স আর কিছুই নয় গ্রীক্ পুরাণের একটি কাল্পনিক জন্তু—অর্দ্ধেক সিংহী এবং অর্দ্ধেক মানবী। সে পথের ধারে দাঁড়াইয়া পথিকদিগকে সমস্যা পূরণ করিতে দিত, যে পারিত তাহাকে যাইতে দিত এবং যে পারিত না তাহাকে গ্রাস করিয়া ফেলিত। পৃথিবীতে যে অনেকগুলি সমস্যা আছে যাহার মীমাংসা হয় না এবং যাহা মানুষকে গ্রাস করিয়া ফেলে,—তাহাই জ্ঞাপিত করিবার জন্য গ্রীকরা এই অদ্ভুত কল্পনার অবতারণা করিয়াছিল। সে যাহাই হোক সৌন্দর্য্যের সংজ্ঞা নিরূপণও এই রকমেরই সমস্যা। তাহার বৃথা চেষ্টা না করিয়া এইটুকু সোজাসুজি বলা যায় যে, সৌন্দর্য্য সত্য এবং মঙ্গল এই তিনটি মূল তত্ত্ব মানুষ জানে। সত্যকে মানুষ আবিষ্কার করে—অনেক অজ্ঞানের পাশ-চ্ছেদন করিয়া, মঙ্গলকে মানুষ অনুষ্ঠান করে নানা কর্ম্মাদিতে,—এবং সৌন্দর্য্যকে শুদ্ধমাত্র অনুভব করিয়া থাকে। মোটামুটি ইহাই বলা যায়—যদিও এই তিনের মধ্যে যে যোগাযোগ নাই তাহা নহে। সুতরাং সৌন্দর্য্য তাহাই যাহা অহেতুক এবং যাহার সঙ্গে কোন প্রয়োজনের সম্বন্ধ নাই। তাহাকে কার্য্যকারণের নিয়ম খাটাইয়া অনুসন্ধান ও আবিষ্কার করিতেও হয় না এবং নানা কাজে কর্ম্মে ফলাইয়া তুলিয়া মনুষ্যের প্রয়োজন সাধন করিতেও হয় না।

সৌন্দর্য্যরস যখন এইরূপ একটি স্বপ্রতিষ্ঠিত পরিপূর্ণ জিনিস তখন তাহার মধ্যে যে সকল স্বাদবৈচিত্র্য আছে, তাহারা অন্য শ্রেণীর মধ্যে কেন পড়িবে? অর্থাৎ মহিমার রসকেই বা সৌন্দর্য্যরসের বিরোধী ও বিপরীত বলিয়া বর্ণনা করিব কেন? অনেক ইংরাজ সৌন্দর্য্যতত্ত্ববিৎ তাহা করিয়া থাকেন জানি—তাঁহারা বলেন একটা হচ্ছে Sublime অন্যটা Beautiful—দুটা নামই ইহাদের পরস্পরের পার্থক্য সূচিত করিতেছে। কিন্তু সে পার্থক্য কেবলমাত্র মাত্রার পার্থক্য—বস্তুগত পার্থক্য হইতে যাইবে কেন?

আমরা যে সুন্দর বলি বা চমৎকার বলি সে কত বিভিন্ন জিনিসকে বলি এবং সকলটারই কি স্বাদের মাত্রা সমান? একটা কাপড়ের ভাল পাড়কেও চমৎকার বলি, আবার জনহীন দিগদিগন্তব্যাপী মাঠের মধ্যে সূর্য্যাস্তের প্রদীপ্ত অনলোদ্গারকেও চমৎকার বলি—কিন্তু এ দুয়ের চামৎকার্য্য কি একই? কোনটা বা চোখকে বা কানকে ভুলায় বলিয়া সুন্দর, কোনটা মনে একটা সুসঙ্গতির ভাবকে জাগায় বলিয়া সুন্দর, কোনটা বা বিস্ময়ের আনন্দে অভিভূত করে বলিয়া সুন্দর! কিন্তু ইহাদের একটাকে সৌন্দর্য্যের কোটায় ফেলিয়া অন্যগুলিকে সেখান হইতে খারিজ করিয়া দিব ইহার কি মানে আছে?

যে কবির কথা প্রবন্ধারম্ভে উল্লেখ করিলাম আমার বেশ মনে আছে তিনি সুন্দরকে এবং মহানকে পৃথক্ কোটায় বিভক্ত করিয়া রাখিয়াছিলেন এবং তাহার কারণ বলিয়াছিলেন এই যে, সৌন্দর্য্য আমাদিগকে মুগ্ধ করে এবং মহিমা আমাদিগকে বিস্মিত কিম্বা উন্মনা করে—সুতরাং ইহারা দুই ভিন্ন রসে মনকে রসায় বলিয়া ইহারা একই সৌন্দর্য্যের শ্রেণীভুক্ত হইতে পারে না।

সাধারণ ভাবে আমি একথা মানিয়া যাইতে রাজি আছি কিন্তু আমার প্রশ্ন এই যে যাহা মুগ্ধ করে তাহা কি বিস্মিত বা উন্মনা করিয়া দিতে পারে না? দেখা যাক্, আমরা মুগ্ধ হই কখন? আমরা তখনি মুগ্ধ হই বলি যখন

* Sublime শব্দের সংস্কৃত প্রতিশব্দ "মহান্" ছাড়া আর কিছুই পাওয়া যায় না, সুতরাং Sublimityর প্রতিশব্দ "মহিমা" করিতে হইয়াছে কারণ 'মহান্' হইতে বিশেষ্য 'মহত্ত্ব' কোনমতেই Sublimityর অর্থ জ্ঞাপন করে না।

আমরা কোন একটা পদার্থের এমন একটি বাহ্য সুসঙ্গতি দেখি যাহা ইন্দ্রিয়কে তৎক্ষণাৎ পাইয়া বসে এবং ইন্দ্রিয়ের দ্বার দিয়া মনের ভিতর মহালে প্রবেশ করিয়া আমাদের প্রশংসা-বাণীকে সহজেই বাহির করিয়া লইয়া আসে। ফুলের দলগুলি এমনি সুন্দরভাবে সাজানো যে তৎক্ষণাৎ তাহা আমাদের চোখকে মুগ্ধ করিয়া বসে, তাহার গন্ধটি এমনি মৃদু যে আমাদের ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের স্নায়ুতন্তুতে তাহা একটি কোমল ঝঙ্কার তুলিয়া দেয়। কতগুলি আবর্জ্জনাস্তূপ দেখিলে তো সেই সুসঙ্গতিটি দেখা যায় না, সুতরাং তাহা ইন্দ্রিয়কে পীড়াই দেয়। একজন দীর্ঘনাসা বা কর্ণ-বিশিষ্ট লোককে অসুন্দর ঠেকে কেন? কারণ, তাঁহার চেহারায় একজায়গায় যতিঃপতন হইয়া গিয়াছে—অঙ্গের এক অংশের সঙ্গে অন্য অংশের দিব্য সামঞ্জস্যটি নাই। শুধু যে চোখে সুসঙ্গতি দেখিয়া আমরা মুগ্ধ হই তাহা নহে—চোখে বা কানে সুসঙ্গতি না ঠেকিলেও অনেক সময় ভিতরকার সুসঙ্গতি দেখিয়াও আমরা মুগ্ধ হই।

যেমন জয়দেবের গীতগোবিন্দের ছন্দ কানে খুব ভাল লাগে, কিন্তু কালিদাসের মেঘদূতের ছন্দ শুধু কাণে ভাল লাগেনা মনেও ভাল লাগে—সেই জন্য একটা কিছুক্ষণ সুখ জাগায়, তারপর পীড়া দেয়, কিন্তু অন্যটার সঙ্গীত ফুরায় না কারণ তাহা শুদ্ধ মাত্র শব্দসঙ্গীত নহে, তাহার মধ্যে ভাবের একটি রাগিণী আছে। ভারতচিত্রশিল্পে অপ্সরার নৃত্যলীলার চিত্র এবং মহাদেবের তাণ্ডবনৃত্যের চিত্র দুইই আছে—একটা চোখে ভাল লাগে, আর একটা চোখে ভাল লাগে শুধু নয় মনেও ভাল লাগে—সেইজন্য একটা ইন্দ্রিয়কে ক্ষণকালীন সুখ দিয়া বিদায় হয় এবং অন্যটা একটি ভাবের আনন্দে চিরদিন মনকে মাতাইয়া রাখে। সুতরাং ভিতরের সুসঙ্গতি বাহিরের সুসঙ্গতি অপেক্ষাও অনেক বেশি স্থায়ী এবং স্থায়ীভাবেই তাহা আমাদিগকে মুগ্ধ করিয়া থাকে।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, যাহা মুগ্ধকর তাহা কি মহান্ হইতে পারে না? দেখা যাক্ মহিমার রসটা কি রকম? অর্থাৎ আমরা মহিমার ভাবে পূর্ণ হই কখন্?

অনেকে বলেন যে "আকারের আয়তনের সংখ্যার বা প্রসারের বিশালতা দেখিলেই আমরা মহিমার রস আস্বাদন করি। যেমন রাত্রিকালে অগণ্যতারাখচিত আকাশ, যেমন অনন্তকালের ভাব, যেমন লক্ষ লক্ষ ভীমকায় বনস্পতিসম্পন্ন মহারণ্য, যেমন তরঙ্গিত কূলহীন অনন্ত সমুদ্র! কেবলমাত্র আকারে আয়তনে প্রকাণ্ড বলিয়াই আমরা ইহাদিগকে বলি মহান্! একটা ছোট ওষধি দেখিয়া আমাদের বিস্ময় হয় না, কিন্তু একটা বৃহৎ বনস্পতি দেখিয়া আমাদের বিস্ময় হয়। একটা পিপীলিকা দেখিয়া বিস্ময় হয় না, কিন্তু একটা হস্তী দেখিয়া বিস্ময় হয়।" *

আমি স্বীকার করি যে সাধারণতঃ মহিমার ভাবকে আমরা এই আকার আয়তনের বিশালতার সঙ্গেই সংযুক্ত করিয়া রাখি, যেমন সৌন্দর্য্যের ভাবকে আমরা ইন্দ্রিয়ের পরিতৃপ্তির সঙ্গে সংযুক্ত করিয়া রাখি। একটু আগে আমরা দেখিলাম যে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সুসঙ্গতিকেই আমরা সৌন্দর্য্য বলিয়া থাকি, অথচ ভিতরের সুসঙ্গতিকে মনের শক্তির দ্বারা আবিষ্কার করিয়া লইয়া দেখিতে হয়, সুতরাং তাহা বাহ্য সুসঙ্গতি অপেক্ষা অনেক বেশি সত্য এবং স্থায়ী এবং সেই জন্যই তাহাকেই প্রকৃতপক্ষে যথার্থ সৌন্দর্য্য বলিয়া পরিকীর্ত্তিত করা যাইতে পারে। সে যেমন দেখিলাম, তেমনি এখানেও কেন বাহিরের আকার আয়তনের বিশালতাকেই মহিমা বলিব? আকার আয়তনের স্বল্পতা ঘটিলেই কি কোন বস্তু মহিমার ভাবে আমাদের মনকে পূর্ণ করিতে পারে না? একটা কীটেরও যদি সমস্ত জীবনলীলার রহস্য আমাদের কাছে হঠাৎ উদ্ঘাটিত হইয়া যায়, তবে সে কি সামান্য বিস্ময়? তখন সেই কীট কি বাস্তবিকই মহান্ হয় না? মেটরলিঙ্কের "The Life of the Bee" মৌমাছির কাহিনী যাঁহারা পাঠ করিয়াছেন তাঁহারা কি "Soul of the hive" মৌচাকের প্রাণের মধ্যে প্রবেশ করিয়া প্রকৃতির রহস্যভবনের দ্বার খুলিয়া এক অচিন্ত্য অভাবনীয় লীলার দৃশ্য দেখেন নাই? সুতরাং যেখানেই আমরা ভিতরের এমন একটি রহস্যকে দেখিতে পাই, যাহা ইন্দ্রিয় দ্বারা দেখিনা, কিন্তু মনের দৃষ্টির দ্বারা দেখি, সেখানেই আমরা বিস্ময় অনুভব করি। সেই বিস্ময়ের ভাবটিই তো মহিমার ভাব। সেখানে আমরা শুধু যে মুগ্ধ হই তাহা নহে, বিস্মিতও হই। সুতরাং তখন আমরা এমন একটি সৌন্দর্য্যকে আবিষ্কার করি যাহা হৃদয় হরণ করে বটে, কিন্তু সেই তৃপ্তিতেই বাঁধিয়া রাখে না, তাহার একটি অসীম মুক্তরূপকেও আমাদের সম্মুখে উদ্ঘাটিত করিয়া দেয়।

আমার কথার উদাহরণস্বরূপে "যেতে নাহি দিব" কবিতাটি ধরা যাক্।

সেই যে একটি ছোট্ট বালিকা তাহার পিতার কর্ম্মস্থানে যাইবার কালে বলিল "যেতে নাহি দিব" তাহা সামান্য কথা নয়—সমস্ত পৃথিবীর মধ্যে সেই কথাটির একটি করুণকাতর ক্রন্দন বাজিতেছে। সেই চারি বৎসরের কন্যাটি সমস্ত পৃথিবীরই প্রতিচ্ছবি! পৃথিবীতে মৃত্যু আসিয়া সমস্তই হরণ করিয়া লইয়া যায়, তথাপি

* Bradleyর oxford Lectures on poetry হইতে উদ্ধৃত।

তাহার চিরজীবী প্রেম তো কোন মতেই পরাভব মানিতে চায় না! এই যে একটি ক্ষুদ্র কন্যার সামান্য দুঃখের মধ্যে সমস্ত পৃথিবীর একটি বিরহবেদনাকে অনুভব করা—ইহাই মহিমার রস। কেননা, এখানে একটি বিশেষ আবিষ্কারের আনন্দ আছে। হঠাৎ একটি ছোট ঘটনা পৃথিবীরই উপরকার একটা পর্দ্দা তুলিয়া ধরিয়াছে—দেখা গেল যে কিছুই ছোট নহে, সমস্তই সেই বিরাট বিশ্বচরাচরের সঙ্গে এক! যে বেদনা ঐ কন্যার মুখে, সেই বেদনা সমস্ত পৃথিবীর মুখে! এই সামঞ্জস্যের প্রকাণ্ড একটি আবিষ্কারের জন্য কবিতাটি এমন মহিমার ভাবে পূর্ণ হইয়াছে।

কেবলমাত্র একটা বিরাটশক্তির কাছে মানুষের পরাভবজনিত যে বিস্ময় তাহার রস খুব গভীর নহে। তাহা কতকটা আদিম যুগের মানুষের প্রকৃতির শক্তি-উপাসনার ব্যাপারে লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু এক্ষণে মানুষ শুধু সেই বাহ্যশক্তিকেই প্রকাণ্ড করিয়া দেখিতে পারে না। কারণ মানুষ বিজ্ঞানের দ্বারা তাহার উপরে জয়ী হইয়া উঠিয়াছে। আমি দেখিয়াছি যে বাহ্যপ্রাকৃত শক্তি না হোক্‌ একটা কোন শক্তির বড় প্রকাশ দেখিতে পাইলেই ইউরোপীয় চিত্ত সেখানেই বিস্ময়বোধ করে এবং তাহাকেই Sublime বলিয়া কীর্ত্তন করিতে চায়। এড্‌মণ্ড বার্ক তো স্পষ্টই বলিয়াছেন যে মহিমার রস একটা প্রবল শক্তির ভীতি হইতেই জন্মে। অধ্যাপক ব্রাড্‌লি যিনি বার্কের এই মতের প্রতিবাদ করিয়াছেন, তিনিও তাঁহার এক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন যে বাহ্য আকারের আয়তনের বিশালতা না হোক, কিন্তু কোন শক্তির পরিচয় প্রাপ্ত হইলেই আমরা সেইখানেই মহিমার ভাব অনুভব করিয়া থাকি।

কিন্তু আমার তা মনে হয় না। আমার মনে হয় যে, যে-সৌন্দর্য্য আমাদিগকে একটি সুসঙ্গতি দেখাইয়া মুগ্ধ করে, যখনই তাহাকে আমরা বিশ্বব্যাপী একটি সত্যের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত দেখিতে পাই, তখনই আমরা বিস্ময়বোধ করি এবং সেই মুগ্ধকর সুন্দর পদার্থকে মহান্‌ পদার্থ বলিয়া কীর্ত্তন করি। যেমন ধরা যাক্‌, কীট্‌সের গ্রীসের মৃৎপাত্রের উপর কবিতাটি। মৃৎপাত্রের চারিদিকে চিত্রিত গ্রীক যজ্ঞের ছবি নিশ্চয়ই মুগ্ধকর। কিন্তু যখন বলা হইতেছে :—

"Thou silent form! Dost tease us out of thought
As Doth Eternity"—হে নিস্তব্ধ রূপ! তুমি আমাদের চিন্তাকে বিভ্রান্ত করিয়া দাও, যেমন অনন্তকাল করিয়া থাকে!—তখন অনন্তকাল ধরিয়া যে সেই সৌন্দর্য্যময় মৃৎপাত্রের রূপটি জাগ্রত হইয়া থাকিবে, কীট্‌সের এই অনুভূতি তাহার সৌন্দর্য্যের রসকে মহিমার রসে পরিণত করিয়া দেয়। চিত্রিত মৃৎপাত্রটি যে কেবলমাত্র সুন্দর তাহা নয়, তাহা মহান্‌—কবি এই সত্যটি প্রচার করিলেন।

আমি এখন আমার গোড়ার কথায় যাই। প্রবন্ধারম্ভে যে বাংলাদেশের কাব্যে মহিমার ভাবের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে—তাহার অর্থ বোধ হয় এতক্ষণে বুঝা যাইতেছে। সে ভাবটি যে কেবলি উদাস-উন্মনা-ভাব-ব্যঞ্জক এবং তাহাতে সৌন্দর্য্যমুগ্ধতার কোন সম্ভাবনা নাই,—এমন কথা ভাবিবার কোন হেতু নাই। কারণ আমরা দেখিলাম যে, সৌন্দর্য্য ও মহিমার মধ্যে কেবল মাত্রার তারতম্যভেদ আছে কিন্তু বস্তুগত ভেদ নাই। তবে ইংরাজী কাব্যে সৌন্দর্য্যের মুগ্ধকরতার বার্ত্তা যতটা পাওয়া যায়, মহিমার বার্ত্তা ততটা পাওয়া যায় না; পক্ষান্তরে এদেশী কাব্যে মহিমার বার্ত্তা যতটা পাওয়া যায়, সৌন্দর্য্যমুগ্ধতার বার্ত্তা ততটা পাওয়া যায় না। কিন্তু তাই বলিয়া কোন দেশী কাব্যেই এ দুয়ের আত্যন্তিক বিচ্ছেদ ঘটে নাই। কারণ এ দুয়ের শুভ সম্মিলনের উপরেই সকল ভাল কাব্যের শ্রেষ্ঠত্ব নির্ভর করে।

এ দেশীয় কাব্যের ন্যায় ইউরোপীয় কাব্যে প্রকৃত মহিমার রস অনেক স্থানেই প্রকাশ পাইয়াছে—তার সাক্ষী কীট্‌সের গ্রীশান্‌ আর্ন—কবিতাটি। কিন্তু মহিমার রস সে দেশে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বাহিরের আকার-আয়তনের বিশালতা বা প্রবল শক্তির সঙ্গেই জড়িত হইয়া আছে, ইহা পুর্ব্বেই দেখা গেল। মহিমার রস যে বাস্তবিকই সৌন্দর্য্যের অন্তরতর লোকের মধ্যে নিগূঢ়ভাবে অভিসঞ্চিত—সৌন্দর্য্যই যে সীমার দিক দিয়া মনোহর কিন্তু অসীমের দিক দিয়া মহান্‌—এ কথাটা আজিও ইউরোপীয় চিত্তে ভাল করিয়া জাগিয়াছে বলিয়া মনে হয় না। আকার আয়তনের বিশালতাকে ভূমা বা অনন্ত বলিয়া কীর্ত্তন করা মানবসভ্যতার নিতান্ত একটা বাল্য সংস্কার বলিয়া আমার মনে হয়। আর সেই ভাবে মহিমাকে দেখিতে যাইলেই তাহা সৌন্দর্য্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে, তখনই উভয়ের রসের মধ্যে মাত্রাগত নহে, শ্রেণীগত পার্থক্য অনুভূত হইয়া থাকে।

যেখানে কোন বস্তু সীমার দিক্‌ দিয়া আমাদের ইন্দ্রিয়মনের কাছে সুসঙ্গতিপূর্ণ হইয়া ধরা দেয়, সেখানেই তাহা সুন্দর, কিন্তু যেখানে তাহা অসীমতার দিক দিয়া সকল ধরাছোঁয়ার অতীত হইয়া বিশ্বব্যাপী পরিপূর্ণতায় প্রকাশ পায় সেখানেই তাহা মহান্‌ অথবা ভূমা। তদন্তরস্য সর্ব্বস্য তদু সর্ব্বস্যাস্য বাহ্যতঃ। তিনি সকলের অন্তরে আছেন (Immanent) তিনি সকলের বাহিরেও আছেন (Transcendent)। সকলের ভিতরে যেখানে সুসঙ্গতি ও সুসামঞ্জস্য মনের দৃষ্টির সম্মুখে উদ্ভাসিত হয়,

সেইখানেই সৌন্দর্য্য এবং সেইখানেই সৌন্দর্য্যের অধীশ্বর সেই পরম সুন্দরের বিহারলোক ; সকলের বাহিরে যেখানে নিঃসীম পরিপূর্ণতা বাক্যের সহিত মনকে ফিরাইয়া আনে, সেইখানে মহিমা, সেইখানে অনন্ত আনন্দ সকল সৌন্দর্য্যের সীমার বাহিরে আপনার অপরূপত্বে বিরাজমান। সকল বস্তুর মধ্যেই এই সীমা-অসীমের লীলা রহিয়াছে, সেইজন্য সকল বস্তুই সুন্দর এবং মহান্ উভয়ই, হিন্দুর রসবোধ এই কথাটি খুব গভীরভাবেই স্বীকার করিয়াছে।

শ্রীঅজিতকুমার চক্রবর্ত্তী।

বোম্বাই সহর।

বোম্বাই সহরটার উপর একবার চোখ বুলাইয়া আসিবার জন্য কাল বিকালে বাহির হইয়াছিলাম। প্রথম ছবিটা দেখিয়াই মনে হইল বোম্বাই সহরের একটা বিশেষ চেহারা আছে ; কলিকাতার যেন কোনো চেহারা নাই, সে যেন যেমন তেমন করিয়া জোড়াতাড়া দিয়া তৈরি হইয়াছে।

আসল কথা সমুদ্র বোম্বাই সহরকে আকার দিয়াছে, নিজের অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি বেলাভূমি দিয়া তাহাকে আঁকড়িয়া ধরিয়াছে। সমুদ্রের আকর্ষণ বোম্বাইয়ের সমস্ত রাস্তাগলির ভিতর দিয়া কাজ করিতেছে। আমার মনে হইতেছে যেন সমুদ্রটা একটা প্রকাণ্ড হৃৎপিণ্ড, প্রাণধারাকে বোম্বাইয়ের শিরা উপশিরার ভিতর দিয়া টানিয়া লইতেছে এবং ভরিয়া দিতেছে। সমুদ্র চিরদিন এই সহরটিকে বৃহৎ বাহিরের দিকে মুখ করিয়া রাখিয়া দিয়াছে।

প্রকৃতির সঙ্গে কলিকাতার মিলনের একটি বন্ধন ছিল গঙ্গা। এই গঙ্গার ধারাই সুদূরের বার্ত্তাকে সুদূর রহস্যের অভিমুখে বহিয়া লইয়া যাইবার খোলা পথ ছিল। সহরের এই একটি জানালা ছিল যেখানে মুখ বাড়াইলে বোঝা যাইত জগৎটা এই লোকালয়ের মধ্যেই বদ্ধ নহে। কিন্তু গঙ্গার প্রাকৃতিক মহিমা আর রহিল না, তাহাকে দুইতীরে এমনি আঁটাসাঁটা পোষাক পরাইয়াছে, এবং তাহার কোমরবন্ধ এমনি কষিয়া বাঁধিয়াছে যে গঙ্গাও লোকালয়েরই পেয়াদার মূর্ত্তি ধরিয়াছে ; গাধাবোট বোঝাই করিয়া পাটের বস্তা চালান করা ছাড়া তাহার যে আর কোনো বড় কাজ ছিল তাহা আর বুঝিবার জো নাই। জাহাজের মাস্তলের কণ্টকারণ্যে মকরবাহিনীর মকরের শুঁড় কোথায় লজ্জায় লুকাইল!

সমুদ্রের বিশেষ মহিমা এই যে, মানুষের কাজ সে করিয়া দেয় কিন্তু দাসত্বের চিহ্ন সে গলায় পরে না। পাটের কারবার তাহার বিশাল বক্ষের নীলকান্ত মণিটিকে ঢাকিয়া ফেলিতে পারে না। তাই এই সহরের ধারে সমুদ্রের মূর্ত্তিটি অক্লান্ত ;—যেমন একদিকে সে মানুষের কাজকে পৃথিবীময় ছড়াইয়া দিতেছে তেমনি আর একদিকে সে মানুষের শ্রান্তি হরণ করিতেছে—ঘোরতর কর্ম্মের সম্মুখেই বিরাট একটি অবকাশকে মেলিয়া রাখিয়াছে।

তাই আমার ভারি ভাল লাগিল যখন দেখিলাম শত শত নরনারী সাজসজ্জা করিয়া সমুদ্রের ধারে গিয়া বসিয়াছে। অপরাহ্নের অবসরের সময় সমুদ্রের ডাক কেহ অমান্য করিতে পারে নাই। সমুদ্রের কোলের কাছে ইহাদের কাজ এবং সমুদ্রের কোলের কাছে ইহাদের আনন্দ। আমাদের কলিকাতার সহরে এক ইডেন গার্ডেন আছে—কিন্তু সে কৃপণের ঘরের মেয়ে, তাহার কণ্ঠে আহ্বান নাই। সেই রাজপুরুষের তৈরি বাগান, সেখানে কত শাসন, কত নিষেধ। কিন্তু সমুদ্র তো কাহারো তৈরি নহে, ইহাকে ত বেড়িয়া রাখিবার জো নাই। এই জন্য সমুদ্রের ধারে বোম্বাই সহরের এমন নিত্যোৎসব। কলিকাতার কোথাও ত সেই অসঙ্কোচ আনন্দের একটুকু স্থান নাই।

সব চেয়ে যাহা দেখিয়া হৃদয় জুড়াইয়া যায় তাহা এখানকার নরনারীর মেলা। নারীবর্জ্জিত কলিকাতার দৈন্যটা যে কতখানি তাহা এখানে আসিলেই দেখা যায়। কলিকাতায় আমরা মানুষকে আধখানা করিয়া দেখি এইজন্য তাহার আনন্দরূপ দেখি না। নিশ্চয়ই সেই না দেখার একটা দণ্ড আছে।

নিশ্চয়ই তাহা মানুষের মনকে সঙ্কীর্ণ করিতেছে, তাহার স্বাভাবিক বিকাশ হইতে বঞ্চিত করিতেছে। অপরাহ্নে স্ত্রীপুরুষ ও শিশুরা সমুদ্রের ধারে একই আনন্দে মিলিত হইয়াছে, সত্যের এই একটি অত্যন্ত স্বাভাবিক শোভা না দেখিতে পাওয়ার মত ভাগ্যহীনতা মানুষের পক্ষে আর কিছুই হইতে পারে না। যে দুঃখ আমাদের অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছে তাহা আমাদিগকে অচেতন করিয়া রাখে কিন্তু তাহার ক্ষতি প্রত্যহই জমা হইতে থাকে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। ঘরের কোণের মধ্যে আমরা নরনারী মিলিয়া থাকি কিন্তু সে মিলন কি সম্পূর্ণ? বাহিরে মিলিবার যে উদার বিশ্ব রহিয়াছে সেখানে কি সরল আনন্দে একদিনও আমাদের পরস্পর দেখা সাক্ষাৎ হইবে না?

আমাদের গাড়ি ম্যাথেরান পাহাড়ের উপরে একটা বাগানের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। ছোট বাগানটিকে বেষ্টন করিয়া চারিদিকে বেঞ্চ পাতা। সেখানেও দেখি